ড. করম হোসাইন শাহরাহি

রাজকুমারী ১

THE SECRET OF THE TEMPLE

দ্য সিক্রেট অব দ্য টেম্পল

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
[অনূদিত]

বই সম্পর্কে

একদিকে উলঙ্গ লালসা, আর অন্যদিকে উৎপীড়িতের নিঃশব্দ ক্রন্দন। শূন্যতার মধ্যে দেহহীন অস্তিত্বের এক আশ্চর্য আখ্যান এই 'রাজকুমারী'। মোট পাঁচ খণ্ডের বিশাল আকারের উপন্যাস। এ উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস-সাহিত্যে এক অভিনব মাত্রা সংযোজন। ড. করম হোসাইন শাহরাহি সেই পথেই হেঁটেছেন।

সত্যানুসন্ধানী ড. শাহরাহি বাস্তবতাকে আড়াল করে পাঠকনন্দিত হতে চাননি; বরং নিজে একজন পুরুষ হয়েও নির্দ্বিধায় উদ্ঘাটন করেছেন ধর্মের নামে অনাচারে অভ্যস্ত পুরুষজাতির বর্বরতা ও নীচতার অতল পাপাচার। কিছু কিছু নারী-পুরুষ যে পশুরই এক রূপ এবং দেশ-কাল-পাত্র ভেদে খুব বেশি পার্থক্য তাদের মধ্যে নেই এবং কখনো কখনো মুখোশের অন্তরালেও সেই একই পশুবৃত্তিচ-র্চাতেই তারা নিবেদিত– সে কথাই উঠে এসেছে 'রাজকুমারী'তে।

উপন্যাসটির বিভিন্ন আঙিনায় আমরা দেখতে থাকি– প্রশস্ত বাহুর অধিকারী ওই মুসলিম যোদ্ধারা জমিনের যে প্রান্ত দিয়ে হাঁটতে শুরু করে সে জমিনের প্রশস্ততা যেন মাথা নুইয়ে দেয় তাদের চরণতলে। এদের কারও তরবারি কোষমুক্ত হলে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিজলিরা আত্মগোপন করে গহিন অন্ধকারে। পাহাড়ের মতো অটল তাদের দৃঢ়তা। এই জানবাজ মুজাহিদদের কপালে সর্বদা লেগে থাকে সফলতার আলোকরেখা– সূর্যের কিরণের চেয়েও অধিক তেজি যার রশ্মি।

আরেক পক্ষ সাম্প্রদায়িকতা আর ঘৃণার যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, তারা কি জানে তার শিখা কতোদূর গড়িয়েছে? কতো লাখ বনি আদম পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে সেই আগুনে! জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কতো বাড়ি-ঘর। এ সবই ধর্মের নামে অনাচারে অভ্যস্তদের পাপের ফল। যারা একবারের জন্যও ভাবেনি যে, তাদের এই পৈশাচিকতা সম্পর্কে মহান সৃষ্টিকর্তা বেশ অবগত! তার শাস্তি তো বড়োই ভয়াবহ! অগণিত নিষ্পাপ প্রাণের প্রবাহিত রক্ত ইনসাফ প্রার্থনা করছে। এমন সময়ে ত্রাতা হয়ে আসেন সুলতান আলি কুলি খান, নাদের খান, স্বামী মনোহর লাল, শেখর, ফিরোজ খান, সাইয়িদ হায়দার ইমাম, রাম দাস, গোপালজিসহ আরও অনেকে।

শুরু হয় ইতিহাসের এক নয়া দাস্তান।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাজকুমারী

দ্য সিক্রেট অব দ্য টেম্পল

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাজকুমারী ১

দ্য সিক্রেট অব দ্য টেম্পল

ড. করম হোসাইন শাহরাহি

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
[অনূদিত]

নবপ্রকাশ
শুধু বই নয়...
ইসলামী টাওয়ার [দোকান নং ২০]
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৪ ৮৮৮৪৪১

www.pathagar.com

রাজকুমারী
দ্য সিক্রেট অব দ্য টেম্পল
মূল : ড. করম হোসাইন শাহরাহি
অনুবাদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

প্রকাশক : নবপ্রকাশ
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৬
দ্বিতীয় প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৭
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ : কারুকাজ
নামলিপি : কাজী যুবাইর মাহমুদ

মূল্য : ৩০০ [তিনশত] টাকা মাত্র

RAJKUMARI : THE SECRET OF THE TEMPLE
by Dr. Karam Hussain Shahrahi
Translated by Kazi Abul Kalam Siddique
Price : 300.00 BDT US$ 12.00 only

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash
e-store: rokomari.com/noboprokash
ISBN: 978-984-92654-0-5

www.pathagar.com

বিনির্মাণের পূর্বকথা

অতীত মানেই তো ইতিহাস। আজকের ঘটনা আগামী দিনে পরিণত হবে ইতিহাসে। প্রত্যেক জাতি, প্রতিটি দেশ, এমন কি প্রত্যেক মানুষের জীবনে কিছু না কিছু ট্র্যাজেডি থাকে। থাকে উপাখ্যান। থাকে উপদেশে ভরা ইতিহাস। যদিও ইতিহাস থেকে খুব কম মানুষই শিক্ষা নিয়ে থাকে। আদিকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইতিহাসের এ এক নির্মম পরিহাস! মুসলমানদের ওপর আজ এমন একটা সময় অতিক্রম হচ্ছে– যখন ইতিহাসপাঠের প্রয়োজনীয়তা ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি শিথিল এবং দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে চলেছে। ইতিহাসপাঠের উপকারিতা আর শিক্ষা আমাদের কাছ থেকে লোপ পাচ্ছে ভয়াবহমাত্রায়। গভীর আর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে আমরা বিমুখ হয়ে পড়েছি অনেক আগেই।

অথচ ইতিহাস পাঠের অপরিহার্যতা কতোটুকু? ঐশী নির্দেশ এসেছে অতীত জাতিগুলোর ইতিকাহিনি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার। এ কারণে মুসলিম ঐতিহাসিকরা ইতিহাসচর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। পৃথিবীর বুকে জন্ম নিয়েছে ইমাম তাবারি, ইবনে ইসহাক এবং ইবনে সাআদ-এর মতো জগদ্বিখ্যাত অসংখ্য ইতিহাসবেত্তা।

পাঠক! অধৈর্য হয়ে হয়তো ভাবছেন– উপন্যাসের ভূমিকা লিখতে বসে এ আবার কিসের ঘোল! সমস্যাটা আসলে এখানেই। 'রাজকুমারী' গতানুগতিক ধারার কোনো উপন্যাস নয়; বরং এটি একটি ইতিহাসআশ্রিত, উপদেশনির্ভর ও বাস্তবঘনিষ্ট উপন্যাস। ঐতিহাসিক উপন্যাস। অবিভক্ত আসাম-বাংলার প্রধান দুই সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমান তাদের নিজস্ব বিশিষ্টতা নিয়ে এ উপন্যাসে উপস্থিত। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতিনীতি ও রুচির পার্থক্য দারুণ দক্ষতায় বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক ড. করম হোসাইন শাহরাহি।

www.pathagar.com

আজ থেকে ৪-৫শ বছর আগে আমরা যখন অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে ছিলাম– তখনকার ইতিহাস। আসামের অত্যাচারী রাজা কৃষ্ণকুমার এবং বাংলার হাকিম আলি কুলি খানের মাঝে সংঘটিত লোমহর্ষক লড়াইয়ের বিস্ময়কর উত্থান-পতনে ভরা উপন্যাস।

হাকিম আলি কুলি খানকে চিনতে পেরেছন? না চিনলেও সমস্যা নেই। উপন্যাসটি যখন আপনি পড়া শুরু করবেন– মাঝপথেই পেয়ে যাবেন তার সাক্ষাত। মুগ্ধতায় প্রাণ ভরে যাবে আপনার। তবে তার আগে সহজে তার একটি পরিচয় জেনে নেয়া যায়।

মোগল সম্রাট আকবর ও তার ছেলে জাহাঙ্গীরের নাম অবশ্যই শুনে থাকবেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সর্বশেষ স্ত্রীর নামও আপনার অজানা থাকার কথা নয়। নুরজাহান। হ্যাঁ, সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের সেই অমর প্রেমকাহিনি কারই বা অজানা! কিন্তু জানেন কি এই নুরজাহানের প্রথম স্বামীর কী নাম? না জানলে জেনে নিন, এই উপন্যাসের আলোচিত চরিত্র আলি কুলি খানই হচ্ছেন নুরজাহানের প্রথম স্বামী। তবে এই পরিচয়টি মাথায় না রেখেও আপনি 'রাজকুমারী' উপন্যাসটি পড়া শুরু করতে পারেন।

একদিকে উলঙ্গ লালসা, আর অন্যদিকে উৎপীড়িতের নিঃশব্দ ক্রন্দন। শূন্যতার মধ্যে দেহহীন অস্তিত্বের এক আশ্চর্য আখ্যান এই 'রাজকুমারী'। মোট পাঁচ খণ্ডের বিশাল আকারের উপন্যাস। এ উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস-সাহিত্যে এক অভিনব মাত্রা সংযোজন। সমগ্র মানবজীবনকে ধারণ করাই উপন্যাসের কাজ। আর এতে যেহেতু জীবনের বিচিত্র বিন্যাস থাকবে তাই এর পরিধি বিস্তৃত হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই একজন লেখকের পক্ষে জীবনটা ঠিকঠাক বুঝে নিয়ে একজীবনে দু-তিনটির বেশি প্রকৃত উপন্যাস লেখা প্রায় ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। ড. করম হোসাইন শাহরাহি সেই পথেই হেঁটেছেন। 'রাজকুমারী' ছাড়া তাঁর আর কোনো উপন্যাস আমরা পাইনি।

সত্যানুসন্ধানী ড. শাহরাহি বাস্তবতাকে আড়াল করে পাঠকনন্দিত হতে চাননি; বরং নিজে একজন পুরুষ হয়েও নির্দ্বিধায় উদ্ঘাটন করেছেন ধর্মের নামে অনাচারে অভ্যস্ত পুরুষজাতির বর্বরতা ও নীচতার অতল পাপাচার। কিছু কিছু নারী-পুরুষ যে পশুরই এক রূপ এবং দেশ-কাল-পাত্র ভেদে খুব বেশি পার্থক্য তাদের মধ্যে নেই এবং কখনো কখনো মুখোশের অন্তরালেও সেই একই পশুবৃত্তিচর্চাতেই তারা নিবেদিত– সে কথাই উঠে এসেছে 'রাজকুমারী'তে। বেশ কিছু সৎ, সংযমী নারী-পুরুষ চরিত্র এই উপন্যাস অবশ্যই আছে– যেমন আছেন আমাদের বাস্তব জগতেও, যারা পরম শ্রদ্ধেয় তাদের মনুষ্যত্ব গুণের জন্য।

www.pathagar.com

'রাজকুমারী'তে পশুবৃত্তির সেই ইতিহাস পাল্টানো সম্ভব হলেও, বাস্তবে কি তা এতোটা সহজ?

উপন্যাসটির বিভিন্ন আঙিনায় আমরা দেখতে থাকি– প্রশস্ত বাহুর অধিকারী ওই মুসলিম যোদ্ধারা জমিনের যে প্রান্ত দিয়ে হাঁটতে শুরু করে সে জমিনের প্রশস্ততা যেন মাথা নুইয়ে দেয় তাদের চরণতলে। এদের কারও তরবারি কোষমুক্ত হলে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিজলিরা আত্মগোপন করে গহিন অন্ধকারে। পাহাড়ের মতো অটল তাদের দৃঢ়তা। এই জানবাজ মুজাহিদদের কপালে সর্বদা লেগে থাকে সফলতার আলোকরেখা– সূর্যের কিরণের চেয়েও অধিক তেজি যার রশ্মি।

আরেক পক্ষ সাম্প্রদায়িকতা আর ঘৃণার যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, তারা কি জানে তার শিখা কতোদূর গড়িয়েছে? কতো লাখ বনি আদম পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে সেই আগুনে! জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কতো বাড়ি-ঘর। এ সবই ধর্মের নামে অনাচারে অভ্যস্তদের পাপের ফল। যারা একবারের জন্যও ভাবেনি যে, তাদের এই পৈশাচিকতা সম্পর্কে মহান সৃষ্টিকর্তা বেশ অবগত! তার শাস্তি তো বড়োই ভয়াবহ! অগণিত নিষ্পাপ প্রাণের প্রবাহিত রক্ত ইনসাফ প্রার্থনা করছে। এমন সময়ে ত্রাতা হয়ে আসেন নাদের খান, স্বামী মনোহর লাল, শেখর, ফিরোজ খান, সাইয়িদ হায়দার ইমাম, রাম দাস, গোপালজিসহ আরও অনেকে।

অনুবাদের সময় উপন্যাসটি আগাগোড়া পড়তে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। ভাষার কাঠিন্য বা কাহিনির জটিলতা নয়; ধর্মীয় উপাসনালয়ের পুরুষ নামীয় হিংস্র হায়েনাদের নির্লজ্জ নির্দয় রূপ দেখতে এবং নারীর অসহায়তাকে মেনে নিতে এই কষ্ট। দেবী বানানোর লোভ দেখিয়ে ধর্ষকামী, প্রতারক ও উত্যক্তকারী আসাম রাজার সেনাবাহিনীকে ভালোই শিক্ষা দেয়া হয়েছে উপন্যাসে। দেখা গেছে, এক মহারাজা– যিনি গতকাল পর্যন্ত পৃথিবীর বিশাল এক ভূখণ্ডের অধিবাসীদের ওপর ক্ষমতাবান ছিলেন, আজ তিনি মৃত্যুর জোয়ার-ভাটায় অসহায় নিঃস্ব হয়ে ভাসছেন। তিনি ভীত হয়ে, কম্পিত শরীরে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পানে তাকিয়ে আছেন। মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের সিংহের মতো প্রাণ আজ এক ক্ষুদ্রপ্রাণ চড়ুই পাখির মতো ভীত-সন্ত্রস্ত্র। উপন্যাসটিতে আরও একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আর তা হচ্ছে ধর্মের নামে ভণ্ডামির নানা চিত্র।

সেই ইতিহাস আবারও স্বরূপে ফিরে এসেছে। ইতিহাসের সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি ঘটে ঠিক কালে কালে, যুগে যুগে, অক্ষরে অক্ষরে এটা কোনো বোকাও বলবে না। ফেরাউন ও নমরুদের স্বেচ্ছাচারিতা, অহমিকা, খোদাদ্রোহিতার সাথে সাথে তাদের তখতে তাউস এর প্রকাশ ঘটেছিলো আসাম রাজা কৃষ্ণকুমারসহ অন্যান্য

www.pathagar.com

স্বেচ্ছাচারীদের বেলায়। তারা যেমন বিশ্বকে তাদের দাবা খেলার পাতায় রেখে ভাগ বাটোয়ারা করতো, আজকের বিশ্ব পরিস্থিতি কি তার চাইতে ভিন্ন? কাশ্মিরকে অস্ত্রের মুখে নিশ্চিহ্ন করার ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পৌত্তলিক আগ্রাসন, আফগানিস্তান-ইরাককে দখল করে লাখ লাখ নিরীহ মানুষকে হত্যা, সোমালিয়ায় মার্কিন আগ্রাসন, তাতারি চেঙ্গিস খান আর হালাকুদের চাইতে কি এ ধ্বংসযজ্ঞ ভিন্ন? নাম-ধামের পার্থক্য থাকলেও মূল দৃশ্যটা কিন্তু একই। ইতিহাসের এই অধ্যায়ের সাথে সে অধ্যায়ের পরিস্থিতি ও মূল ভাবধারার মিল রয়েছে। যুগ, কাল, তামাদ্দুনিক অবস্থা ভিন্ন হলেও প্রকৃত অবস্থাটি এক ও অভিন্ন।

একটি রোমহর্ষক ঐতিহাসিক উপন্যাস হলেও 'রাজকুমারী'র আবেদন তাই সর্বকালীন সময়োপযোগী। এটি অনুবাদ করে প্রকাশ করার সাহসী এক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর। তিনি নিজেই বিশিষ্ট তার অভিনব লেখনীশৈলী দিয়ে। তার তীক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসা ও সরস ইতিহাসবিচার ইতোমধ্যে দেশবাসী, বিশেষ করে ইসলামি ঘরানার পাঠককুলকে দারুণ আপ্লুত করে রেখেছে।

এই উপন্যাস অনুবাদের মূল উদ্যোক্তা তিনিই। কাছের বন্ধু হিসেবে অনুবাদের প্রতি আমার প্রচণ্ড আগ্রহ হয়তো কখনো তার নজর কেড়েছে। তথ্য, শ্রম ও মেধা দিয়ে যেভাবে তিনি আমাকে অনুবাদকাজে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন– তা এক কথায় বর্ণনাতীত। তার আগ্রহ, ত্যাগ ও ক্ষরিত ঘাম আমাকে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য ঋণের শিকল পরিয়ে দিলো। মহান আল্লাহ তাআলার শোকর– তিনি আমাকে এই অনুবাদ কাজের জন্য কবুল করেছেন। শোকর গোজারি করছি।

নবপ্রকাশ-এর অবদানের বিষয়টিও প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যে তারা এই প্রাঙ্গনে বেশ জায়গা করে নিতে পেরেছে ইতোমধ্যেই। তাদের সহযোগিতায় বইয়ের কাজ দ্রুত গুছিয়ে আনতে প্রেরণা যুগিয়েছে। তামীম রায়হান ভাইকে নিয়ে ভীষণ ঈর্ষা হয় আমার– এমন ভাগ্য ক'জনের জোটে! জাগে বিস্ময়ও– এতো দূরে, তবুও কতো কাছে! স্বপ্নময় ভবিষ্যতে আরও কাছে রাখবেন– এ অনুরোধটুকু থাকলো।

'রাজকুমারী'-এর চলতি পথে ছোটো ভাই ওবাইদুল্লাহ ওবাইদ ও আহমাদ বাবরকে কৃত্রিম ধন্যবাদ না জানালেও তাদের সাথে আমার অকৃত্রিম সম্পর্ক থাকবে– এ আশা রাখতেই পারি। আমার ওপর যে তাদের অনেক ঋণ। আর ছোটভাই কাজী যুবাইর মাহমুদ! প্রচ্ছদের নামলিপি করে দিয়ে সে তার শিল্পীসত্তার প্রমাণ আরেকবার রেখে গেছে।

www.pathagar.com

পিয় পাঠক! বইটি'আপনার পড়া দরকার। আপনি যতো পাষাণ বা পাথুরে মনের অধিকারীই হোন– ধারণা করি, পাঠান্তে দু'ফোঁটা জল আপনার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়বেই। শিগগিরই 'রাজকুমারী' সিরিজের বাকি আরও চারটি খণ্ড প্রকাশ পাবে ইনশাআল্লাহ। এটা ভালো লাগলে সেগুলোও সংগ্রহ করতে ভুলবেন না। চলতি (প্রথম) সিরিজে সবেমাত্র কাহিনি শুরু। একের পর এক চমক আর শিহরণ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

কথা একটু বেশিই বলে ফেললাম। আশা করি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। অনুবাদ যথাসাধ্য সাবলীল ও সরল রাখার চেষ্টা করেছি। তথাপি মানুষ তার উৎসমূলের বাইরে নয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। এতে অজ্ঞাতসারে বা অসতর্কতাবশত ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসামঞ্জস্যতা, অসংলগ্নতা, বাতুলতা, বাক্য বা শব্দপ্রয়োগে জটিলতা কিংবা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। এগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে অবহিত করবেন বলে আশা রাখি। গ্রন্থটির উপকারিতা ব্যাপক হোক এবং এর সৌরভ বিশ্বাসী অন্তরগুলো সুরভিত করুক– এ প্রত্যাশায়

–কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

২০ আগস্ট ২০১৬

www.pathagar.com

রাজকুমারী-১

দ্য সিক্রেট অব দ্য টেম্পল

www.pathagar.com

দেবীর শুভাগমন

গোধূলির শেষ লগ্ন। সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে কিছুক্ষণ আগে। থেমে গেছে তার সোনালি রশ্মির খেলা। দিগন্তজুড়ে তারারা ঝিলমিল করছে। ভারি চমৎকার এক দৃশ্য। ঘরে ঘরে জ্বলছে সন্ধ্যাবাতি। পিদিম আর মশালের আলোয় ঝলমল করছে হাট-বাজারের অলিগলি।

ভদ্রেক। ছোট্ট একটি গ্রাম। অরণ্যে ঘেরা গ্রামটিকে ফুলবাগানের বধূ বলে আখ্যায়িত করা হয়। দশ হাজার জনসংখ্যা-অধ্যুষিত এই ভদ্রেক গ্রাম। এর অধিবাসী সকলেই হিন্দু। গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণে আছে একটি মন্দির। সারাক্ষণ এখানে কাঁসার ঘণ্টা বাজতে থাকে। গ্রামের চারদিকে বেশ উঁচু উঁচু প্রাচীর। ভেতরে প্রবেশ করার জন্য রয়েছে চারটি বড় বড় ফটক। অর্ধরাত পেরিয়ে গেলে ভেতর থেকে ফটকগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়।

রাম দাসের ঘর মন্দিরের কাছেই। রাতের অন্ধকার গভীর হয়ে গেলে মাথায় তিনি তিলক পরেন। এরপর ছোট্ট একটি কক্ষের দরজা খুলে তেপায়ার উপর পড়ে থাকা পিদিমটি জ্বালান। কক্ষের পশ্চিম দেয়ালের সাথে লাগোয়া চন্দন গাছের তৈরি সুদৃশ্য একটি চৌকির ওপর স্থাপন করা আছে ভগবানের পবিত্র মূর্তি। রাম দাস মূর্তির চরণযুগল খুবই ভক্তি নিয়ে স্পর্শ করেন। তারপর বেরিয়ে যান।

কিছুক্ষণ পর পুনরায় কক্ষে ফিরে এসে চম্পা ও গাঁদা ফুলের সতেজ একটি মালা পরান মূর্তির গলায়। ধূপ জ্বালিয়ে লোবান ছিটিয়ে মাথা নুইয়ে মগ্ন হয়ে পড়েন তপস্যা ও প্রার্থনায়। কক্ষের ভেতরে রাম হরি ওঁম-এর শব্দ বাড়তে থাকে।

পিদিমের হলুদাভ বিকিরণে মূর্তিটি চিকচিক করছে। রাম দাসের চেহারাজুড়ে উদ্বিগ্নতার ছাপ। দুশ্চিন্তার কালো আঁধার তার চোখেমুখে। তার বুড়িয়ে যাওয়া

www.pathagar.com

চোখের সাদা পালকের ওপর অশ্রুবিন্দু তিরতির করে কাঁপছে। মনের উদ্বিগ্নতা বেশ বোঝা যাচ্ছে তার মুখাবয়বে। আবেগের আতিশয্যে কেঁপে কেঁপে তিনি মূর্তিকে উদ্দেশ করে বলছেন–

'ভগবান! তুমি জানো, বহু যুগ ধরে আমি তোমার পূজা-অর্চনা করে আসছি। তুমি মহান হে ভগবান! তোমার শক্তি ছেয়ে আছে জগৎজুড়ে। ভগবান! এক্ষণে আমার জীবনের তরী দুলছে আশা-নিরাশার জলতরঙ্গে। তোমার সুমতি ও কৃপা বিনে আমি মৃত্যুর গহীন আঁধারে ডুবে যাবো। ভগবান! আমার ঝুলিটি শান্তির ফল্গুধারায় ভরে দাও!'

রাম দাসের দুই চোখ বেয়ে বৃষ্টির মতো অশ্রুধারা বইছে। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে তিনি অবিরত প্রার্থনা করে যাচ্ছেন। এমন সময় কে যেন বাইরের উঠোন থেকে ডাক দিলো– 'পণ্ডিত রাম দাসজি, কোথায় আছো?'

রাম দাস চাদরের কোনা দিয়ে অশ্রু মুছতে মুছতে জবাব দিলেন– 'গোপাল! আমি এখানে পূজাকক্ষে আছি।'

গোপাল মন্দিরে পূজা করে এসেছেন। তার পরনে গেরুয়া রঙের পোশাক। দরজার চৌকাঠে কাঠের তৈরি খড়মজোড়া রেখে তিনি রাম দাসের কাছে বসে বললেন, 'আমাকে মহাদেবজি তোমার কুশল জানার জন্য পাঠিয়েছেন। কী ব্যাপার! আজ তুমি আশ্রমে না এসে ঘরে বসে পূজা করছো? মন-মেজাজ ভালো তো, নাকি?' রাম দাস গোপাল পূজারির দিকে এক পলক তাকালেন। এখনো তার চোখ ভেজা। বেশ চেষ্টা করেও তিনি তা সংবরণ করে রাখতে পারেননি।

গোপাল তার কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'তুমি দেখি কাঁদছো! রাম দাসজি, কী ব্যাপার বলো তো?'

রাম দাস বললেন– 'গোপাল ভাই! আমি খুব পেরেশান। কী এক অজানা শঙ্কা আমার ভেতরটা কুচি কুচি করে কেটে চলেছে। মনে হচ্ছে, জটিল কোনো দুর্দশায় পতিত হতে চলেছি।'

গোপাল তাকে সান্ত্বনার সুরে বললেন– 'তুমি কন্যা বিমলার জন্য উদ্বিগ্ন, আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম। আসলে তোমাকে আমি একটি শুভ সমাচার শোনাতে এসেছি। তোমার কন্যা বিমলা ভগবানের কৃপায় জগন্নাথ দেবতার দেবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। আজ রাতে সে রথযাত্রীদের সাথে গাঁয়ে এসে পৌঁছাবে। মন্দিরে তাকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি চলছে। চিন্তা ক্ষান্ত দাও।'

www.pathagar.com

রাম দাস অবাক করা খুশিতে গোপালের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তুমি সত্য বলছো তো, গোপালজি? নাকি আমার মন ভোলাতে এমন বলছো?'

'না, পণ্ডিত রাম দাসজি! আমি ভগবানের মূর্তি সামনে রেখে মিথ্যে বলতে পারি না। আমি সত্যি করেই বলছি। বিশ্বাস না হলে বাইরে চলো তুমি, নিজ চোখে দেখে নাও গ্রামজুড়ে কেমন খুশির আমেজ বইছে!'

রাম দাস মূর্তির চরণে মাথা ঝুঁকিয়ে কাঁদছেন– 'ভগবান! তুমি আমার মনে শান্তি দিলে। তুমি দাতা। তুমি কৃপার অতল সাগর। তুমি এক নির্ধনকে ধনবান বানিয়ে দিলে!'

গোপাল রাম দাসের বাহু ধরে বললেন– 'ওঠো, বাইরে চলো। ভগবান তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন।' গোপাল ও রাম দাস পূজার কক্ষ থেকে বেরিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে পান পাহাড়ের চূড়ায়। শীতল জোছনার আলোয় ছেয়ে আছে চারদিক।

রাম দাস চাঁদের দিকে তাকিয়ে গোপালকে উদ্দেশ করে বললেন– 'গোপালজি! সৌম্য করো। আমাদের বিমলা দেবী হয়ে আসছে?'

গোপাল বিস্ময়ভরা চোখে তার দিকে ফিরে বললেন– 'আচ্ছা, আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না কেন? তোমার উদ্বেগ আর ব্যাকুলতার কারণ কী?'

রাম দাসের দৃষ্টি এখনো চাঁদের ওপর। কাঁপা কাঁপ কণ্ঠে বললেন– 'গোপাল! রাতে আমি এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখেছি। তখন থেকে এখন পর্যন্ত আমার অন্তরাত্মা ব্যাকুলতা আর উৎকণ্ঠায় ভরে আছে। অজ্ঞাত অদৃশ্য এক শঙ্কা; যা বিষধর সাপের মতো ফণা তুলে আমার মনের ওপর বসে আছে। নাগের ফুৎকারে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে কেঁপে উঠছে।'

'ভয়ানক স্বপ্ন!' গোপাল জিজ্ঞেস করলেন– 'কী স্বপ্ন দেখলে তুমি? আমাকে বলো। হতে পারে আমি তার ব্যাখ্যা দিতে পারবো। মহাদেবজি স্বপ্নের ব্যাপারে আমাকে জ্ঞান দিয়েছেন।'

রাম দাস বললেন– 'রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম...' এটুকু বলেই তিনি চুপ হয়ে যান।

'বলো, তুমি কী দেখেছো?' গোপাল অবাক দৃষ্টিতে মুখ নেড়ে বললেন।

রাম দাস মাথা নিচু করে ভাঙাস্বরে বললেন– 'গোপাল ভাই! কী বলবো! কিছু বলতে গেলেই আমার আত্মা শুকিয়ে যায়, জিহ্বা নির্বাক হয়ে যায়, শব্দের মালারা ছিঁড়ে যায়। সে এক ভয়ানক দৃশ্য। চার-পাঁচটি ভয়ংকর রাক্ষস আমাদের বিমলাকে থাবা মেরে মেরে রক্তাক্ত করে দেয়। সে ভারী ভারী

www.pathagar.com

মর্মন্তুদ আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলতে থাকে। কখনো আমার দিকে চেয়ে চেয়ে চিৎকার করছে, আবার কখনো ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করছে। হায়েনা রাক্ষসগুলো তার শরীরকে ক্ষুধার্ত সিংহের মতো ছিন্নভিন্ন করে রক্তাক্ত করে যাচ্ছে, অথচ কেউই তার সাহায্যে এগিয়ে আসছে না। আমি দেখেছি, বিমলার শরীর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যেতে থাকে। দেহের সব শক্তিই তার ফুরিয়ে যায়। নিষ্প্রাণ লাশের মতো পড়ে থাছে সে। গোপালজি! বিমলার আর্তচিৎকার এখনো আমার কানে গর্জন করে চলেছে। এ কারণে আমি তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

গোপাল কী ভাবতে গিয়ে বললেন– 'চিন্তা করো না পণ্ডিতজি! বিমলা সম্পূর্ণ ভালো আছে এবং ভগবানের অশেষ কৃপায় জগন্নাথ দেবতার দেবী হয়ে ফিরছে।'

গোপাল রাম দাসের বাহু ধরে বাইরে টেনে নিয়ে যান। একটু এগিয়ে আবার দেউড়ির দিকে এসে বললেন– 'দাঁড়াও, আমি দেবীজির কক্ষ ঠিক করে আসি। তিনি হয়তো বেশ ক্লান্ত।'

গোপাল বললেন– 'এ ব্যাপারে কোনো চিন্তা কোরো না। আশ্রম থেকে দেবদাসীরা এসে সব ঠিক করে দিয়ে যাবে।'

এখনো সে ঘরের দরজায় পা রাখেনি, এমন সময় চার-পাঁচজন দেবদাসী দরজার কাছে এসে হাজির। রাম দাস ও গোপাল পূজারিকে সামনে দেখে ওরা কুর্নিশ করে সমস্বরে নমস্কার বললো।

জবাবে রাম দাস ও গোপালও হাত জোড় করে নমস্কারের প্রত্যুত্তর দিলেন।

এক দেবদাসী রাম দাসের চরণযুগল ছুঁয়ে মুচকি হেসে বললো– 'ধন্যবাদ পণ্ডিতজি, ধন্যবাদ! বিমলা দেবী হয়ে আসছেন। আমাদের গ্রামকে ভগবান এক মহান দেবীর জন্মস্থান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আনন্দের ফুলে কলি ফুটেছে। আশার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়েছে।'

***

বিমলা অনিন্দ্যসুন্দরী ও উদ্ভিন্নযৌবনা এক যুবতী। নিটোল গোলাকার চেহারা। প্রশস্ত ললাট, পটলচেরা ডাগর নয়ন। উন্নত সরু নাসিকা। পাপড়ির মতো সুন্দর, মসৃণ ওষ্ঠাধর। উজ্জ্বল গৌর বর্ণের শরীরে যেন রূপের জোয়ার। অত্যন্ত লজ্জাবতী ও সরল-সুন্দর হৃদয়ের অধিকারিণী। দেখলে তার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে স্বর্গের অপ্সরীরা পর্যন্ত তার প্রেমে বিমুগ্ধ হবে।

www.pathagar.com

পিতা রাম দাসের সাথে বিমলার সম্পর্কটা আস্থার, বিশ্বাসের, ভালোবাসার আর কিছুটা ভয়ের। তিনি কখনো রাশভারী, গম্ভীর, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। কখনো আবার বন্ধুর মতো। সবকিছু মিলিয়ে ভালো লাগা এক দূরের তারা। এভাবে রাম দাসের সঙ্গে কন্যা বিমলার যে সম্পর্ক দানা বেঁধে ওঠে, মানসিকভাবে এ সম্পর্ক খুব গভীর কিন্তু দৃশ্যত এটি অনেক দূরের। অনেকটা আলো-ছায়াময়। একটু ভয়, একটু ভালোবাসাবাসির। তার আশ্রয় ছাড়া চিন্তা করা যায় না এক মুহূর্তও। আবার খুব কাছে গিয়ে জড়িয়েও ধরা যায় না।

বিমলার কাছে বাবা হলো বন্ধুর মতো। খেলাধুলা ও বান্ধবীদের বাদ দিয়ে তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা শুধু বাবা আসার মুহূর্তটির জন্য। মাথাব্যথা হলে মাথা টিপে দেয়া, বাবা কী খেতে বেশি পছন্দ করেন, কোন কাজটা বাবার অপছন্দ, কী করলে বাবা বেশি খুশি হন, কোন কাপড়টায় বাবাকে বেশি ভালো মানায়– সব দিকে খেয়াল বিমলার। কখনো মন্দির থেকে ফিরতে দেরি হলে রাত জেগে বসে থাকতো বাবার অপেক্ষায়। রাম দাসের স্নেহের পরশও কি কম! মেয়ের অসুখ হলে রাত জেগে বসে থাকা, মেয়ের শখ কতোটুকু পূরণ হচ্ছে, ভবিষ্যৎ কেমন হবে, কোথায় পাত্রস্থ করতে হবে– ইশ্, কতো কি চিন্তা বাবার! বাবার ভালোবাসা মাপার যদি কোনো যন্ত্র থাকতো, তাহলে সে নিশ্চিত সবার চেয়ে বিমলার প্রতি ভালোবাসার পরিমাণ অবশ্যই বেশি হতো।

রাম দাস দেবদাসীদের উদ্দেশ করে উদ্বেগের সুরে বললেন– 'আমার মেয়ে কোথায়? তোমরা কি তাকে দেখেছো? কেমন আছে সে? দেবীর রূপে আমার মেয়েকে কেমন দেখায়? সে তো আগে থেকেই কোমল, মোহিনী ও সুন্দরী।'

এক দেবদাসী বললো– 'পণ্ডিতজি! উদ্বিগ্ন হবেন না। এখনই এক দূত এসে বললো– দেবীর রথযাত্রী সীমান্তে প্রবেশ করেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেবী গ্রামে এসে পৌঁছাবেন।'

'তোমরা সকলে মিলে দেবীজির কক্ষ সাজাও। আমি পণ্ডিতজিকে নিয়ে দেবীকে অভ্যর্থনা জানাতে গ্রামের ফটকের কাছে যাচ্ছি।' রাম দাস গোপালের সাথে দ্রুত পা বাড়িয়ে মন্দিরের দিকে এগোতে থাকেন।

মন্দিরের বাইরে গ্রামের ঘরে ঘরে খুশির কোলাহল। মন্দিরের ভেতরে বাজছে কাঁসার ঘণ্টা। সর্বত্র আমজনতার কলরব। দিকে দিকে শোনা যাচ্ছে বাদ্যলহরি। গ্রামের যুবনেতা অজিত এগিয়ে এসে রাম দাসের সামনে কুর্নিশ

www.pathagar.com

করে বললো– 'পণ্ডিত রামজি! শুভেচ্ছা নিন। আপনার কন্যা জগন্নাথ দেবতার পবিত্র দেবী বনে গেছেন।'

রাম দাস মাথা নুইয়ে হাত জোড় করে বললেন– 'অজিত মহারাজ! এটা ভগবান ও জগন্নাথ দেবতারই কৃপা।'

বিশাল বিশাল আলোকবাতি আর মশালে জ্বলজ্বল করছে চারদিক। গ্রামের যুবতী-ললনাদের হাতে হাতে ফুলের তোড়া। আকাশের তারারা মুচকি হেসে হেসে আলোর বিকিরণ বিকিয়ে চলেছে জোনাকির পাশাপাশি।

কিছুক্ষণ পর খোলা হলো মন্দিরের সদর ফটক। মন্দিরের মহাদেব, পূজারি ও দেবদাসীরা শামিয়ানার নিচে বসা। সকলে হরি রাম... হরি রাম... ডেকে চলেছে। মহাদেব উভয় হাত শূন্যে ছড়াতে ছড়াতে বললেন–

'গ্রামবাসী!

ভগবান আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। এটা বড়ই শুভলগ্ন। আমরা জগন্নাথ দেবতা মহারাজের দেবীকে স্বাগত জানাতে এখানে সমবেত হয়েছি। বিমলা দেবী ভগবানের প্রিয়ভাজন হয়ে গ্রামবাসীর জন্য অগাধ মর্যাদা ও ঈর্ষণীয় সম্মান বয়ে আনছেন। জগন্নাথ দেবতা মহান শক্তিমান দেবতা। সাধারণ কোনো মেয়ের পক্ষে তার দেবী হওয়া সম্ভব নয়। তোমরা জানো, দেবতারা সুন্দর, কোমল ও মোহনীয় কুমারী কন্যাদের ভীষণ পছন্দ করেন। বিমলা দেবী ফুলের কলির মতো অনিন্দ্যসুন্দরী ও পূতঃপবিত্র। শুরু থেকেই এ ব্যাপারে আমাদের মাঝে জ্ঞান প্রকাশ পেয়েছিলো। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, বিমলা দেবীর মাধ্যমে এ গ্রামকে সম্মানিত করা হবে। খুশির গীত গাইতে গাইতে এগিয়ে যাও এবং দেবীজিকে খুবই ধুমধামের সাথে নিয়ে এসো! আমরাও তোমাদের সঙ্গে চলছি।'

লোকারণ্য অভ্যর্থনা-বহরটি নেচে-গেয়ে গ্রামের পশ্চিম দিককার ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। মহাদেব চলছেন আগে আগে। মেয়েরা মধুর কণ্ঠে গাইছে গান। হৃৎকম্পন বেড়ে চলেছে রাম দাসের। থরথর কাঁপছে পা-জোড়া তার। মহাদেব তার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'কী ব্যাপার পণ্ডিতজি! তোমার শরীর কাঁপছে কেন?'

রাম দাস হাত জোড় করে বললেন– 'আমার পক্ষে খুশি আর আনন্দের এ পাহাড় বহন করা সম্ভব হচ্ছে না!'

মহাদেব মুচকি হেসে বললেন– 'তুমি ঠিকই বলছো। বাস্তবিকই এ আনন্দের ভার পাহাড়ের চেয়েও ভারী।'

www.pathagar.com

গ্রামবাসী পশ্চিমের ফটকে পৌঁছালে দেখতে পায় দূরে বনের আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে আলোর মশালবাহী রথযাত্রী কাফেলা ধীরে ধীরে আসছে। ভেসে আসছে গরুর গাড়ির চাকার কটকট শব্দ। এছাড়া ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনিও শোনা যাচ্ছে।

মহাদেব উঁচু ফটকের ধারে পাথুরে টিলায় চড়ে বললেন– 'দেবীর জন্য রুপার পালঙ্ক ফুল দিয়ে ভরে দেয়া হোক। বিমলা দেবী ফুলের পাপড়িতে উপবিষ্ট হবেন।'

কিছুক্ষণ পরই কাফেলা এসে পৌঁছালো গ্রামের ফটকের সামনে। বিমলা ও কামিনী ঘোড়ার ওপর সাওয়ার হয়ে আছে। গ্রামের অন্য মেয়েরা গরুর গাড়িতে বসা। বমলাকে দেখার সাথে সাথেই 'দেবীর জয় হোক! জগন্নাথ দেবতার জয় হোক! ভগবানের জয় হোক!' ইত্যাদি স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে দিগ্‌বিদিক। আলোর ঝলকানি আর রঙিন ফানুসের প্রবাহে ঢের বোঝা যাচ্ছে তাদের আনন্দ উদ্‌যাপনের মাত্রা কতোটা তুঙ্গে।

মহাদেব সামনে এসে বিমলাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে বললেন– 'দেবীজি! তুমি মহান শক্তিমান। আমরা তোমাকে পালকিতে চড়িয়ে গ্রামে নিয়ে যেতে চাই।'

বিমলার দৃষ্টিজুড়ে গাম্ভীর্যের ছাপ। সে ঘোড়া থেকে নেমে চুপিসারে পালকিতে বসে যায়। মহাদেব রাম দাসকে ডেকে বললেন– 'আমি আর তুমি উভয়ে মিলে দেবীর পালকি বহন করবো।'

মহাদেব ও রাম দাস পালকি ওঠালে এতে বর্ষিত হতে থাকে ফুলের বৃষ্টি। কামিনীর ঘোড়া আগে আগে চলছে। কামিনীর চেহারা সব রকম আবেগ ও আমেজ হতে মুক্ত। মলিন মুখে সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। বিমলার পালকি মন্দিরের উঁচু শামিয়ানার নিচে রাখা হলো। বিমলা পালকি থেকে নেমে কুর্নিশ করে উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশে বললো–

'গ্রামবাসী!

আমরা বন-জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে বহু কষ্টে গ্রামে এসে পৌঁছেছি। তাই আমরা খুব ক্লান্ত। আমি বেশ আনন্দিত যে, তোমরা সকলে আমাকে উপলক্ষ করে আনন্দ উদ্‌যাপন করছো। এখন আমি বিশ্রাম নিতে চাই। আমাকে ঘরে যাবার আজ্ঞা দেয়া হোক।'

অজিত উভয় হাত উঁচু করে বললো– 'না, দেবীজি! তাড়াহুড়া করবেন না। আজকের রাতটি দিওয়ালির রাত। সারারাত আমরা নেচে-গেয়ে আমোদ-ফুর্তি করতে চাই।'

www.pathagar.com

বিমলা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললো– 'ঠিক আছে, তোমরা নাচো-গাও, আমোদ-ফুর্তি করো, আমি কাউকে নিষেধ করছি না। কিন্তু আমি অপারগ। ক্লান্তিতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছি। আমি বিশ্রাম নেয়ার অনুমতি চাই।'

মহাদেব আগ বাড়িয়ে বললেন– 'অজিতজি! ভালো পূজারিরা দেবী-দেবতাদের মনোবাসনা পালন করে থাকেন। দেবীর আশা ভগবানের আশা হয়ে থাকে।'

জনগণ নিশ্চুপ। বিমলা রাম দাসের দিকে তাকিয়ে বললো– 'পিতাজি! আমাকে ভর দিয়ে ঘরে নিয়ে চলো। আমার পা কাঁপছে।'

বিমলার চেহারাজুড়ে দুশ্চিন্তার ছায়া।

মহাদেব বললেন– 'বিমলাজি! তুমি পালকিতে বসো, আমরা তোমাকে কাঁধে নিয়ে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।'

বিমলা হাতজোড় করে বললো– 'না, মহাদেবজি না! তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমি পায়ে হেঁটে ঘরে যাওয়া পছন্দ করি। তোমরা সবাই এখানেই থাকো। আমাকে একা ছেড়ে দাও।' বিমলা রাম দাসের পদযুগল স্পর্শ করলো এবং পরে তার কাঁধে হাত রেখে মন্দিরের আসনের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো।

জনৈক পূজারি মৃদুস্বরে মহাদেবীকে বলছে– 'বিমলা দেবীর মনে খুশির রেশ নেই। অজানা কিসের হতাশা আর উদ্বেগ যেন তাকে ছেয়ে রেখেছে।'

মহাদেবজি পূজারিকে ধমকের সুরে বললেন– 'তুমি বড়ই দুর্ভাগা, সারাক্ষণ কেবল দুর্ভাবনা নিয়েই চিন্তা করতে থাকো। বিমলা খুশি থাকবেন না কেন? জগন্নাথ দেবতার দেবী হওয়া যেনতেন ব্যাপার নয়!'

বিমলা কাঁপা কাঁপা পা বাড়িয়ে ঘরের দিকে এগোলো। গ্রামবাসীর কোলাহল চলছে পেছনে পেছনে। ঘরের দরজায় পৌঁছে বিমলা পেছনের দিকে তাকিয়ে আগত জনতার স্রোতের দিকে তাকিয়ে বললো– 'আমি আবারও তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তোমাদের সবাইকে ফিরে যাওয়ার আজ্ঞা দিচ্ছি।' এটুকু বলেই সে দ্রুতপায়ে ঘরে প্রবেশ করে রাম দাসকে বললো– 'পিতাজি! দরজা বন্ধ করে দাও।'

রাম দাস জনসাধারণের দিকে সহাস্যবদনে তাকিয়ে বললেন– 'প্রিয় গ্রামবাসী! তোমাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।'

ঘরের ভেতর শুরু থেকেই উপস্থিত আশ্রমের মেয়েরা এক-এক করে বিমলার পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রণাম করছে। এরপর হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

আছে। বিমলাও তদুত্তরে হাত জোড় করে বললো– 'তোমাদের মন্দিরে যাওয়ার আজ্ঞা দিলাম।'

দেবদাসীরা চলে গেলে রাম দাস বললেন– 'বিমলা মা! তুমি তোমার কক্ষে গিয়ে বিশ্রাম নাও। আমি কিছুক্ষণ ভগবানের পূজা করতে চাই।'

বিমলা শূন্য শূন্য দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকালো। তার ভেজা ভেজা পলক এসে স্থির হলো রাম দাসের চেহারায়। চাঁদের ঝলমল জোনাকিরা মিতালি করছে বিমলার চেহারায়। তার সুগঠিত মস্তকে চিকচিক করছে লাল রঙের বিন্দিয়া। পরনে তার পাতা রঙের পোশাক। মাথার মিহি আঁচল ঝুলে এসে পড়েছে কাঁধের ওপর। গলায় চিকচিক করছে মুক্তার মালা। জোছনার আলোতে ক্ষণে ক্ষণে পাল্টাচ্ছে মুক্তার রঙ। এটা তাকে দেয়া হয়েছিলো জগন্নাথ দেবতার মহাত্মার পক্ষ থেকে। এই মালা বহন করে তার দেবী হওয়ার প্রমাণ। রাম দাস চিকচিক করতে থাকা মুক্তার মালার দিকে চেয়ে আছেন।

বিমলা বললো– 'পিতাজি! মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে চেনার চেষ্টা করছো? আমরা পরস্পর একে অন্যের জন্য অপরিচিত ভিন্ন মানুষ হয়ে পড়েছি। আমি অনুভব করতে পারছি যে, আমি সেই বিমলা নই যে আগে ছিলাম। আমার অভ্যন্তরে তুমি তোমার কন্যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছো! আমিও হারিয়ে যাওয়া প্রিয় পিতাকে সন্ধানের চেষ্টা করে যাচ্ছি। আজ আমরা একে অন্যকে হারিয়ে ফেলেছি।'

রাম দাস তার হাত ধরে বললেন– 'তুমি ক্লান্ত। তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন।'

'না!' বিমলা দৃঢ়কণ্ঠে বললো– 'আমার কিছুই হয়নি, পিতাজি! আমি জনসমাগম থেকে দূরে থাকতে চেয়েছি। আমিও তোমার সাথে ভগবানের পূজা ও দরশন করবো।'

বাপ-বেটি উভয়ে পূজাকক্ষে প্রবেশ করলো মৃদু মৃদু পা বাড়িয়ে। ভগবানের মূর্তির গলার কাছে পড়ে থাকা ফুলের মালা হতে সুবাস ছড়াচ্ছে। কক্ষে জ্বালানো হলো ধূপ।

বিমলা এগিয়ে এসে ভগবানের মূর্তির চরণ ছুঁয়ে খুবই ব্যথিত মনে বললো– 'তুমি তো কঠিন দুর্দশার সময় আমাকে ভুলে গিয়েছিলে। কিন্তু আমি তার পরও তোমার চরণসেবা করতে চাই। তুমি উত্তম ভগবান নও, কিন্তু আমি নিজেকে উত্তম সেবক হিসেবে পেশ করবো।'

www.pathagar.com

রাম দাসের চক্ষুদ্বয় ফুলে উঠলো ভয়ংকর মাত্রায়। তিনি এগিয়ে এসে বিমলার মুখের ওপর হাত রেখে বললেন– 'এরপর আর কিছু বলবে না, বিমলা! বলো, কখন কোন পরিস্থিতিতে তুমি ভগবানকে সাহায্যের জন্য ডেকেছিলে?'

বিমলা গভীর দৃষ্টিতে রাম দাসের দিকে তাকায়। রাম দাসের চেহারায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ছাপ। চোখজোড়া কাঁপছে। অজ্ঞাত ভয়ে কম্পন সৃষ্টি হয়েছে তার অন্তরাত্মায়।

বিমলার কখনো মনে হতো বাবা রাম দাস অনেক বেশি শাসন করেন। আবার কখনো মনে হতো বাবার কথাই ঠিক, আসলে সে-ই ঠিকমতো বুঝতে পারে না বাবাকে। মনে পড়ে ছোটবেলায় এক হাতে বাবার চুল আর আরেক হাতে গলা শক্ত করে বাবার কাঁধে চড়ে কতো ঘুরে বেড়িয়েছে পাড়াময়! সেই কাঁধ ছুঁতে এখন আর চেয়ারে কিংবা টেবিলে উঠে দাঁড়াতে হয় না, যেকোনো অবস্থায় দাঁড়িয়েই ছুঁয়ে ফেলতে পারে। অথচ এখন সেই প্রশস্ত কাঁধে চড়া তো অনেক দূর, ছুঁতেও পারে না। মনের মধ্যে কী এক সংকীর্ণতা কাজ করে। মাঝে মাঝে সে নিজেকেই প্রশ্ন করতো– আচ্ছা বাবা, সন্তানেরা বড় হলে কি লাজুক হয়ে যায়! মায়ের অনুপস্থিতিতে অভিমানী, ঝগড়াটে, বোকা বোকা বাবা সব সময় ছিলেন সেবাময়ী মায়ের ভূমিকায়।

বিমলার মনোলোভা চোখের কোণে অশ্রুর ফোঁটা। সে বললো– 'পিতাজি! এ যদি সত্যিকার ভগবান হয়ে থাকে, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করো, আমি তাকে কতোটা মর্মন্তুদ মুহূর্তে এবং চরম দুর্দশার সময়... কতোবার কতো আশা নিয়ে ডেকেছি!'

রাম দাস বিমলার দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন– 'আমি সেই কঠিন দুর্দশার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাই! এটা কি আমার সেই ভয়ানক স্বপ্ন...' তিনি তার কথা অর্ধেকে রেখে দিয়ে বলেন– 'কবে এবং কেন তুমি ভগবানকে ডেকেছিলে, মা?'

বিমলা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো– 'পিতাজি! দুঃখের ঘটনা শুনলে তুমি আত্মহত্যা করবে। সে এক ভয়াবহ রাত... অন্ধকার গর্ত... ভয়ংকর রাক্ষসগুলো উন্মুক্ত প্রান্তরে চিৎকার দিয়ে যাচ্ছিলো। ক্ষুধার্ত হায়েনার মতো সবগুলো রাক্ষস হামলে পড়ে আমার ওপর। পিতাজি! সে এক হৃদয়বিদারক মুহূর্ত। আমি ভগবানকে ডাকছিলাম অবিরাম। ভগবানের মূর্তিটি ছিলো আমার সামনেই। আমার ধ্বংসলীলার সময় এভাবেই সে হাসছিলো, যেমন এখনো সে হেসে যাচ্ছে। আমি তোমাকেও ডাকছিলাম অনবরত। পিতাজি!

www.pathagar.com

কোথাও হতে সাহায্যের কোনো আশ্বাস মেলেনি। তুমি তো অপারগ ছিলে, পিতাজি! কিন্তু তোমার এই ভগবান তো মহা শক্তিধর! সে তো সেখানে উপস্থিত ছিলো। তোমার ব্যাপারে আমার কোনো অভিযোগ নেই, পিতাজি! কিন্তু এই ভগবানের ওপর আমার আজীবন ঘৃণা থাকবে!'

রাম দাস বললেন– 'বিমলা! আমার অন্তরাত্মা ছিঁড়ে যাচ্ছে। আত্মা দেহপিঞ্জরের বন্দিত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে ছটফট করছে। তোমাকে আমার দিব্যি দিয়ে বলছি– ইশারা-ইঙ্গিত বাদ দিয়ে সোজাসুজি পরিষ্কার শব্দে আমাকে সেই ঘটনা শোনাও। আমার দেখা স্বপ্নটিই কি সত্যি ছিলো!'

বিমলা রাম দাসের বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার অশ্রুর বন্যায় রাম দাসের ক্রোড় ভিজে গেছে। তিনি বিমলার রেশমি কালো চুলের ওপর হাত বুলাতে বুলাতে বললেন– 'বিমলা মা! গতরাতে আমি এক মর্মান্তিক ও ভয়াবহ স্বপ্ন দেখেছিলাম। এ নিয়ে সারাদিন আমি ছিলাম বেশ শঙ্কিত। আমি স্বপ্নে দেখেছি– চার-পাঁচটি খুনি রাক্ষস তোমাকে থাবা মেরে রক্তাক্ত করেছে।'

বিমলা রাম দাসের দিকে তাকিয়ে আছে। এরপর চিৎকার করে বলছে– পিতাজি! তুমি আমাকে রাক্ষস আর বিষধর সাপের ভয়ানক জগতের দিকে কেন ঠেলে দিলে? তোমার কি জানা ছিলো না, মন্দিরের পূজারি ও মহাপুরুষ ধর্মাত্মারা কোমল কুমারী মেয়েদের সাথে কী ধরনের অনাচার করে? কেমন পিতা তুমি?'

রাম দাসের চোখ ফুলে উঠছে। মুখের ভাঁজে ভাঁজে ক্ষোভের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। তিনি বিমলার মুখখানি তার হাতে নিয়ে বললেন– '... তোমার সাথে মন্দিরে কোনো দুর্ব্যবহার করা হয়েছে?'

ক্ষোভে ফেটে পড়া বিমলা বললো– 'তুমি দুর্ব্যবহারের কথা বলছো, পিতাজি? আমাকে তো আত্মার গভীর পর্যন্ত আঘাত করা হয়েছে। দেবী হওয়ার উচ্চাশার বড় ভারি মূল্য আমার কাছ থেকে উসুল করা হয়েছে। আমার কাছ থেকে তোমার জীবনভর সঞ্চিত সম্ভ্রম ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, পিতাজি!'

রাম দাস বললেন– 'তুমি কী বলতে চাচ্ছো? বিমলা! ধৈর্যের দড়ি আমার হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে। তোমাকে আবারও আমার দিব্যি দিয়ে বলছি, সত্যি সত্যি বলো!'

বিমলা ভগবানের মূর্তির দিকে তাকিয়ে বললো– 'ভগবান! সৌম্য করো। তোমার অসহায়ত্ব ও নিরুত্তাপের রহস্য গোপন রাখা আমার জন্য দুষ্কর হয়ে

www.pathagar.com

পড়েছে। কারণ, একজন জীবিত-জাগ্রত, কথা বলতে পারা ও চলাচলে সক্ষম ইন্দ্রিয়সম্পন্ন ভগবানের দিব্যি আমাকে সবকিছু সত্য করে বলতে বাধ্য করেছে।'

এরপর সে হাত জোড় করে রাম দাসের দিকে তাকিয়ে বললো– 'তুমিও ভগবানের সমতুল্য, পিতাজি! তোমাকেও আমি ভগবান জ্ঞান করি।'

রাম দাসের সব মনোযোগ এক অজানা দুঃখ-শোকের মহাকাব্যের দিকে। বিমলার কপালে চুমুর প্রলেপ এঁকে দিয়ে তিনি বললেন– 'মা! মনে হচ্ছে তুমি বড় ভয়ংকর কোনো পরিস্থিতির শিকার হয়েছো! তোমার আত্মার ব্যথা তোমার চোখেও অনুভূত হচ্ছে। তোমার পিতার পক্ষে তোমার এ দুঃখগাথা শোনা সহজ নয়।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরব-নিস্তব্ধতায় কেটে যায়। বাইরে এখনো লোকজনের হই-হুল্লোড় ও গান-বাদ্য শোনা যাচ্ছে। মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টাও জোরেশোরে বেজে চলেছে। দীর্ঘক্ষণ বিমলা মাথা নিচু করে কাঁদতে থাকে। অতঃপর হঠাৎ সে রাম দাসের হাত ধরে চুমু দিয়ে বলে– 'সত্য করে বলো তো পিতাজি! জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের আলো-আঁধারির মাঝে সংঘটিত সেই অনাচারযজ্ঞ সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই?'

রাম দাস বিমলার মাথায় হাত রেখে বললেন– 'তোমার দিব্যি দিয়ে বলছি, মা! পূজা-অর্চনার বাইরে কোনো বিষয়ে আমার ধারণা নেই। বিশ্বাস করো আমার কথা!'

বিমলা চোখের জলে বুক ভিজিয়ে বলতে লাগলো– 'হ্যাঁ বাবা, আজ আমি বলবো। আমি সব সত্য তোমার সামনে উন্মোচন করে দিবো। তাতে আমার যা হবার হবে।'

www.pathagar.com

মন্দিরের নরপিশাচ

বিমলা আঁচলের কোণ দিয়ে চোখ মুছে বলতে শুরু করলো–

'পিতাজি! আমি বুকভরা আশা নিয়ে এখান থেকে রওনা হয়েছিলাম। দেবী চয়ন পর্বটি আমি একটি ধর্মীয় অনুষঙ্গ মনে করতাম। জগন্নাথ মন্দিরে আরতি ও অর্চনার মেলায় অংশ নেয়ার জন্য আসাম, নেপাল, ভুটান, বাংলা ও হিন্দুস্তানের দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী নিজ নিজ এলাকার সুন্দরী কুমারী কন্যাদের সঙ্গে নিয়ে সমবেত। তুমি তো বেশ ক'বার জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের যাত্রায় গিয়েছিলে। তোমার জানার কথা, দেবতার মন্দির কতো বিশাল ও প্রশস্ত এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। বাহির থেকে দেখতে কেল্লার মতো মনে হয়। মন্দিরটি বেশ উঁচু উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। যাত্রীদের অবস্থানের জন্য স্থানে স্থানে তাঁবু টানানো ছিলো। রাত-দিন হই-হুল্লোড়। উল্লাসের চেঁচামেচি। চতুর্দিকে আনন্দের বন্যা।

অনবরত চার দিন ধরে মন্দিরের মহাত্মা দেবী বাছাইয়ের জন্য মেয়েদের দেখে যাচ্ছিলেন। তিনি এক-একজন মেয়েকে কয়েকবার করে দেখেছেন। শেষে পঞ্চম দিনে তিনি প্রায় পনেরো জন মেয়েকে এক জায়গায় সমবেত করলেন। এরপর এক মহাদেব বললেন– 'কুমারী কন্যারা! তোমরা হাজারো মেয়ের মধ্যে সেরা সুন্দরী। কিছুক্ষণ পরেই মহাত্মাজি আসবেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কোনো একজনের গলায় দেবতা ভগবানের দেবী হওয়ার স্মারকস্বরূপ মূলবান মুকুট পরিয়ে দেবেন।'

মহাদেবরা একদিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের মন্দিরের ভেতরের দরজার সামনে রুপার সিংহাসনের ওপর বসানো হয়। কামিনী

www.pathagar.com

আমার সাথেই বসা ছিলো। আমাদের চেহারায় ফুলের রঙ ছড়ানো। দেবতা মহারাজের মন্দিরের দরজা খোলার আওয়াজ ভেসে আসে। মহাত্মাকে দেখা যায় দরজার সামনে। তার পেছনে দেবদাসীদের আনন্দ-উল্লাস। আমাদের মন অস্থির। হৃৎকম্পনে জলতরঙ্গের মতো এক পবিত্র অনুভূতির ছাপ ছিলো।

মহাত্মাজিকে দেখতেই আমরা সব মেয়েই মাথা ঝুঁকিয়ে এবং হাত জোড় করে প্রণাম করি। একজন মহাদেব চৌকাঠে চড়ে মহাত্মার পা ছুঁয়ে বললেন– 'মহাত্মাজি! আমরা ভালো করে দেখেশুনে এই কুমারী কন্যাদের মনোনীত করেছি। এ বছর আগত সকল সুন্দরী ললনার মধ্যে এরা সবচেয়ে মোহনীয়, কোমল ও অধিক সুন্দরী।'

মহাত্মার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাদের ওপর স্থির। আমাদের পেছনে হাজারো তীর্থযাত্রী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সর্বত্র পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছিলো। শেষে চৌকাঠের নিচে সিঁড়িতে শোনা যায় মহাত্মার খড়মের খটখট শব্দ। মহাত্মাজির পেছনে পেছনে একজন দেবদাসীও সিঁড়ি থেকে নামছে। তার হাতে ছিলো সোনার পাত্র। মহাত্মা ধীর কদমে হেঁটে হেঁটে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান। তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করেন– 'তোমার নাম কী? কোথা হতে এসেছো তুমি?'

তাঁর হাতের চাপ আমার আত্মা পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে। আমি চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম– 'আমার নাম বিমলা, আমি ভদ্রেক গ্রাম থেকে এসেছি।'

মহাদেব মৃদু হেসে বললেন– 'জগন্নাথ দেবতা ভগবান এখনই আমার মাঝে জ্ঞান প্রকাশ করেছেন– দেবতা তোমার সঙ্গে লগ্নের সম্বন্ধ করবেন। তুমি জগন্নাথ দেবতা ভগবানের সুন্দরী দেবী!'

আনন্দের আতিশয্যে আমার মাথা নুয়ে পড়ে। দুই চোখে পরম শান্তি ও প্রত্যাশার দীপ জ্বলতে থাকে। মন্দিরের ভেতর ঘণ্টা বেজে ওঠে। রুপা ও কাঁসরের ছোট ছোট বাদ্যের ঝংকার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে সর্বত্র।

মহাত্মা আমার হাত ধরে মন্দিরের দরজার উঁচু চৌকাঠের ওপর নিয়ে আসেন এবং হাত উঁচিয়ে তীর্থযাত্রী ও পূজারিদের উদ্দেশ করে বলেন– 'জগন্নাথ দেবতা ভগবানের তীর্থযাত্রী ও পূজারিরা! মহাদেব ও দেবদাসীরা! এই সুন্দরী নারী দেবতা ভগবানের দেবী। তার চরণতলে নুয়ে সকলে প্রণাম করো!'

www.pathagar.com

হাজার হাজার মানুষের মাথা আমার সামনে ঝুঁকে পড়ে। খোদ মহাত্মাও ঝুঁকে আমার চরণ স্পর্শ করেন। আমি তাকে ওঠানোর চেষ্টা করতে গিয়ে বললাম– ‘কী করছেন মহাপুরুষজি!’

মহাত্মা হাত জোড় করে বলেন– ‘তুমি দেবতা ভগবানের দেবী। দেবতার অর্ধেক শক্তির মালিক তুমি। তুমি মহান। আমরা সকলেই তোমার সেবক।’

আমার চতুর্দিকে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। নিজেকে আমি আকাশের নীল সাগরে সাঁতার কাটতে থাকা পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল ও মনোহর অনুভব করতে থাকি। রঙ-বেরঙের ফুলের বৃষ্টি বইতে থাকে আমার ওপর। অসংখ্য দেবদাসী আমার সামনে কাঁসা, ঘটি, বেহালা ও তবলা বাজিয়ে নেচে-গেয়ে যাচ্ছে।

মন্দিরের অভ্যন্তরে পৌঁছে মহাত্মা একজন প্রৌঢ় দেবদাসীকে উদ্দেশ করে বললেন– ‘রেখাজি! সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। তুমি দেবীকে বধূ হিসেবে সাজানোর জন্য বিশেষ কক্ষে নিয়ে যাও। তোমার তো জানা আছে, জগন্নাথ দেবতা ভগবান রাতের শেষ প্রহরের নিস্তব্ধতায় কুমারীর সাথে লগ্ন করা শুভ ও সমীচীন মনে করেন। এর পূর্বেই দেবীকে লগ্নের জন্য প্রস্তুত করে রাখা চাই।’

রেখা মাথা ঝুঁকিয়ে মহাত্মার চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করে। এরপর হাত জোড় করে বলে– ‘মহাত্মাজি চিন্তা করো না। আমি সব ব্যবস্থা করছি।’

এরপর রেখা আমার পা ছুঁয়ে হাত জোড় করে বললো– ‘দেবীজি! আমার সঙ্গে এসো।’

আমি রেখার পেছনে পেছনে চললাম। কামিনী এগিয়ে এসে আমার কানে কানে মৃদুস্বরে বললো– ‘বিমলা! আমার মনটা ঘাবড়ে আছে। মনে হচ্ছে, কোনো অঘটন ঘটতে যাচ্ছে।’

আমার অগ্রসরমান কদম কিছুক্ষণের জন্য থমকে যায়। আমি বললাম– ‘কামিনী! তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।’

রেখা পেছনে ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে বললো– ‘তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন, দেবী?’ আমি কামিনীর দিকে তাকিয়ে বললাম– ‘রেখা! এই হচ্ছে কামিনী। আমার বাল্যকালের সখী। আমি তাকে আমার সঙ্গে রাখতে চাই।’

www.pathagar.com

রেখা বিরক্তিভরা চাহনিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো– 'দেবী! তুমি এখন আর সাধারণ মানুষ নও। তুমি তো জগন্নাথ দেবতা ভগবানের দেবী। জগৎ-সংসারের সাথে তোমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। দেবতা ভগবান ছাড়া অন্য কারও তোমার সাথে থাকবার কোনো অধিকার নেই।'

এরপর সে তির্যক দৃষ্টিতে কামিনীর দিকে তাকিয়ে বললো– 'কামিনীজি! এখান থেকে চলে যাও। তুমিও বেশ সুন্দরী কুমারী নারী। তোমার রাতও রঙিন স্বপ্নে কাটবে। আমি ক'জন মহাদেবের দৃষ্টিতে তোমার জন্য কামনার ঢেকুর তুলতে দেখেছি।'

কামিনী রাগে-ক্ষোভে বললো– 'আমি দেবতা ভগবানের পূজার জন্য এসেছি! মন্দিরে আশ্রয় নেয়া ভয়াল হিংস্র হায়েনাদের নাপাক কামনা ও পাশবিক মনোবাসনা পূরণ করতে আসিনি! আমি পূতঃপবিত্র ও কুমারী নারী। আমি কাউকে আমার কোমল শরীর নিয়ে খেলা করতে দেবো না!'

'রাম রাম'... রেখা কানে হাত দিয়ে অবজ্ঞার সুরে বললো– 'তুমি মহাদেবদের হিংস্র হায়েনা বললে? তুমি পাপী, তুমি বিধর্মী নাস্তিক! আমি তোমাকে সৌম্য করলাম, এখান থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যাও! কোনো পূজারি যদি তোমার ভাষণ শুনে ফেলে, তাহলে তোমার শবদেহ এখান থেকে যাবে।... ' এরপর সে কাছ দিয়ে যাওয়া একজন পূজারিকে ইশারা করে বললো– 'এই মেয়েকে মন্দিরের বাইরে বের করে দাও।'

ক্ষোভে ফেটে পড়া কামিনী বললো– 'বাইরে যাওয়ার রাস্তা আমি ভালো করেই চিনি। আমি নিজেই চলে যাবো। কারো সহায়তার প্রয়োজন নেই।'

রেখা বললো– 'ঠিক আছে, চলে যাও।'

কামিনী ফিরে যাবার সময় বললো– 'শোনো রেখা! বিমলা দেবী আমার সখী। তার যদি কিছু হয় কিংবা কেউ যদি তার সাথে দুর্ব্যবহার করে, তাহলে আমি ক্ষমা করবো না। আমি ভদ্রেকের সরদার অজিতের বোন!'

'যাও যাও!' রেখা রাগতস্বরে বললো– 'এখানে অসংখ্য অজিত মাথা ঠেকাতে আসে। এটা দেবতা ভগবানের মন্দির, কোনো সরদারের অন্দরমহল নয়!'

আমি হতাশা আর দুশ্চিন্তার সাগরে ডুবে গেলাম। আমার সামনে দূরে বহু দূরে কেবলই অবিশ্বাসের ছায়া ঘনীভূত হতে থাকে। বেশ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম।

www.pathagar.com

রেখা আমার হাত ধরে বললো– 'মনটাকে ময়লা করবে না, দেবী। তুমি মহান শক্তিশালী দেবতার দেবী হয়ে গেছো। জগন্নাথ দেবতার সাথে তোমার সম্বন্ধ হতে যাচ্ছে। জীবনের এক নতুন পথের পথিক তুমি। তোমার আত্মায় জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত বিকাশমান হবে। তোমার সখীর কথায় ভ্রূক্ষেপ কোরো না।'

রেখার পেছনে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে বেশ ক'টি কক্ষ অতিক্রম করে বিশাল প্রশস্ত ও দৃষ্টিনন্দন এক কক্ষে এসে পৌঁছালাম। সূর্য এখনো অস্ত যায়নি, কিন্তু এখানে ভীষণ অন্ধকার। ফানুস ও মশাল জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। কক্ষটির পরিবেশ বেশ ভয়াল ও জাদুমন্ত্রের মতো মনে হচ্ছিলো। এখানে চার-পাঁচজন দেবদাসী আগে থেকেই অবস্থান করছে।

রেখা তাদের উদ্দেশ করে বললো– 'দেবীকে দেবতা ভগবানের লগ্নের জন্য উত্তমরূপে সাজিয়ে রাখো।'

এক দেবদাসী আমার চরণযুগল ছুঁয়ে বললো– 'দেবীজি! তুমি তো সাজানোর আগে থেকেই সুন্দরী। পূর্ণিমার চাঁদের মতো কোমল ও মোহিনী তোমার অঙ্গ।'

'তা তো ঠিক আছে, তার পরও মহাত্মাজির নির্দেশ।' রেখা বললো।

... আমাকে একটি স্নানাগারে নিয়ে স্নান করিয়ে দেয়ার পর সোনালিরঙা পোশাক পরিয়ে দেয়া হয়। পোশাকটি এতো সুন্দর ছিলো যে, এতে আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যাচ্ছিলো। আমি অসম্মতি জানালে রেখা বললো– 'দেবীজি! এখানে অসম্মতি চলে না। এখানে সকল কর্মকাণ্ড দেবতা ভগবানের ইচ্ছে অনুযায়ী হয়ে থাকে। দেবীকে এমন পোশাকই পরতে হয়। অর্ধরাতে তোমাকে এই পোশাকের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দেয়া হবে।'

আমি বিস্মিত সুরে বললাম– 'এর কী মানে?'

রেখা আমার কপালে রাখি মেখে বললো– 'তোমার যৌবন দেবতার পবিত্র আমানত।'

আমি বললাম– 'যৌবনের কথা বলছো কেন? আমি তো কুমারী কন্যা।'

রেখার চোখে এক ভয়ংকর ধরনের শয়তানি চমক সৃষ্টি হয়েছে। সে নাগিনীর মতো চেঁচিয়ে বলে– 'তুমি কুমারী, তুমি অনিন্দ্যসুন্দরী ও উদ্ভিন্নযৌবনা এক যুবতী। নিটোল গোলাকার চেহারা, প্রশস্ত ললাট পটলচেরা ডাগর নয়ন।

www.pathagar.com

পাপড়ির মতো সুন্দর, মসৃণ ওষ্ঠাধর। উজ্জ্বল গৌর বর্ণের শরীরে যেন রূপের জোয়ার। তুমি ফুলের মতো কোমল-মনোহর। এটাই তো সৌভাগ্য। তোমার এই কুমারীত্ব তোমাকে দেবীর আসনে ঠাঁই দিয়েছে। নিজ যৌবন ও সৌন্দর্যের ওপর গর্ব করো। যৌবনের রূপ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করা পাপ নয়।'

একজন দেবদাসী আমাকে একটি রেশমি জামা পরিয়ে দিলো। সেই জামায় বোতামের স্থলে মূল্যবান হীরা তারার মতো চিকচিক করছে। এরপর আমাকে সুসজ্জিত এক পালঙ্কে বসানো হয়। ধীরে ধীরে রাত গভীর হয়ে আসছিলো। কিছুক্ষণ পর পর নতুন নতুন দেবদাসীরা নিত্যনতুন রঙে-ঢঙে নেচে-দুলে কক্ষটিতে আসা-যাওয়া করছে এবং আমার চরণযুগলে চুমু খেয়ে প্রণাম করে করে চলে যাচ্ছে।

এখনো রাতের প্রথম প্রহর। এক মহাদেব আমার কক্ষে প্রবেশ করে হাত জোড় করে বললেন– 'নমস্কার!' এরপর তিনি লোভনীয় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'দেবীজি! ভগবান জগন্নাথ দেবতা চরণসেবার নিমিত্তে আপনাকে তলব করেছেন। সুমিতা দেবীর শেষ নৃত্যবিদ্যা আরম্ভ হতে চলেছে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম– 'শেষ নৃত্যবিদ্যা কী?'

মহাদেব মৃদু হেসে বললেন– 'গত বছর সুমিতা দেবী জগন্নাথ দেবতা ভগবানের মনোরঞ্জনের দেবী ছিলেন। কাল রাত পর্যন্ত তিনি এই পালঙ্কে দেবীরূপে আসীন ছিলেন– যেখানে তুমি এখন বসে আছো। আজ রাতে তিনি দেবতা ভগবানের সামনে শেষ নৃত্য দেখাবেন। এরপর তিনি দেবীর রাজমুকুট তার মাথা থেকে তুলে তোমার মাথার ওপর রাখবেন। এভাবে তুমি জগন্নাথ দেবতার জগতের রানি হয়ে এক বছর পর্যন্ত পূজারিদের মনমুকুরে রাজত্ব করবে। সুমিতা খুব ভালো নৃত্য করেন। তাকে মাথুরার দেবদাসীরা নাচ শিখিয়েছে। তার অঙ্গে অঙ্গে বিদ্যুৎ চমকায়।'

রেখা মহাদেবকে উদ্দেশ করে বললো– 'তুমি চলে যাও, মহাদেবজি! আমি দেবীকে নিয়ে আসছি।'

'ঠিক আছে।' মহাদেব চলে গেলে রেখা বললো– 'দেবীজি! ভোজন এখনই করবে নাকি নাচবিদ্যা দেখার পর?'

আমি বললাম– 'ক্ষুধা নেই। পরে দেখা যাবে।'

www.pathagar.com

'তাহলে চলো।' রেখা বললো। আমি পালঙ্ক থেকে নেমে কক্ষের বাইরে এলাম। দীর্ঘ একটি রাস্তা অতিক্রম করার পর একটি মেহরাবি দরজাবিশিষ্ট কক্ষের সামনে পৌঁছালাম। রেখা আমাকে দাঁড় করিয়ে বলতে আরম্ভ করে– 'শোনো দেবী! তুমি কুমারী কন্যা। মনে হচ্ছে তুমি এমন বিচিত্র ও নতুন নেশার জগৎ আগে কখনো দেখোনি। নারীকে নরের শান্তি ও তৃপ্তির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। নর-নারী যখন লগ্নে মত্ত থাকে, তখন বিশ্বজগৎ রঙে-রূপে ভরে ওঠে। লগ্ন হচ্ছে দেবতাদের মনোবাসনার কাজ। ভয় ও লজ্জার কিছু নেই। দেবতাদের প্রকৃতি ভিন্ন ও বিচিত্র হয়ে থাকে। তুমি আমার কথা বুঝতে পারছো তো? দেবতা ভগবানের স্থানে তুমি জীবনের নতুন রঙ-তামাশা দেখতে পাবে। হয়তো প্রথম দিকে জীবনের নতুন এই রূপ তোমার ভালো লাগবে না। প্রত্যেক কুমারী সুন্দরী নারী শুরুর দিকে ব্যথিতমনা হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যথার এই আঘাত ও কষ্ট দীর্ঘস্থায়ী হয় না। দ্রুত আশা-কামনার রঙমহলের ইমারত তৈরি হয়ে যায়। আরাম ও ঐশ্বর্যের সাগরে তুমি ডুবে যাবে তখন। কিছুক্ষণ পরেই জগন্নাথ দেবতা ভগবানকে নতুন এক রূপে দেখতে পাবে। ভয় পাবে না। ভয় পেলে কিন্তু তুমি ভীষণ অনুতপ্ত হবে। সেই অনুতাপের অনলে দগ্ধ হবে আজীবন।'

আমি বললাম– 'রেখাজি! তুমি কেমন ভয় ও আশঙ্কার কথা বলছো? দেবতা ভগবানের রূপ দেখে আমি ভয় পাবো কেন? দেবতা তো দেবতাই হয়ে থাকেন।'

রেখা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললো– 'মনে হচ্ছে তোমার ওপর জ্ঞান প্রকাশ হচ্ছে। তোমার ওপর দেবতা ভগবানের বড়ই কৃপা আছে।'

রেখা কক্ষের দরজা খুলে দিলো। এক নতুন জগতে পা রাখলাম আমি। কক্ষটি বেশ বড় ও প্রশস্ত। অসংখ্য মহাদেব ও পূজারি এখানে উপস্থিত। ধূপ ও আগরের ধোঁয়ায় চারদিক ছেয়ে আছে। অনেকগুলো বাতি ও মশাল জ্বলছে। ছাদে রঙিন বোতলের ফানুসগুলোও জ্বলজ্বল করছে। কক্ষের উত্তর দেয়ালের কাছেই রুপার সিংহাসন। সেখানে জগন্নাথ দেবতার বিশাল আকৃতির মূর্তি। ভাস্কর যেন তার মনের সকল কালিমা আর পঙ্কিলতা এই দেবতার পেছনে ব্যয় করেছে। দেবতার এই রূপ বড়ই ভয়ংকর। ভগবানের মূর্তিটিতে কোনো নর-নারীর সাথে লগ্নের স্পৃহা ও ব্যাকুলতার সময়ের চিত্র ফুটে উঠেছে।

www.pathagar.com

আমার চলমান গতি থমকে যায়। মনে ধড়ফড় শুরু হয়ে যায়। চরম আতঙ্কিত আমি। মহাত্মা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার আতঙ্কিত অবস্থা দেখে দ্রুত আমার কাছে এসে বললেন– 'কোন ভাবনায় ডুবে আছো? দেখো, দেবতা ভগবান তোমার জন্য তার দুই বাহু ছড়িয়ে আছেন। এগিয়ে এসে দেবতার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হও!'

আমি ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক দেখলাম। দেয়ালের সাথে দেবতাদের মূর্তির সারি। উলঙ্গ মূর্তিগুলোর ছায়ার নিচে উলঙ্গ পূজারিরা উলঙ্গ দেবদাসীদের সাথে উলঙ্গপনায় রত। মহাত্মা আমাকে উঠিয়ে জগন্নাথ দেবতার উন্মুক্ত আসনে তার কোলের মাঝে বসিয়ে দেন। এরপর বুঝতে পারিনি কীভাবে দেবতা ভগবানের ভারী পাথরে তৈরি হাতের মুঠো আমার বুকে এসে পড়েছে।

শুভাশিসের ধ্বনি উচ্চকিত হতে থাকে। আমার কপালসমেত মাথা লজ্জায় নুয়ে পড়ে। চোখের সামনে অন্ধকার ঘনীভূত হতে আরম্ভ করে। আর আমি অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হচ্ছি। ঠিক সেই মুহূর্তে মহাত্মা করতালি দিয়ে কক্ষের পশ্চিম দিকের দরজা খুললেন। সাথে সাথে দেবদাসীদের কোলাহলের মধ্যে দেখা যায় সুমিতা দেবীকে। কাঁসর ও রুপার ছোট ছোট ঘণ্টা বাজতে থাকে। সুমিতা ও প্রিয় দেবদাসীদের পোশাক ছিলো একই রকম। সে জাদুর পাতিলের মতো উড়ে উড়ে থরথরিয়ে নাচতে থাকে। পেছনে থাকা বাদকেরা সানাই ও বাঁশি দিয়ে মৃদু তালে বাজনার ঝংকার তোলে। দেবদাসীদের পায়ে সোনার নূপুরে ছনছন ঝনঝন ধ্বনি। হেলেদুলে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিতে নৃত্য করে চলেছে। তারা এমনভাবে ঊর্ধাবরণ ওপরের দিকে তুলছে, যেন আকাশ কোনো কুমারী দেবীর অপেক্ষার প্রহর গুনছে।

বাজনার শব্দ আরো কিছুটা তীব্র হতে লাগলো। সেই সাথে শোরগোল, হই-হুল্লোড়ও বাড়তে থাকে। চারদিকে উন্মাদনা।

এমন সময়ে সুমিতা দেবী নৃত্যরত দেবদাসীদের দলে প্রবেশ করলো। তার কাঁধে হলদে রঙা লেহেঙ্গা, যা পায়ের পাতা পর্যন্ত দুলছে। পায়ে সোনার নূপুর। রেশমের পোশাকের স্থানে স্থানে হীরার জরি। আমি দম বন্ধ করে তার কীর্তিকাণ্ড দেখছিলাম। তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশ কোমল ও মনোহর। গোলাপের মতো ঠোঁট যেন কলি ছড়িয়ে হাসছে। তারার মতো আলোকোজ্জ্বল তার নয়নযুগল। এ চোখের জাদুতেই যেন মাতোয়ারা গোটা বিশ্ব।

www.pathagar.com

বাদ্যের তালে কিছুটা বিরতি দেখা যায়। সুমিতার চরণযুগল নড়তে থাকে। ধীরে ধীরে তার নৃত্যশৈলী বাড়তে থাকে। দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকে এ নৃত্য। নৃত্য করতে করতে সে জগন্নাথ দেবতার মূর্তির দিকে অগ্রসর হয়। দেবতা ভগবানের একেবারে কাছে এসে সে একেবারে চুপ হয়ে যায়। এরপর সুমিতা এমনভাবে মাথাকে পেছনের দিকে বাঁকা করতে থাকে যে, এতে করে মাথার মুকুটটি তার পিঠে এসে ঠেকে।

বেশ কিছুক্ষণ সে এভাবে পল্টি খেয়ে থাকে। এরপর এক পলকে ফের সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ভারী ভারী পা উঠিয়ে সে আমার দিকে আসতে থাকে। তার চেহারা থেকে ঝরা ঘামের ফোঁটাগুলো মুক্তোর মতো দেখাচ্ছে। নুয়ে সে আমার পা স্পর্শ করে এবং মাথা থেকে রাজমুকুট উঠিয়ে আমার মাথার ওপর রেখে দেয়। উভয় হাত দিয়ে আবারও আমার পা ছুঁয়ে মৃদুস্বরে বলে– 'তুমি খুবই মোহনীয় সুন্দরী। জানি না, কীভাবে তুমি এ পাপের ভার ওঠাবে। এখানে না এলে তোমার কতোই না মঙ্গল হতো!'

সুমিতার এই মৃদুবাক্য আমি ছাড়া আর কেউ শুনতে পায়নি। আরো একবার আমি ভয়ের অতল গভীরে ডুবে গেলাম। পূজারি, মহাদেব ও দেবদাসীরা মদপান আরম্ভ করলো। চতুর্দিকে বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা ও আদিম অনাচার যৌনাচারের জোয়ার বইতে থাকে। ভগবান এবং দেবতাদের পূজারিরা দেবতার মূর্তির ছায়ার নিচে আদিম তৃষ্ণা নিবারণ করে চলেছে। চতুর্দিকে হাঁপানো কাঁপানো নিশ্বাসের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। এতে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম।

সুমিতার দুই চোখে অশ্রু। সে হাত জোড় করে বলছে– 'সম্ভব হলে তুমি এই বন্দীখানা থেকে পালিয়ে যাও।'

সে পেছনে সরে গেলে মহাত্মা এবং আরও চারজন মহাদেব আমাকে ধন্যবাদ জানাতে আসেন। ক'জন দেবদাসী আমাকে দেবতা ভগবানের উলঙ্গ আসন থেকে বের করে বললো– 'এখন দ্রুত আপনার পালঙ্কে আরোহণ করুন, দেবীজি! দেবতা লগ্নের সময় ঘনিয়ে এসেছে।' মহাত্মা খুবই গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– 'ভগবান তোমাকে সুমিতা দেবীর চেয়ে বেশি সৌন্দর্য দান করেছেন। তুমি নির্ঘাত আকাশ থেকে উড়ে আসা অপ্সরী।'

রেখার তত্ত্বাবধানে আমাকে আবারও পালঙ্কের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। আমার মন অদৃশ্য কোনো অঘটনের শঙ্কায় কাঁপছে। মনে হচ্ছে, আমার

www.pathagar.com

হয়তো কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে। আমি রেখার হাত ধরে বললাম– 'রেখা! আমার মনটা ভীষণ উদ্বিগ্ন। কামিনীকে ডেকে আনো। তার উপস্থিতিতে আমি স্থির থাকতে পারবো।'

'সৌম্য করুন, দেবী! দেবতা ছাড়া এখন এ কক্ষে আর কারও পা রাখার অনুমতি নেই। চিন্তা কোরো না। আগামীকাল সকালে যখন কামিনীর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে, তখন তুমি তাকে তোমার চেয়ে বেশি ক্লান্ত পাবে। ওই কচি কলির পেছনে আমি ক'জন ভ্রমরকে ঘুরতে দেখেছি।'

আমি রেগে গিয়ে বললাম– 'রেখা! তুমি এতো নির্লজ্জ, বেহায়া! একজন সতী কুমারী নারী সম্পর্কে তুমি এমন বাজে বাজে শব্দ উচ্চারণ করছো?'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে রেখা বললো– 'তুমি আমাকে নির্লজ্জ ও বেহায়া অপবাদ দিচ্ছো! তুমি তো দেবী হয়ে গেছো! এখন তোমার সামনে মুখ খোলার অনুমতি নেই। এখনই তুমি জীবনের যেই সত্যের মুখোমুখি হচ্ছো, তা তোমার কাছে এক সুন্দর স্বপ্নের মতো মনে হবে। এখন থেকে প্রতিদিন ভোরেই তুমি গোটা জগৎটাকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ও ছিন্নভিন্ন দেখতে পাবে। কিন্তু এমন লগ্নের শুভ রাতে ঘটিতব্য বিরক্তি ও ক্লান্তি বড়ই মনোমুগ্ধকর। বারবার ভেঙে পড়তে মন আনচান করবে। ঘন ঘন ক্লান্ত হতে মন চাইবে।'

কিছুক্ষণ পর একজন পূজারি কক্ষে প্রবেশ করে বললো– 'রেখাজি! দেবীকে দ্রুত প্রেমবটিকার মধু পান করাও। দেবতা লগ্নের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন।'

পূজারি চলে গেলে রেখা সোনার পাত্রে লাল রঙের একজাতীয় পানীয় আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে– 'এটা প্রেমবটিকার ওই মধু, যা আকাশে তৈরি করা হয়। এ মধু দেবী ও দেবতা ছাড়া অন্য কেউ পান করতে পারে না। এর প্রতি ফোঁটা জীবনের রঙ-রূপ ও শিরা-উপশিরায় শক্তির সঞ্চার করে। অফুরন্ত শক্তির সাগর এই মধু।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেবতার প্রেমবটিকার মধু পান করতে বাধ্য হই আমি। কিছুক্ষণ পর আমার ভেতর একধরনের মাদকতা ও নেশা নেশা ভাব উদ্রেক হয়। চোখজোড়া বুজে আসে।

এর কিছুক্ষণ পর আচমকা আমি অনুভব করি, কে যেন আমাকে বিবস্ত্র করছে। চোখ মেলে দেখি বৃদ্ধ মহাত্মা আমার ওপর ঝুঁকে আছেন। তার

www.pathagar.com

শ্বাস-প্রশ্বাসে জৈবিক তাড়নার উচ্ছ্বাস। আমি বাধা দিতে গিয়ে বললাম– 'আমি জগন্নাথের দেবী! এ কী হচ্ছে?'

মহাত্মা এক ঝটকায় আমার পোশাক ছিঁড়ে পালঙ্কের নিচে নিক্ষেপ করে বললেন– 'দেবী! আমি জগন্নাথ দেবতার অবতার! জগন্নাথ তোমার রাত্রি সুফল করার সমুদয় অধিকার আমাকে দিয়েছেন।' আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গলগলিয়ে পড়ছে। আমি মহাত্মার ভারের নিচে পিষ্ট হয়ে পাতালের দিকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলাম। মদের ক্রিয়া আমার সারা শরীর নিস্তেজ করে রেখেছিলো। এরপর মহাত্মা এক ভয়ংকর থাবায় এমন সব অঘটন ঘটান– যা কখনো কল্পনা ছিলো না। আশা-আকাঙ্ক্ষার সুরম্য তাজমহল ভেঙে চুরমার হয়ে যায় আমার।'

রাম দাসের একটি ভয়ংকর আর্তচিৎকার আকাশ-বাতাস মুখর করে তোলে। বিমলা তার কাঁধে মাথা রেখে বলতে থাকে– 'পিতাজি! তোমার অবলা কন্যা বিমলার ওপর নির্মম নির্যাতনের সব দৃশ্য লটকে থাকা ভগবানের মূর্তি দেখে যাচ্ছিলো। মহাত্মা বুনো কুকুরের মতো আমার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে হাঁপিয়ে পড়েছে। আমি ভগবানকে সাহায্যের জন্য বারবার ডাকছিলাম। কিন্তু সেই অন্ধ, বধির ও মূক ভগবান আমার কোনো সাহায্যে এগিয়ে আসেনি।

মহাত্মা ক্লান্ত হয়ে পড়লে আরেকজন মহাদেব আমাকে পালঙ্ক থেকে নামিয়ে বিছানার ওপর শুইয়ে দেয়। এরপর সারারাত হিংস্র সিংহের মতো থাবা মেরে মেরে শেষ করে দেয় আমার সারা শরীর। আমার সতীত্বের রক্তনদী বইতে থাকে। আমি এই পাশবিক নির্মমতায় বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলাম, বেহুঁশ হয়ে পড়ছিলাম। যখনই আমার হুঁশ ফিরে আসতো তখন কোনো না কোনো মহাদেবকে আমার বুকের ওপর চড়তে দেখতে পাই। সে এক ভয়াল দৃশ্য। ব্যথার তীব্রতায় আমার সারা দেহ চৌচির হয়ে যাচ্ছিলো।'

বিমলা চিৎকার দিয়ে বললো– 'পিতাজি! তুমি তো জানো, আঘাত দুই ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের আঘাতের দৃশ্য দেখা যায়, আরেক ধরনের আঘাতের ব্যথা দেখা যায় না। আমি উভয় আঘাতেই জর্জরিত। আমার চোখ দুটো বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অশ্রুনদী বইতে বইতে একসময় শুকিয়ে পড়ে। বারবার আমি ভগবানের মূর্তির দিকে তাকিয়ে মিনতি ভরা নিশ্চল চোখে বহু করে ডেকেছি, কিন্তু সেই নিষ্প্রাণ ও অনুভূতিশূন্য মূর্তিটি কেবল এক টুকরো

www.pathagar.com

পাথর বলেই বিবেচিত হতে থাকে। পাষণ্ড কুকুরগুলো ক্লান্ত হয়ে আমার কক্ষেই শুয়ে থাকে। রাত ফুরিয়ে এলে আমি বরবাদ হয়ে যাই।

পিতাজি! তোমার সারা জীবনের সঞ্চয় নিমিষেই লুণ্ঠিত হয়ে যায়। আমি এমনভাবে পালঙ্কের নিচে পড়ে রইলাম, যেমন কোনো শবদেহকে শ্মশানঘাটে লাকড়ির ওপর শোয়ানো হয়ে থাকে।

এরপর সকাল হয়ে আসে। ঘুমন্ত কোলাহল আবার জেগে ওঠে মুখরতায়। মহাত্মা ও মহাদেব আমার কক্ষ হতে বেরিয়ে যায়। রেখা দেবদাসীদের নিয়ে আমার কক্ষে প্রবেশ করে। সে আমার ছিন্নভিন্ন পোশাক গুছিয়ে দেয় এবং স্নানের জন্য প্রস্তুত করে। আমাকে স্নান করিয়ে দেয়া হয়। স্নান করানোর সময় সে খুব মন্দ ব্যবহার করে। কিন্তু আমি তখনো সকল প্রকার অনুভূতিশূন্য। এরপর আমাকে সোনালি রঙের পোশাক পরানো হয়।

আবারও আমাকে পালঙ্কে বসাতে গিয়ে রেখা খুবই রহস্যপূর্ণ হাসিতে বললো– 'মনে হচ্ছে, তুমি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছো। দেবতা ভগবান তোমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষত করে রেখেছেন। বলেছিলাম না লগ্নের সময় দেবতাদের শক্তি দ্বিগুণ হয়ে যায়! কিন্তু এখন ভগবানের কৃপায় তুমি চিন্তা করো না। একটি কঠিন দশা তুমি কাটিয়ে উঠলে। সামনে প্রতি রাতে তুমি আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে বড়ই ব্যাকুলচিত্তে দেবতাদের অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকবে।' রেখা খুবই বাজে মহিলা। তার চোখে জৈবিক তাড়নার ভাঁপ উড়ছিলো।

রাম দাস রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়ে বললেন– 'বিমলা! চুপ করো। আমার আত্মা রক্তাক্ত হয়ে গেছে।' এরপর তিনি ভগবানের মূর্তিকে উদ্দেশ করে বললেন– 'ভগবান! আমার সারা জনমের তপস্যার তুমি এ কী প্রতিদান দিলে! তোমার দুয়ারে তোমার সামনে আমাদের আশা আর স্বপ্নের সংসার এভাবে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হলো, জ্বলেপুড়ে অঙ্গার হলো; আর তুমি তা বড়ই নির্দয়ভাবে দেখে গেলে?'

বিমলা বললো– 'পিতাজি! এখনো আমার দুঃখভরা কাহিনি শেষ হয়নি। আমার এ দুঃখগাথা তোমাকে শুনতেই হবে।'

'না, বিমলা! না!' রাম দাস কান্নাভরা কণ্ঠে বললেন– 'আমি তোমার পিতা। পাথরের মতো নিষ্প্রাণ আর অনুভূতিহীন নই। আমার অন্তরাত্মা

www.pathagar.com

রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে। আত্মা মরে গেছে। আমি মরে গেছি। বারবার আমি মরতে চাই না।'

পরের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বিমলা বলতে থাকে– 'সকালে যখন মন্দিরের ঘণ্টা বাজতে থাকে হরে রাম হরে রাম এবং ওঁম ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো, তখন রেখা এসে বললো– 'এখন তুমি পূজারি, রথযাত্রী ও মহাদেবদের দরশন দেবে...।'

এরপর আমাকে মন্দিরের ওই অংশে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে বিশেষ ও সাধারণ সকল শ্রেণির পূজারি উপস্থিত ছিলো। আমাকে দামি গাছের তৈরি চেয়ারে বসানো হয়। পায়ে ফুলের মালা বেঁধে দেয়া হয়। মহাত্মা আমার চরণ ছুঁয়ে বললেন– 'সর্বাগ্রে দেবীজির চরণ স্পর্শ করার অধিকার আমাকে দেয়া হয়েছে।'

আমি যথেষ্ট ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে বললাম– 'তুমি তো রাক্ষস! আমার দৃষ্টিসীমা থেকে দূরে চলে যাও!'

এ কথা শুনে মহাত্মা রাগতস্বরে বললো– 'নিজের জবান বন্ধ রাখো। আমি মহাত্মা, আমার বহু রূপ আছে এবং আমার প্রত্যের রূপকে পূজা করা হয়। তামাশার সময় যা কিছু হয় আমার কৃপায় হয়।'

আমি বেশ ঘৃণার সুরে বললাম– 'তুমি বড় নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত, বড় পাপী তুমি!'

মহাত্মা সুর পাল্টিয়ে বললেন– 'তুমি অপদার্থ, তুমি অজ্ঞ। তোমার ওপর দেবতাদের প্রেম কল্পনার জ্ঞান প্রকাশিত হয়নি। ধোঁকা খেয়ে চলেছে তোমার দুই চোখ। সে আমি ছিলাম না। সেটা ছিলো জগন্নাথ দেবতার অবতার। যে রূপ পাল্টিয়ে পাল্টিয়ে তোমার সাথে মিলন করেছে। দেবতারা অগণিত রূপ ধারণ করে থাকেন। দেবতাদের প্রত্যেক রূপ কামনা করা হলে শক্তি বেড়ে যায়। আমি তো মহাত্মা। এছাড়া যদি রাতে জগন্নাথ দেবতা আমার রূপ ধারণ করে তোমার সঙ্গে লগ্নে মিলিত হন, তো আমি কী করতে পারি? আমি নির্দোষ।'

এরপর সে মৃদুস্বরে বললো– 'দেবতা ভগবানের কুদৃষ্টি হতে রক্ষা পেতে চাইলে মুখ বন্ধ রাখো।' এরপর সে মুখ ফিরিয়ে করতালি বাজালো।

একজন মহাদেবরূপী পশু হাত জোড় করে কক্ষে প্রবেশ করে। মহাত্মা বললো– 'দেবী রাজসিংহাসনে বিরাজমান হয়েছেন। পূজারিদের দরশনের জন্য আজ্ঞা দেয়া হলো।'

www.pathagar.com

মহাদেব ফিরে গেলেন। আমার কক্ষের দরজা সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেয়া হলো। লোকজনের মুহুর্মুহু হই-হুল্লোড়, ওঁম ধ্বনি... হরে কৃষ্ণ... এবং দেবীজির জয় হোক জাতীয় শ্লোগান দিতে দিতে সবাই আমার কক্ষে প্রবেশ করলো। আমি উদ্বেগের গভীর সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি আর আমার বরবাদির মাতম করে যাচ্ছি। আমি ভাস্কর্যের মতো বসে আছি। রথযাত্রীরা আমার চরণে সোনা-রুপার অলংকারের বিশাল স্তূপ উপঢৌকন দিয়ে যাচ্ছে।

সূর্য ঢলে পড়লে মহাত্মা বললেন– 'পূজারিরা! দেবীজি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি বিশ্রাম নেবেন। সন্ধ্যাপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হলে দেবীজির দরশনের জন্য কক্ষের দরজা পুনরায় খুলে দেয়া হবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের জন্য সৌম্য করুন।'

কক্ষের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। মহাদেব ও মহাত্মা সোনা-রুপাগুলো ভাগ করে নিলেন এবং কক্ষের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি একাকী হলে সুমিতা দেবী ধীর পায়ে আমার কক্ষে প্রবেশ করলো। তাকে দেখে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। সুমিতা মহব্বতের সাথে আমার গলায় গলা মেলালো। দীর্ঘক্ষণ ধরে উভয়ে কাঁদলাম।

সুমিতা আমার অশ্রু মুছতে মুছতে বললো– 'বিমলা! আমি জানি, মন্দিরের নরপিশাচরা তোমার সাথে কী নির্মম দুর্ব্যবহার করেছে। কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আমি সেই অঘটনের পথ মাড়িয়ে এসেছি। সবেমাত্র শুরু। প্রতি রাতে তোমার সাথে গতরাতের মতো ঝুলতে হবে। ভাগ্যবিধাতা তোমাকে এক ভয়ংকর বন্দীখানায় নিক্ষেপ করেছেন। সম্ভব হলে তুমি এখান থেকে পালিয়ে দূরে কোথাও চলে যাও। যেখানে দূর-দূরান্তে মানুষের পায়ের নিশানাও থাকবে না।'

আমি বললাম– 'সুমিতা! আমি এই পাষণ্ডদের কাছ থেকে আমার নির্যাতনের প্রতিশোধ নেবো। আমি তাদের কখনো ক্ষমা করবো না। আমি এই দেশের হাকিমের কাছে ফরিয়াদ জানাবো।'

'তুমি মুসলিম হাকিম আলি কুলি খানের সামনে ফরিয়াদ নিয়ে যাবে?' সুমিতা আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো।

আমি বললাম– 'আমি হাকিমকে সব ঘটনা খুলে বলবো।' সুমিতা চুপ। নির্ভীক দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম– 'তুমি এভাবে আমার দিকে চেয়ে আছো কেন?'

www.pathagar.com

সুমিতা বললো– 'তোমাকে বেশ শক্তিশালী মনে হচ্ছে। কিন্তু ভাগ্যাহত বোন! তোমাকে কেউ হাকিমের দরবার পর্যন্ত পৌঁছাতে দেবে না।'

'কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলে সে বললো– 'এখন তুমি ধর্মীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছো।'

আমি দীপ্তকণ্ঠে বললাম– 'এখান থেকে বের হওয়ার পর আমি আমার সকল বন্ধন ও সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবো।'

সুমিতা আরো অনেক কিছু বলতে চাইছিলো, কিন্তু একজন মহাদেব কক্ষে এসে বললেন– 'সুমিতা! তোমাকে মহাত্মা ডেকেছেন।'

সুমিতা চুপিসারে পা বাড়িয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো। মহাদেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'দেবী, তুমি সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশ্রাম নাও। ভালো মনে করলে নিজ কক্ষে চলে যাও।'

আমি বললাম– 'কামিনী কোথায়? আমি তার জন্য বেশ উদ্বিগ্ন।'

'চিন্তার কোনো কারণ নেই, দেবীজি!' মহাদেব মাথা নুইয়ে হাত জোড় করে বললেন– 'কামিনীজিকে তোমার উদ্বেগের কথা জানিয়ে দেয়া হবে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম– 'তুমি তাকে দেখেছো? সে কেমন আছে?'

মহাদেব মৃদু হেসে বললেন– 'দেবতা ভগবান বড়ই দয়ালু। সবাইকে ঝুলি ভরে দান করেন। এখানে আগত সকল কন্যার মনোবাসনা ও কামনা পূরণ করে দেয়া হয়।' আমার মন আরো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। মহাদেবের কথা ও মৃদু বাঁকা হাসি দেখে মনে হচ্ছে কামিনীর সম্ভ্রমও নষ্ট হয়ে গেছে।

আমি দেবদাসীদের কোলাহলের মধ্য দিয়ে আমার কক্ষে ফিরে এলাম এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিলাম। সন্ধ্যাবাতি জ্বলে উঠলে পুনরায় আমাকে দেবী বানিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়া হয়। এই অবস্থা রাতের প্রথম প্রহর পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো।

এরপর রাতের দ্বিতীয়াংশ এলে আমাকে আবার পালঙ্কে এনে বসানো হয়। আমি রেখাকে উদ্দেশ করে বললাম– 'কারও জন্য আমার কক্ষে প্রবেশের অনুমতি নেই। আমাকে সারারাত নির্জনে থাকতে দেয়া হোক।'

রেখা বললো– 'তুমি কখনো এমন করতে পারবে না। কীভাবে তুমি একা থাকবে? তোমার সারা অঙ্গ অপরূপ সৌন্দর্যে ভরপুর। দেবতা ভগবান ও তার

www.pathagar.com

অবতারের পথ কী করে তুমি রুদ্ধ করে রাখবে? এমন কল্পনা কখনো মনে আনবে না, দেবী!'

অর্ধরাত গত হলে আজও আমাকে অনিচ্ছা সত্ত্বে দেবতার প্রেমবটিকার মধু পান করানো হয়। কিছুক্ষণ পর আমার ভেতর একধরনের মাদকতা ও নেশা নেশা ভাব উদ্রেক হয়। চোখজোড়া বুজে আসে। কিছুক্ষণ পর আচমকা আমি অনুভব করি, কে যেন গতকালের মতো আজও আমাকে নগ্ন করে চলেছে। চোখ মেলে দেখি, বৃদ্ধ মহাত্মা আমার ওপর ঝুঁকে আছেন। তার শ্বাস-প্রশ্বাসে জৈবিক তাড়নার তাপ। তিনি এক ঝটকায় আমার পোশাক ছিঁড়ে পালঙ্কের নিচে নিক্ষেপ করে ভয়ংকর থাবায় গতকালের মতো অঘটন ঘটান।

আজও আমার ওপর গতকালের মতো অমাবস্যা নেমে আসে। আজও ভগবানের মূর্তি সবকিছুই দেখে যাচ্ছিলো। মহাত্মা বুনো কুকুরের মতো আমার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে হাঁপিয়ে যাচ্ছেন। আমি ভগবানকে সাহায্যের জন্য বারবার ডাকছিলাম। কিন্তু সেই অন্ধ, বধির ও মূক ভগবান আমার কোনো সাহায্যে এগিয়ে আসেনি।

মহাত্মা ক্লান্ত হয়ে পড়লে আরেকজন আসে, এরপর আরেকজন আসে। এরপর ক্রমাগত সারারাত হিংস্র সিংহের মতো থাবা মেরে মেরে আমাকে শেষ করে দেয় রাক্ষসরা। আজও আমি এই পাশবিক নির্মমতায় বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলাম, বেহুঁশ হয়ে পড়ছিলাম। যখনই আমার হুঁশ ফিরে আসতো, তখন কোনো না কোনো মহাদেবকে আমার বুকের ওপর চড়তে দেখতে পাই। সে এক ভয়াল দৃশ্য। ব্যথার তীব্রতায় আমার সারা দেহ চৌচির হয়ে যাচ্ছিলো গতকালের মতো।

আমার চোখ দুটো বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অশ্রুনদী বইতে বইতে শুকিয়ে পড়ে। বারবার আমি ভগবানের মূর্তির দিকে তাকিয়ে মিনতিভরা চোখে বহু করে ডেকেছি, কিন্তু সেই নিষ্প্রাণ ও অনুভূতিশূন্য মূর্তিটি কেবল এক টুকরো পাথর বলেই বিবেচিত হতে থাকে। দেবী হওয়ার সাধ কড়ায়-গন্ডায় আমার থেকে উসুল করে নেয় হায়েনারা।

রাম দাস নিজ চুল মুঠি করে ধরে বললেন– 'ভগবানের খাতিরে চুপ করো, মা! বিমলা! আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে!'

বিমলা বললো– 'কোন ভগবানের দিব্যি দিচ্ছো, পিতাজি? এই অপরাধী ভগবানের কথা বলছো? যে আমার দুর্ভাগ্য, আমার ধ্বংস ও আমার বরবাদির

www.pathagar.com

তামাশা দেখে যাচ্ছে? তুমি তোমার কন্যার সতীত্ব হরণের অনুঘটককে নিজের ভগবান বলছো, পিতাজি? আফসোস!'

'না!' রাম দাস চিৎকার করে বললেন– 'এ মিথ্যে! আমি মানি না!'

তিনি পাগলের মতো প্রলাপ বকছিলেন। বিমলার হাত নিজের কম্পিত হাতের মুঠোয় নিয়ে বললেন– 'বলো, এসব মিথ্যে! দেবতাদের জগৎ নরকের অঙ্গারের মতো হতে পারে না। তাদের জগৎ তো স্বর্গের ফুলের মতো পূতঃপবিত্র, শান্তির সুগভীর সাগর হয়ে থাকে।'

বিমলা বড়ই বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার সুরে বললো– 'বলবো পিতাজি! কিন্তু এখন না। সেই সময় বেশি দূরে নয়, জগন্নাথ দেবতার মন্দির থেকে দু-চারবার ফেরার পরই বলবো। যখন বিয়ে ছাড়া মাতা হয়ে যাবো, তখন আমার আগেই তুমি বলবে– এসব মিথ্যে। ধর্ম মিথ্যে। দেবতা মিথ্যে। পিতাজি, ভেবো না! সে সময় খুব দ্রুতই তোমার কাছে ধর্না দেবে। দরজায় কান পেতে থাকবে। খুব দ্রুত জগন্নাথ দেবতার মহান শক্তিধর অবতার তোমার ঘরে জন্ম নেবে। বড়ই শুভক্ষণ ঘনিয়ে আসছে। তুমি ধনবান হয়ে যাবে, পিতাজি! বড়ই সৌভাগ্য তোমার!'

বিমলা চুপ হয়ে যায়। রাম দাসের আর্তনাদে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে যায়। অগুনতি নক্ষত্ররাজি তাদের গতিপথ ধরে ধেয়ে ধেয়ে চলেছে। মন্দিরের দিকে এখনো বাজছে সানাইয়ের সুর। রাম দাসের কানে গ্রামবাসীর গান-বাদ্যের শব্দ ভেসে আসছে।

বাইরের দরজায় শব্দ হতেই রাম দাস বিমলার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'দরজায় কে শব্দ করছে?'

বিমলা গভীর চিন্তার সুরে বললো– 'পিতাজি! গ্রামের লোকজন হবে। এখন তো তুমি সাধারণ কোনো পণ্ডিত নও। জগন্নাথ দেবতার একমাত্র দেবীর মহান পিতা তুমি! বাইরে গিয়ে মানুষের সাথে আনন্দের জোয়ারে ভেসে যাও। এতে করে তোমার মন থেকে মেয়ের সতীত্বের শোকের ভার কমতে পারে।'

রাম দাস ভগবানের মূর্তির দিকে হাত বাড়িয়ে ক্ষোভের সাথে বললেন– 'হে মূক বধির ভগবান! তোমার হাত বাড়িয়ে দাও! মুছে দাও তোমার জনম জনম কালের পূজারির চোখের পানি। যাতে এই বেকুব পূজারিদের অনাচারের

www.pathagar.com

গতিপথ পাল্টে যায়। বলছো না কেন? আমাদের আনন্দ-উল্লাস থামিয়ে কেন ওইসব পূজারির উপহাসের পাত্র করে তুলছো আমাদের? কথা বলছো না কেন? তোমাদের মিথ্যা কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে বলে?'

রাম দাস পাগলের মতো ক্ষোভে-দুঃখে চিৎকার করে চলেছেন। তিনি ভগবানের মূর্তি হাতে নিয়ে সজোরে ছুড়ে মারলেন। কক্ষের বিছানাজুড়ে মূর্তির চূর্ণ-বিচূর্ণ কণা ছিটকে পড়েছে। অনেকক্ষণ ধরে তিনি টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন।

যে মাটির বুকে রাম দাস বেঁধেছেন ঘর, আজ বুঝি তা ভঙ্গুর, যে আকাশ ভেবেছেন সীমাহীন আজ তার সীমারেখা সম্মুখে। আজ দেখি নক্ষত্র আলোকবিন্দুরও আছে অপমৃত্যু, শতাব্দীর বুকে টিকে থাকতে পারে না ধীরেন কচ্ছপও। ঘাসফড়িং, রঙিন ঘুড়ি, দুরন্ত ফিঙে পাখিটার ডানায়ও ভর করে ক্লান্তি। ফুরিয়ে যায় প্রদীপের ভেজা সলতে– তাই দ্বিধা জাগে রাম দাসের।

তিনি ভাবতে থাকেন, কীভাবে ঘুণপোকার মতো প্রতিনিয়ত জীবনকে কুরে কুরে খাচ্ছে জীবনই, যে আনন্দ-বেদনায় মানুষ বদলে যায় ক্ষণিকের তরে– তার অস্তিত্ব কেবলই শূন্যতায়, স্পর্শের বাইরে, তাই সবই মনে হয় অবান্তর। যে সময়ের প্রত্যাশায় মানুষ কেবলই দিন গোনে পঞ্জিকার পাতার দিকে তাকিয়ে, তা চলে যায় নিঃশব্দে, পড়ে থাকে শুধু যাতনাময় অযাচিত সময়– এসব ভাবতে থাকেন রাম দাস।

চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে পানি। দম আটকে যাওয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলছেন– 'সৌম্য করো ভগবান! তুমি তো আমাদের চেয়ে আরো বেশি অসহায় দুর্বল।' এরপর তিনি মূর্তির টুকরোগুলো উঠিয়ে একটি পাত্রে রেখে বললেন– 'মিথ্যাবাদী ভগবান! বাইরে গিয়ে তোমার পূজারিদের তোমার অসহায়ত্ব ও দুর্বলতার কাহিনি নিজ মুখে শোনাও!'

রাম দাস কক্ষ হতে বেরিয়ে যাবার সময় বিমলা তার গতিপথ আটকে দিয়ে বললো– 'পিতাজি! এ তুমি কী করছো? এমন কাণ্ড কোরো না। এমন করলে গ্রামবাসী আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।'

রাম দাস কেঁদে কেঁদে বললেন– 'মা! আমি এই মিথ্যে ভগবানের ধর্মীয় কাহিনি খোদার শ্রেষ্ঠত্বকে আমার মন থেকে মুছে ফেলেছি। এখন ধ্বংস পথ

www.pathagar.com

পাড়ি দিতে আমার কোনো দুঃখ নেই। আমি তো সেই কবেই মরে গিয়েছি! মানুষ এ ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলে আমার আত্মা শান্তি পাবে। আমার সাথে এই মিথ্যা ভগবানও জ্বলবে। যদি সে আগুনের শিখায় চিৎকার শুরু করে, তাহলে আমি তোমার সেই চিৎকার আর আহাজারির কথা স্মরণ করে অট্টহাসিতে কাঁপন তুলবো। যদি সেও আমার সাথে জ্বলেপুড়ে অঙ্গার হয়ে যায়, তবে তাকে আমি ক্ষমা করে দেবো।'

বিমলা যথেষ্ট বিচক্ষণতার সাথে পিতাকে বোঝাচ্ছে– 'পিতাজি! এটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এটা হবে চরমপন্থী ও নির্বোধের মতো আচরণ। যেভাবে এখন মানুষের মাঝে কোনো পরিবর্তন আসেনি, অথচ আমাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠন করা হয়েছে, অনুরূপভাবে আমাদের মিটে যাওয়াতেও এই নির্দয় ও পাষাণ সমাজের মাঝে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসবে না। যা হবার তা হয়ে গেছে, অনুশোচনার ক্ষতগুলো দুঃখ-ক্ষোভের আগুনে পুড়িয়ে ফেলাতে কোনো লাভ নেই। আমাদের ব্যথাতুর, ব্যাকুল ও অস্থির আত্মা এতে শান্ত হবে না। আজীবন আমরা দগ্ধ হতে থাকবো। আমাদের উচিত– জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আমাদের মতো আরো অন্ধ লোককে ওই গহিন অন্ধকার থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। পিতাজি! অগণিত লোক ওই শূলিতে চড়ে আছে। অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর অন্ধকার গহ্বরের দিকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আমরা যদি কোনো একজন নির্দোষ মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারি, তখন আমরা মনে করতে পারবো যে, আমাদের সাথে কিছুই করা হয়নি।'

রাম দাসের ক্ষোভের আগুনে চিন্তার বরফ গলতে থাকে। তার বেপরোয়া উন্মাদনা কিছুটা কমে এসেছে। বিমলা তার সামনে অজানা এক স্বস্তির দ্বার মেলে ধরেছে। অন্ধকারে কিছুটা আলোর দেখা মিলছে। প্রত্যাশার আলোকচ্ছটা নিরাশার আঁধার ঢেকে নিয়েছে। অদেখা, অজানা এক ঠিকানার সন্ধান সে পেয়ে গেছে।

বিমলার কপালে এক ফালি চুমু এঁকে দিয়ে তিনি বললেন– 'মা! তুমি আমার আশার একটি দীপ প্রজ্জ্বলিত করলে। আমি অন্ধকারে লড়াই চালিয়ে যাবো। সতীত্ব আর সম্ভ্রম নিয়ে উন্মত্ত খেলায় মত্তদের মুখোশ আমি সাদামনের মানুষদের সামনে উন্মোচিত করবো।'

www.pathagar.com

রাম দাস চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন- 'মা বিমলা! হয়তো আমি বহুদূর তোমার সঙ্গে চলতে পারবো না। বয়সের এই ভেলা আমাকে হয়তো নদীর ওপ্রান্তে ভিড়তে দেবে না। কিন্তু মনে রেখো, সারাক্ষণ আমার আত্মা তোমাকে সঙ্গ দেবে। তোমাকে আমি একাকী ছেড়ে যাবো না। সর্বদা তুমি আমার চোখের সামনে থাকবে।' বিমলা রাম দাসের পা ছুঁয়ে বললো- 'কৃতজ্ঞতা নিন, পিতাজি!'

আসলে সবার কাছেই সবার বাবা একটা বিশেষ জায়গা দখল করে থাকে। সেটা কখনো ভালোবাসার, কখনো আবেগের, কখনোবা অভিমানের-অভিযোগের। শৈশবে বাবাকে মনে হয় সর্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞ। একটু বয়স হলেই মনে হয় বাবা কিছু বিষয়ে জানেন, কিছু বিষয়ে জানেন না। তারপর বয়স যখন আরেক একটু বাড়ে, তখন মনে হয়, বাবার ভাবনা-চিন্তা সবই সেকেলে। বিমলা এর ব্যতিক্রম। সে ছোটবেলা থেকেই বাবার মতামত ও উপদেশ মান্য করে আসছে।

বাইরে দরজায় খটখট শব্দ বেড়েই চলেছে। বিমলা বললো- 'পিতাজি! বাইরের লোকদের কোনো বাহানা দিয়ে চলে যেতে বলো।'

রাম দাস চলে গেলেন। বিমলা মূর্তির টুকরোগুলো উঠিয়ে লুকিয়ে রাখলো অন্য কক্ষে। কিছুক্ষণ পর রাম দাস ফিরে এসে বললেন- 'গ্রামের বিশিষ্ট মানুষেরা ভিড় করছে। বলছে, আমরা এখনো দেবীকে দরশন করতে পারিনি। আমি বলেছি, দেবী বেশ ক্লান্ত। গভীর নিদ্রা পেয়েছে তার। সকালে দরশন হবে।'

রাম দাস ও বিমলা সে রাত জেগে জেগে কাটায়। উভয়ে এক নতুন ভবিষ্যতের ব্যাপারে পরিকল্পনার ছক এঁকে চলেছে। বাপ-বেটি আকাশের নীলিমায় আশা-আকাঙ্ক্ষার এক আলোক বিচ্ছুরণ দেখে চলেছে। অন্ধকারে ভীষণ ঘৃণা তাদের। আলোর ফেরি করতে তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ে। নিজ নিজ চিন্তা-ধ্যান মতে উভয়ে জীবনের এক নতুন অজানা অধ্যায়ের সন্ধান করে চলেছে।

উভয়ে নিজ নিজ ভাবনার গভীরে হারিয়ে যায়। তারা ভাবে- অন্ধকার, সময় এবং ব্রহ্মাণ্ডের বিস্মৃতি সমান, এক এবং অভেদ। পরমাণুর প্রক্রিয়া শেষ হলে

www.pathagar.com

সূর্য নিভে যাবে। কোনো একদিন সব নক্ষত্র একে একে হারাবে তার জ্যোতি। তখন! শুধুই হু হু করা অন্ধকার। আমাদের এই মায়াময় পৃথিবীর সব অংশে একই সময় আলো পৌঁছায় না। এতো পরাক্রমশালী সূর্যের সেই সামর্থ্য নেই যে, একই সঙ্গে আলোকিত করবে এই ছোট্ট চরাচর। তাকেও নিয়মমাফিক অখণ্ড সময়ের দাসত্ব মেনে আলো দিতে হয় এক অংশের পর অন্য কোনো অংশে। কিংবা অন্য কথায় বলা যেতে পারে, এই অন্তহীন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুই আলোকিত হয় না কখনো। যতোটুকু আলোর সংস্পর্শে আসে তার চেয়ে অনেক বেশি অংশ অনালোকিত। সেই অনেক বেশি অংশ এতো বিস্তৃত যে, মানবীয় বিবেচনায় তা ধারণ করা সম্ভব নয়। এই অসম্ভব আজ কিংবা ভবিষ্যতের জন্যও সমান সত্য।

বিমলা ভাবতে থাকে– আমরা নিত্য পূজা দিয়ে যাই আলোর উৎসমুখে। ঘৃণা করি অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকার শক্তিমান চিরকাল। অন্ধকারে ভয় জাগে, জাগে শঙ্কা, সম্ভ্রম আর থেকে যায় অপার রহস্য। একদিন খেয়ালে কি বেখেয়ালে মাতৃগর্ভ অন্ধকারে প্রকৃত জন্ম আমার। ক্ষণকাল পর এসে দেখি আলোর পৃথিবী। বেড়ে উঠি আলো-অন্ধকারে। বরাদ্দ কিংবা যাপিত সময় শেষে পাড়ি দিই অনন্তলোকে। এই অলৌকিকতা শুধু একবারের তরেই সম্ভব আর কখনো কোনো কালেই দেখা যাবে না পুনরাবৃত্তির চমক। অনন্তলোক সেও অন্ধকারময় অনুভূতিহীন অচৈতন্যে বিলীন হওয়ামাত্র। তার কোনো অগ্র-পশ্চাৎ নেই। কোনোকালে ছিলো না, কোনোকালে থাকবে না। অন্ধকার তবে কী? ইন্দ্রিয় আর মনন দিয়ে তার এক ভাসা ভাসা রূপ বিমলার জানা। সে মনে করে– আলোর মহল আমার দেখা। আলোহীনতায় টের পাই অন্ধকার, আলোর জগতে চোখ বুজে গেলে টের পাই দৈর্ঘ্য-প্রস্থহীন অন্ধকার। তবে কি অনন্তযাত্রা আর অন্ধকারের অনুভূতি সমার্থক? না, তা নয়। চোখ বুজলে আমার সক্রিয় ইন্দ্রিয় অন্ধকারের ঘ্রাণ নিতে পারে। জানি না, অনন্তযাত্রা চিরপ্রশান্তির অভিজ্ঞতাবাহী কি না। যদি তা-ই হবে, তবে বেঁচে থাকাতেই এতো আনন্দ খুঁজে পাই কেন? নাকি যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়নি এখনো, তার স্বাদ বুঝতে অপারগ এই মন! সব রহস্য শেষ হলে আদিতে যেমন সমান ছিলো অন্ধকার, সময় এবং ব্রহ্মাণ্ডের বিস্মৃতি, ঠিক সেই একই সমান্তরালে এসে এই তিন মিলে অভেদ হবে পুনর্বার।

www.pathagar.com

এমন সব ভাবনার গভীরে হারিয়ে দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকার পর বিমলা রাম দাসকে উদ্দেশ করে বললো– 'পিতাজি! জগতের সকল ধর্মের পুরোধা ও পথপ্রদর্শকেরা কি আমাদের মন্দিরের মহাপুরুষ ও পূজারিদের মতো ইজ্জত লুণ্ঠনকারী ও দুশ্চরিত্রবান?

রাম দাস অকপটে বললেন– 'না, মা! চাঁদ-তারার আলোর ফোয়ারাগুলো এ বাস্তবতার নিদর্শন বহন করে যে, রাতের রাখালও এ জগৎ সংসারে আছেন। সেই সংসার এতো পঙ্কিল ও নাপাক নয়। দুর্ঘটনায় পতিত ও বিপদগ্রস্ত মুসাফিরদের পথপ্রদর্শনের জন্য বহু পথপ্রদর্শক আছেন।'

www.pathagar.com

আলোর রৌশনি

সবুজে ঘেরা বিস্তৃত ফসলের জমি। আকাশে প্রচুর মেঘের আনাগোনা। সারাক্ষণ সূর্যটা মেঘে ঢেকে আছে। চারদিকে উল্লসিত শীতল বায়ুর ছোটাছুটি। আনন্দদায়ক চমৎকার এক নৈসর্গিক পরিবেশ। ইতোমধ্যে কোমল শীতল হাওয়ার দাপট বেড়ে গেছে। প্রবল বেগে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। আকাশজুড়ে প্রচুর মেঘের দাপাদাপি চলছে।

কামিনী তাদের বাড়ির সুদৃশ্য বেলকনিতে একাকী বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করছে। মন মজে আছে ফুল-পাখিদের মেলায়। অকস্মাৎ কী ভাবতে গিয়ে তার সংবিৎ ফিরে আসে। দু'চোখে অন্ধকার দেখতে পায় সে। মন্দিরের ভয়ানক রাতের কথা মনে পড়ে যায় তার। ক্ষুধার্ত রাক্ষস আর হিংস্র নরপিশাচদের ছোবলের কথা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।

সে-ও গিয়েছিলো জগন্নাথ মন্দিরের যাত্রায়। পূজারি হিসেবে তীর্থযাত্রার ভালোই শিক্ষা হয়েছে কামিনীর। বড় ব্যথাতুর ও লজ্জাজনক ঘটনাগুলো বারবার চোখে ভাসতে থাকে আর কম্পন শুরু হয়ে যায় সারা দেহে। রাগে-ক্ষোভে তার দু'চোখ লাল হয়ে যায়। প্রকৃতির সব সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায় তার সামনে। একসময় দু'চোখ বেয়ে টপটপ করে ঝরতে থাকে অশ্রুবিন্দু। কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে সে নিষ্পলক আকাশের দিকে চেয়ে আছে।

নিজেকে নিজেই বলছে– কোনো সৎ পতি দেখার কোনো অধিকার নেই আমার। প্রেতাত্মার কল্পনা আমার মন থেকে বের করে দিতে চাই। বিয়ের কোনো উপযোগিতা অবশিষ্ট নেই আমার ভেতর। কঙ্কালের তৈরি শরীরে হাঁটছে, নিজের হাত-পা খুলে খুলে মাটিতে ফেলে সেখানে বসে মহা দোটানায় পড়ে ভাবছে। সব আছে, শুধু শব্দ নেই। কতো জিনিস দেখতে

www.pathagar.com

পাচ্ছে, একটাও চেনে না, এসব জিনিসের নামও যেন কামিনী এখনো শেখেনি।

কামিনীর চোখে শ্রাবণের বারিধারার বর্ষণ। চোখের পানিতে সে প্রকৃতির সবকিছু আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছে। এমন সময় ঘরের এক সেবিকা বেলকনিতে আসে। পায়ের শব্দ শুনে কামিনী ফিরে তাকালে সেবিকা কুর্নিশ করে বলে– 'কামিনী মা! বিমলা দেবী এসেছে।'

কামিনী চোখ মুছতে মুছতে বললো– 'দেবীজিকে বাইরে কেন বাধা দিয়ে রেখেছো? এখানে পাঠিয়ে দাও।' কিছুক্ষণ পর বিমলা বেলকনিতে পৌঁছালে কামিনী বেশ তপ্ত আবেগে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। পাশের তেপায়ায় বসিয়ে তার হাতটি হাতে নিয়ে খুব আনন্দে স্পর্শ করে বলে– 'বিমলাজি! তোমার দেবী বনে যাওয়া আমাদের জন্য বড় গৌরবের বিষয়।'

বিমলা বললো– 'তুমি তো জানো, তোমাকে ছাড়া আমি কেমন উদ্বিগ্ন থাকি।' বিমলার ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা। সে আরো বললো– 'কামিনী! আমরা আজীবন পাশাপাশি থাকবো। তুমি চিন্তা কোরো না, তুমি তো আমার সখী।'

এরপর বিমলা কামিনীর দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বললো– 'তুমি কাঁদছো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' কামিনীর চোখ জলে থইথই– 'আজীবন আমাকে কেঁদে যেতে হবে।'

'না!' বিমলা দৃঢ়কণ্ঠে বললো– 'আজীবন তোমাকে কাঁদতে হবে না। অপরাধী ওইসব মহাদেব ও পূজারিকেই জীবনভর কাঁদতে হবে।'

কামিনী বিস্ময়মিশ্রিত চোখে বিমলার দিকে তাকিয়ে দেখলো, তার চোখজুড়ে দীপ্তির রেখা। কামিনী বললো– 'মনে হচ্ছে, তুমি বিধর্মী হয়ে গেছো? মন্দিরের ভেতর সংঘটিত অনাচারের শোকে তুমি দেখি অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছো।'

'না, কামিনী না! আমার অনুভূতি ঠিকই আছে। বরং আমি বড় বিশ্বাস ও ভরসা নিয়ে তোমাকে সেই বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করতে এসেছি– যা আমার মাঝে নয়া প্রতিজ্ঞা ও নয়া আকাঙ্ক্ষার দীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে।'

কামিনী সুদূর আকাশে দৌড়তে থাকা মেঘের দিকে তাকিয়ে বললো– 'পথে কথা বলার সুযোগ হয়নি। বলো দেখি, জগন্নাথের সাথে লগ্ন কেমন হয়েছে তোমার?'

www.pathagar.com

বিমলার চোখে বিতৃষ্ণার ছাপ। সে বিরক্ত হয়ে বললো– 'সেই ভয়াল স্বপ্নের কথা বলে আমার ক্ষতস্থানে আর লবণের ছিঁটা দিও না। আমি সেই হৃদয়বিদারী মুহূর্তের কথাগুলো ভুলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জগন্নাথ মন্দিরের সেই বিমলা মন্দিরেই মরে গেছে। এখন তোমার সামনে এক নতুন বিমলা বসে আছে। আমি নবজন্ম লাভ করেছি– যা পবিত্র এবং সর্বদা পবিত্র থাকবে। এখন আমি সেই পবিত্রতা রক্ষার সংকল্পে এগোতে চাই।'

কামিনী বললো– 'সে এক ভয়াল নির্মম হৃদয় চৌচির হওয়া মুহূর্ত ছিলো। আমার ওপর দিয়ে ভারী পৈশাচিক ধকল গেছে। একজন কুমারী কন্যার কাছে সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে তার কুমারীত্ব ও সতীত্বের সম্পদ। সেই সতীত্ব আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। সেটা ফিরিয়ে আনার কোনো উপায় নেই আমার।'

বিমলা তার হাত ধরে চুমু খেয়ে বললো– 'তুমি ঠিকই বলছো, কামিনী। কিন্তু আমরা তো নির্দোষ। আমরা তো স্বেচ্ছায় খুশি হয়ে সম্ভ্রম হারাইনি। এছাড়া আমরা নির্লজ্জ বেহায়া নই। প্রেত-রাক্ষসেরা আমাদের সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে।'

কামিনী বললো– 'বিমলা! তোমার আসার পূর্বে আমি এ দুশ্চিন্তায় চৌচির হচ্ছিলাম। আমি ভাবছিলাম, আমাদের পরিবার ও সমাজে এ কী হয়ে গেলো? এ অন্ধকার আর কতোকাল? আলো আসবে কবে? আর কতোদিন ওই পঙ্কিল পথে মানুষ ছুটে চলবে? কতো যুগ তারা হিংস্র হায়েনা, নরপশু ও রাক্ষসের পূজা অর্চনা করে যাবে? সে কোন অপশক্তি যে আলোর গতি রুদ্ধ করে রেখেছে? আঁধার এ পথে কে কবে বাতি জ্বালাবে?'

বিমলা বললো– 'ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করো, কামিনী! সে সময় আর বেশি দূরে নয়, ধর্মপাপী কুকুরগুলোর হিসাবের দিন ঘনিয়ে আসছে। তুমি দেখবে, এ নরপিশাচদের নিরপরাধ মানুষের রক্তের প্রতিটি ফোঁটার হিসাব গুনে গুনে দিয়ে যেতে বাধ্য হবে। আকাশের সত্য ভগবানের ঘরের আলোই আলো; কোনো অন্ধকার নেই। অন্ধকারের সওদাগরেরা বেশি দিন আলোর এ পথ রুদ্ধ করে রাখতে পারবে না। আকাশের অদেখা জগতে সেই ফয়সালা হবেই হবে।'

কামিনী চিৎকার দিয়ে বললো– 'বিমলা! সুন্দর এ দেহের প্রতি আমার প্রচুর ঘৃণা হচ্ছে। আমরা ময়লা ও দুর্গন্ধ হয়ে গেছি। মন্দিরে অনবরত কয়েক রাত

www.pathagar.com

ধরে আমার শরীরের ওপর পাপাচার নৃত্য করে গেছে। আমার ওপর অঙ্গারের মাতম বয়ে গেছে। যদি আমার বিয়ে হয়, তাহলে আমার প্রেমাস্পদকে আমার সতীত্বের কী প্রমাণ দেখাবো? আজীবন স্বামীর কাছে আমি অপরাধী থেকে যাবো। সুতরাং, আমার প্রেমকে আমি অন্ধকারেই মিটিয়ে রাখবো। নিজেই আমি অন্ধকারের অংশ হয়ে থাকবো।'

বিমলা কামিনীর গলা জড়িয়ে ধরে বললো– 'যা কিছু ঘটে গেছে তার ব্যথায় আর দগ্ধ হয়ো না, দ্রুত ভুলে যাও।'

'কী করে ভুলবো?' কামিনী কান্নাস্বরে বললো। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বিমলা কামিনীর বাহুডোরে এসে জিজ্ঞেস করলো– 'কামিনী! তোমার পিতা তো একজন শিখ ছিলেন। তোমার পিতার সাথে তুমি বহু স্থান দেখেছো। জগতের সকল ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মচর্চা কি আমাদের মন্দিরে মহাদেব ও পূজারিদের মতো হয়ে থাকে?'

কামিনী গম্ভীর হয়ে বিমলার দিকে তাকিয়ে বললো– 'মুসলমানদের ব্যাপারে বলতে চাচ্ছো?'

বিমলা বললো– 'তুমি ঠিকই ধরতে পেরেছো।'

কামিনী বললো– 'আমাদের পিতাজি মহারাজ বাংলার হাকিমের সেনাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। এ কারণে বেশ কিছু মুসলিম ঘরে যাবার সুযোগ আমার হয়েছে। তখন আমি ছোট ছিলাম, কিন্তু অবুঝ ও নির্বোধ ছিলাম না। আমি মুসলমানদের চোখের মধ্যে সর্বত্র এবং সর্বক্ষণ একটি নিষ্পাপ ধরনের পবিত্রতা দেখেছি। পিতাজির সাথেও তাদের আচরণ ছিলো খুবই ভ্রাতৃত্ববোধসম্পন্ন ও যথেষ্ট আন্তরিক। আমি যৌবনের দহলিজে পা রাখলে এক মুসলিম যুবকের প্রেমে পড়ে যাই। সে ছিলো যথেষ্ট সুঠাম ও সুদর্শন। তুমি এটা শুনে বিশ্বাস করবে না যে, ওই যুবক হচ্ছে বাংলার হাকিমের একমাত্র ছেলে। একদিন আমি খুবই সরলতার সাথে নিষ্পাপ চাহনিতে তার কাছে প্রেমের আহ্বান জানাই। সে তখন দৃঢ়চিত্তে বললো– 'কামিনী! তুমি খুব ভালো মেয়ে। ফুলের মতো মনোলোভা তুমি। তুমি চাঁদের জোনাকির মতো নিষ্পাপ। কিন্তু স্মরণ রেখো– এ ধরনের অনর্থক স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দাও। আমাদের উভয়ের মাঝে ধর্মের এক দুর্লঙ্ঘনীয় দেয়াল। সেই দেয়াল টপকে একে অন্যকে আপন করে নেয়ার স্বপ্ন হবে বড়ই ভয়ংকর। নিজ নিজ

www.pathagar.com

ধর্ম, নিজ নিজ সমাজ ও বংশের সম্মান-মর্যাদার খাতিরে আমাদের একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া জরুরি।'

এখনো পর্যন্ত আমি সেই যুবক শাহজাদার কথার ওজন ও সত্যতা যাচাই করতে সক্ষম হইনি। যেতে যেতে সে পেছনে ফিরে নিষ্পাপ চাহনিতে মুচকি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলো– 'কামিনী, আমিও তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি। আর সম্ভবত এ ভালোবাসা তোমার ভালোবাসার চাইতে অধিক দৃঢ়।'

আমাদের মাঝে সংযোগের দূরত্ব জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কে জানে, ভবিষ্যতে তার কী হয়েছে! তুমি সেই যুবক শাহজাদার আবেগ-অনুভূতির বিষয়টি যাচাই করে দেখো, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বাস্তবতার সামনে সে কতোটা অপারগ ছিলো!'

বিমলা বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে কামিনীর দিকে তাকিয়ে বললো– 'তুমি কি সত্যি বলছো?'

কামিনী বললো– 'তুমি নিজের পারিপার্শ্বিকতা আর সমাজের সাথে মুসলমানদের সমাজের তুলনা করো না। আমি এ সময়ে তোমার সামনে এমন একটি অবিশ্বাস্য সত্য উচ্চারণ করেছি, যার স্মরণ আমার জীবনের একমাত্র সম্বল।'

বিমলা বললো– 'আমার পিতাজি তো এর বিপরীত কথা শুনিয়ে থাকেন। মুসলমানরা এমন অত্যাচারী নাস্তিক ও উগ্র জাতি– যাদের বনের হিংস্র পশুরা পর্যন্ত ভয় পায়।'

কামিনী হেসে হেসে বললো– 'তোমার পিতাজি ঠিকই বলে থাকেন। বাস্তবেই মুসলমানদের বনের পশুরা ভীষণ পায়। কিন্তু মানবতার জন্য তারা প্রেমসমুদ্রের মহাপুরুষ। বিমলাজি! তোমার পিতাজি তো পণ্ডিত মানুষ। তার মনের ভেতর রেয়াতি প্রান্তিকতা ও চরম সাম্প্রদায়িকতা ভরে আছে। তুমি তো জানো, চরমপন্থী সাম্প্রদায়িকেরা কখনো সত্য বলতে পারেন না। মুসলমানরা এক যুগ ধরে এই অঞ্চল শাসন করে যাচ্ছে। এমনকি গোটা হিন্দুস্তানের ওপর তাদের শাসনক্ষমতা। তারা যদি অত্যাচারী হতো, তবে কবেই তারা নিঃশেষ হয়ে যেতো। আমার স্বর্গবাসী পিতাজি বলতেন– হিন্দুস্তানের বেশ ক'জন রাজার মহলে হিন্দু রানিরা আছেন। আমি কখনো শুনিনি যে, মুসলমানরা কোনো হিন্দু কন্যাকে উত্ত্যক্ত, বাড়াবাড়ি জাতীয় কিছু

www.pathagar.com

করেছে। বিমলা! মন্দিরে আমাদের সাথে যা কিছু করা হয়েছে, যদি হাকিম সেই সংবাদ জানতে পারেন, তাহলে তারা সকল রাজনৈতিক সন্ধি আলমারির তাকে সাজিয়ে রেখে জালেম মহাদেবদের শাস্তির ক্ষেত্রে এক কঠিন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ছাড়বেন। মুসলমানরা ইজ্জত-মর্যাদা রক্ষা ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে বড় বেশি পাষাণের পরিচয় দিতে পারে।'

বিমলা জিজ্ঞেস করলো– 'তাদের ধর্মীয় গুরু বা অবতাররা কি ওই ধরনের বাড়াবাড়িতে অভ্যস্ত নয়?'

কামিনী বললো– 'আমি সেই সংক্রান্ত কোনো ঘটনা কখনো শুনিনি। তবে আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, যদি ওই ধরনের বাড়াবাড়ি কোনো ধর্মগুরু করে থাকে, তাহলে মুসলমানরা তাকে রেহাই দেবে না।'

বিমলা বললো– 'শুনেছি, মুসলমানরা চার চার কন্যার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়?'

'তুমি ঠিকই শুনেছো।' কামিনী জবাব দিলো– 'মুসলমানদের ধর্মে চার চারটি বিয়ের অনুমতি আছে। কিন্তু সচরাচর এমন হয় না। এছাড়া বিয়ে করে তারা তাদের পত্নীকে সম্মানের সর্বোচ্চ আসনে ঠাঁই দেয়। আমাদের মহাদেবদের মতো অসংখ্য কুমারী কন্যার সম্ভ্রম হরণ করে অনুতাপের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে না।'

বিমলার দু'চোখে আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ জ্বলছে। সে বললো– 'কামিনী, তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি আমাকে নিরাশার অন্ধকার থেকে বের করে প্রত্যাশার নবদিগন্তে দাঁড় করিয়েছো। আমি মুসলমানদের কাছ থেকে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মুসলিম হাকিমের দরবারে আমি নিজ সতীত্ব হরণের নিদর্শনবাহী বস্ত্রটি পেশ করবো। ন্যায়বিচার প্রার্থনা করবো।' বিমলার ললাট প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তায় চিকচিক করছে। তার কোমল ঠোঁট থেকে নিষ্পাপ বাক্যগুলো টপটপ করে ঝরছে।

কামিনী বিমলাকে ইসলাম সম্পর্কে অনেক তথ্য জানায়। সে বলে– 'আমি ইসলামকে গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করেছি। যখন তুমি মুসলমানদের সাথে মিলিত হবে, দেখবে তারা এসব পাপ-পঙ্কিলতার ধারেকাছেও নেই। তাদের তুমি পাহাড়ের মতো অবিচল দেখতে পাবে। তাদের বিশ্বাস ও উপাসনার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, তারা এই পাহাড়, এই চাঁদ-তারা, ওই নীল আকাশের বহু ঊর্ধ্বের এক খোদার অস্তিত্বে অটল বিশ্বাসী। উপাসনার এই ধর্মীয় বিদ্যাটি

www.pathagar.com

আমার বুঝে আসে না। একত্ববাদের বিশ্বাস আমার মাথায় ধরে না। যদি আমার ওপর মুসলমানদের এক খোদার ব্যাপারে জ্ঞান প্রকাশ পেতো, তাহলে নির্ঘাত আমি মুসলমান হয়ে যেতাম। এটা এমন এক জটিল প্রশ্ন– যা আমি অসংখ্যবার লিখে লিখে ছিঁড়ে ফেলেছি। আমি জানি না, কীভাবে একজন খোদা বিশ্বজগতের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন!'

বিমলা মৃদুস্বরে বললো– 'কামিনী, তোমার প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমাকে তুমি এমন এক জগতের সন্ধান দিলে, যেখানকার ফুলেল সুবাস আমার অন্তরাত্মা মোহিত করে তুলেছে। আমার ভাঙা তরির পাল তুমি তীরের দিকে ফিরিয়ে দিলে। আশা করি, আমি দ্রুত তীরে এসে তরি ভেড়াতে সক্ষম হবো। তোমার কথা আমার অন্তরাত্মায় পতিত সেই ভারী পাথরটি সরিয়ে দিলো, যার ভারের নিচে আমার নিশ্বাস আটকে যাচ্ছিলো। নিজেকে এখন আমার বেশ হালকা ও নির্ভার মনে হচ্ছে। আমাকে অনুমতি দাও, পরে তোমার সাথে আবার সাক্ষাৎ হবে।'

বিমলা যখন তার ঘরে পৌঁছে, তখন সন্ধ্যা নেসে এসেছে। মৃদু বাতাসে বেশ শীত শীত অনুভব হয়। রাম দাস মশালের ধারে চুপচাপ বসে আছেন। আগুনের ফুলকির দিকে তার চোখ। গভীর চিন্তায় মগ্ন। চোখে-মুখে আশা-নিরাশার আলো-আঁধারি খেলা করছে।

বিমলা রাম দাসের চরণযুগল স্পর্শ করে বললো– 'পিতাজি! ধৈর্যশক্তির অবলম্বনে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। সহায় ও আশ্রয় প্রয়োজন। আমাকে আশ্রয় দাও, আমার ছুটি মাত্র দশ দিন। দশম দিন মন্দিরের পূজারিরা আমাকে নিতে আসবে। না জানি ফের কখন সেই বন্দীদশা থেকে বেরিয়ে আসা কপালে জোটে। এই দশ দিনে দৃঢ়তার সাথে আমাদের কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তোমার সহায়তা ও সাহায্যে আমি সামনে অগ্রসর হতে চাই।'

হলুদাভ চেহারা ফিরিয়ে রাম দাস গভীর চিন্তামিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিমলার কাছে জানতে চাইলেন– 'মা! তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

বিমলা নিঃসংকোচে জবাব দিলো– 'পিতাজি, আমি কামিনীর ঘরে গিয়েছিলাম।'

বিমলার চেহারায় সতেজতা ও চেতনার দীপ্তি দেখে রাম দাস আহ্ রবে বললেন– 'তোমার দুঃখ-যন্ত্রণা একসময় লাঘব হবে, মা! কিন্তু তোমার বৃদ্ধ

www.pathagar.com

পিতার এই দুঃখ তো তাকে বাঁচতে দেবে না। বেশি দিন আমি বাঁচবো না। জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস বড় ভারী ভারী ঠেকছে আমার।'

বিমলা পিতার কাঁধে হাত রেখে হঠাৎ প্রশ্ন করে– 'মুসলমানদের ব্যাপারে তোমার অভিমত কী, বাবা! শুনেছি আত্মসম্মান আর অধিকারের ব্যাপারে তার যথেষ্ট কঠোর!'

রাম দাসের চোখজোড়া কিছুক্ষণ ঘৃণার আচ্ছাদনে ঢাকা থাকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর কপালে দেখা যায় নির্ভরতার রেখা। বেশ কিছুক্ষণ মনের দোদুল্যমানতার খুপরি থেকে বেরিয়ে তিনি বললেন– 'মা! তুমি বড় সত্য কথা শুনেছো। ইতোপূর্বে মুসলমানদের ব্যাপারে আমি তোমাকে যা কিছু বলেছি তা আমি নীচু সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টিতে কুধারণার ওপর ভিত্তি করে বলেছি। ওসব ব্যাপারে সব সময় আমি তোমার সাথে মিথ্যে বলতাম। আমার পরিবর্তে তোমার পিতা যদি কোনো মুসলিম পুরুষ হতো, তাহলে সে কখনো তোমাকে একাকী ধর্মসভায় যেতে দিতো না।'

আরো কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর রাম দাস বললেন– 'আমি বিষণ্ন। তোমার সম্ভ্রমহানির শোক আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। বেশিদূর আমি তোমার সাথে যেতে পারবো না। কিন্তু যেভাবেই সম্ভব তুমি এই নির্দয় পাষাণ সমাজের বন্দীখানা থেকে বেরিয়ে সেই বাস্তবতা ও সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে; যার রঙ আমি তোমার দু'চোখে ছড়ানো দেখতে পাচ্ছি। আমার পর মুসলমানদের বসতিতে চলে যাবে। তারা তোমার সম্মান রক্ষা করবে। মুসলিম নেতৃবৃন্দের পায়ের ধুলোয় নিজেকে সঁপে দিতে পারলে জগতের সব বাধা তুমি টপকাতে পারবে।'

বিমলা নুয়ে রাম দাসের পায়ে চুমুর প্রলেপ এঁকে দিয়ে বললো– 'পিতাজি! তুমি মহান! তোমার কথা আমার আহত আত্মাকে শান্ত করে দিয়েছে। বেঁচে থাকবে তুমি। সত্য ভগবানের কাছ থেকে আমি তোমার জীবন ভিক্ষা চাইবো। পিতাজি! তোমার ছায়াতলে থেকে আমি সঠিক গন্তব্য পেয়ে যাবো। দ্রুত আমি এই নরক থেকে বেরিয়ে বাংলার হাকিমের দরবারে হাজির হবো। আশা করি, তিনি আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন।'

বিমলার চেহারায় প্রত্যাশার গোলাপকুঁড়ি কলি ফুটিয়েছে। সে বললো– 'আমি ভোজন তৈরিতে চললাম।'

www.pathagar.com

রাম দাস বললো– 'দ্রুত করো। আজ রাতে আমি শান্তিতে গভীর এক ঘুম দেবো। কঠিন দুর্দশা আর দুর্গম পথের ক্লান্তি দূর হয়েছে। আমাদের তরি তীরে এসে ভিড়েছে। আমার বিশ্বাস– বাংলার হাকিম জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের মহাদেব, পূজারি ও মহাত্মাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। এবার আমরা এই মহা পাপিষ্ঠ রাক্ষসদের নিকৃষ্ট নির্মম পরিণতি নিজ চোখে দেখবো।'

আহার পর্ব সেরে নেয়ার পর বাপ-বেটি নিজ নিজ বিছানায় শুয়ে পড়লো। উভয়ের চোখের সামনে প্রত্যাশার বাতি জ্বলজ্বল করছে। ভাবনার গভীরে ডুবে গিয়ে তারা প্রশান্তির এক অদৃশ্য স্বর্গে পৌঁছালো। দরজায় আবারও ঠকঠক আওয়াজ।

রাম দাস চমকে গিয়ে বললেন– 'মনে হচ্ছে মন্দিরের কোনো পূজারি এসেছে।'

বাইরে গিয়ে দরজা খুলে দেখলেন, গোপাল দাঁড়িয়ে।

সে কুর্নিশ করে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– 'পণ্ডিতজি! দেবী কেমন আছে? সে বাইরে আসবে না? মানুষ তো তার দরশনে অধীর অপেক্ষায় আছে।'

গোপালের কাঁধে হাত রেখে রাম দাস বললেন– 'দেবী ঘুমিয়ে গেছে। সারা দিনই তো দরশন দিয়েছে। মহাদেবকে বলবে সৌম্য করতে। কাল সকাল সকাল আমি দেবীজিকে নিয়ে মন্দিরে পৌঁছে যাবো।'

***

গ্রামের সরদার অজিত নিজ কক্ষে উদাসচিত্তে এদিক-ওদিক হাঁটছে। রাতের প্রায় এক প্রহর অতিবাহিত হয়েছে। চোখে তার হিংস্রতা ও বর্বরতার জ্বলন্ত শিখা। বাইরে মৃদু শব্দ শুনে তার পা থমকে যায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর মুষ্ঠিবদ্ধ করে বললো– 'কমবখত! কে জানে কোথায় মরে গেছে! আজ সবার মস্তক কেটে ফেলবো...!' অনেকক্ষণ পর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক যুবক কক্ষে প্রবেশ করলো।

অজিত ক্ষোভে ফাটা কণ্ঠে বললো– 'তুমি কোথায় মারা পড়েছিলে? তুমি জানো না আমার এতোক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকার অভ্যেস নেই?'

www.pathagar.com

'সৌম্য করুন, সরদার! দেরি তো অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু আজ আমরা এক দুষ্প্রাপ্য হীরা সন্ধান করে এনেছি। দেখবেন আপনি তার অপরূপ রূপের ঝলকানিতে অপেক্ষার সেই সব প্রহরের ক্লান্তি নিমিষেই ভুলে যাবেন!'

অজিত অস্থিরতার সুরে বললো– 'কোথায় সে? সামনে নিয়ে এসো...!'

তার চোখে নৃত্য করে চলেছে শয়তান। সৈনিক বাইরে বেরিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর দশ-বারোজন অস্ত্রধারী সৈনিক কক্ষে প্রবেশ করলো। তাদের মাঝখানে স্বর্গের অপ্সরীর মতো সুন্দরী এক মেয়ে রশি দিয়ে বাঁধা। পূর্ণিমার চাঁদও যেন তার সৌন্দর্যের কাছে হার মেনেছে।

অজিত নিষ্পলক তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে বললো– 'খুব ভালো হয়েছে, পূর্ণিমার চাঁদ আমার ঘরে নেমে এসেছে। তোমরা সবাই অনেক বড় পুরস্কারের অধিকারী হবে। তোমাদের উপযুক্ত উপঢৌকন দেয়া হবে। দুজন সিপাহি দরজায় পর্দা দিয়ে রাখো, আর বাকিরা বিশ্রাম নাও।'

সিপাহিরা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলে অজিত ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

এরপর ওই মেয়েটিকে রশির বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করে বললো– 'তোমার মতো সুন্দরী ও ফুলের মতো কোমল কন্যাদের এভাবে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা চরম নিকৃষ্ট কাজ ও যারপরনাই বোকামি। কিন্তু কখনো কখনো এমন বোকামি করতে হয়। অপারগতা দেখা দেয়। জানি না, এই কমবখত সুন্দরী কোমল কন্যারা কেন আমাকে এতো ভীষণ ভয় করে। আমি এক গাঁয়ের সরদার। যুবক ও সম্পদশালী। একজন নারীর এসবই তো চাওয়া-পাওয়ার থাকে। নাকি?'

অজিত কথা বলতে বলতে ঘরের এক কোণে টেবিলের ওপর রাখা শরাবের পাত্রের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। মেয়েটির চোখ তখন দেয়ালের ওপর টাঙানো তরবারির ও খঞ্জরের ওপর নিবদ্ধ। সে মৃদু পায়ে দেয়ালের দিকে অগ্রসর হয়। চোখে তার ঘৃণার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দাউদাউ করে জ্বলছে। মনের ভয় ও আতঙ্কে তার বুক আহত পাখির মতো কাতরাচ্ছে। সে খুবই সতর্ক ও ধীরপদে গিয়ে খঞ্জরটি নিয়ে আসে।

খঞ্জরটি তার জামার ভেতর লুকিয়ে রেখে বললো– 'তুমি আহমক ও নির্দয় মানুষ। সম্ভবত তোমার জানা নেই আমি কে?'

www.pathagar.com

'তুমি চাঁদের জোছনা। তুমি মনোহর এবং আমার জন্য স্বর্গাপ্সরা। ব্যস, আমার জন্য এটুকু জেনে নেয়াই যথেষ্ট। সুন্দরী মেয়ের ক্ষেত্রে আমি জাত-পাত বাছ-বিচারের পক্ষপাতী নই।' সে এমন সুন্দরী মেয়েকে কাছে পেয়ে বেশ উৎফুল্ল।

অজিত মুচকি হেসে মদ্যপ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললো– 'যথেষ্ট বিচক্ষণ ও বন্ধুবৎসল মনে হচ্ছে তোমাকে। তোমার এই স্বেচ্ছায় সোপর্দ করার মানসিকতা তো তোমার গুণেরই অংশ।'

মেয়েটি যথেষ্ট ভাবগম্ভীর ব্যক্তিত্ব ও আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো– 'হে বোকা! আমার নাম সকিনা এবং আমি নাদের খানের মেয়ে। আর তোমার তো জানা থাকা উচিত যে, মুসলমানরা ইজ্জত রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে অভ্যস্ত। এতোক্ষণে বাবা সংবাদ পেয়ে গেছেন হয়তো। ওদিকে চেয়ে দেখো, মৃত্যুর ফেরেশতা দ্রুতবেগে তোমার দিকে আসছে।'

অজিত এক ভয়ংকর অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'খুব ভালো! তুমি মুসলমান এবং সরদার নাদের খানের মেয়ে। তাহলে আমার সিপাহি বড় মূল্যবান পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। আমি তাদের যথেষ্ট পরিমাণে দেবো। ভগবান আমার মনোবাসনা পূরণ করেছেন। আমার খুবই আশা ছিলো কখনো কোনো মুসলিমকন্যার সাথে লগ্নের রাত কাটাবার।'

'হে অপদার্থ নির্লজ্জ মানব! তুমি নিজের পাশাপাশি এই গ্রামের অসংখ্য নিষ্পাপ মানুষকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছো। আমার অসম্মানের শাস্তিতে আমি তোমার সারা গ্রামকে মুসলমানদের ক্ষোভ ও ক্রোধের আগুনের শিকার বানিয়ে ছাড়বো।'

অজিত সকিনার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো– 'আমার গ্রামের যুবকেরা হাতে চুড়ি পরে থাকবে না; আমরাও তরবারি নিয়ে খেলতে জানি।' অজিতের চোখ মদের নেশায় রক্তবর্ণ হয়ে পড়েছে। তার দু'পা থরথর করে কাঁপছে।

সকিনা মৃদু মুচকি হেসে বললো– 'তা তো আমি দেখেই নিলাম। তরবারির ধারে মহব্বতকারী ব্যক্তি তো ইজ্জতের রক্ষক হয়ে থাকে, তোমার মতো ডাকাত ও দুশ্চরিত্রবান হয় না। আমার শেষ পরামর্শ হলো, আমাকে সসম্মানে এখান থেকে বের হতে দাও। আমি এই গ্রামের দিকে ধেয়ে আসা ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড় গ্রামের বাইরে বাধা দিয়ে রাখবো।'

www.pathagar.com

অজিত সকিনাকে তার বাহুডোরে আটকে নেবার চেষ্টা করে বললো– 'এই সময়ে ওই ঘূর্ণিঝড় সামাল দেয়ার চেষ্টা করো, যা আমার ভেতর জ্বলে জ্বলে অঙ্গারে রূপ নিচ্ছে।'

তার কলুষিত হাত সকিনাকে স্পর্শ করার আগেই সকিনা খুব সতর্কতার সাথে হাত ঝাঁকিয়ে খঞ্জরের হাতলি পর্যন্ত পুরো ফলা তার বুকে গেঁথে দেয়। এক ভয়াল আর্তচিৎকার দিয়ে ওঠে অজিত। টগবগ করতে থাকা রক্তের ফোয়ারা বন্যার পানির মতো ছুটতে থাকে। বিছানায় পড়ে যায় সে এবং কিছুক্ষণ পর চিরদিনের জন্য তার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। সকিনার শুভ্র সফেদ পোশাক রক্তাক্ত হয়ে পড়ে তার দুর্গন্ধযুক্ত নাপাক রক্তে।

সে অজিতের লাশের ওপর থুতু ছিটিয়ে বলে– 'বুনো কুকুরের এমনই পরিণাম হয়ে থাকে।'

অজিতের পাহারাদার সিপাহিরা দরজা খোলার চেষ্টা করছে। ভবনজুড়ে এক ভীতিকর পরিবেশ। সিপাহি দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে। সকিনা তার দীর্ঘ ঘন কেশ ওড়না দিয়ে ভালো করে বেঁধে নেয় এবং আহূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়। খঞ্জর মুঠোয় নিয়ে সে এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেললো। কালবিলম্ব না করে সামনে দাঁড়ানো সিপাহির ওপর প্রবল আক্রমণ করে তার জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দিলো। অন্য সিপাহিরা এই আকস্মিক হামলা প্রতিহতের জন্য প্রস্তুত ছিলো না বিধায় তারা আতঙ্কে দিগ্‌বিদিক পালাতে থাকে।

সকিনা সিপাহিদের এই দৈন্যদশায় পুরোপুরি ফায়দা উঠিয়ে নেয়। সে বীরবিক্রমে মুজাহিদসুলভ আক্রমণ করতে করতে ভবনের মূল ফটকের দিকে অগ্রসর হয়। প্রচুর শোরগোলের মধ্যেও সে ফটক পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়। এ সময় চার-পাঁচজন সিপাহি মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে গেছে। ফটকের সামনে অজিতের সিপাহিরা কিছুটা দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করতে থাকে। তারা এ সময়ে বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধও ছিলো। কিন্তু অকস্মাৎ তাদের পেছনে দুজন নেকাবের মুখোশ পরিহিত লোক তীব্র আক্রমণ করে বসে। সেই অপ্রস্তুত ও সম্পূর্ণ অতর্কিত হামলায় সিপাহিদের পা থমকে যায় এবং তারা পালাতে বাধ্য হয়।

সকিনা নেকাবে মুখ ঢাকা ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে– 'তুমি মানব নও, রহমতের ফেরেশতা! আজীবন আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো। আমার

www.pathagar.com

হাতে সময় খুব কম। আফসোস হচ্ছে, আমি আমার প্রতি এই মহান অনুগ্রহকারীর নামটুকুও জানতে পারছি না।'

সে বাইরের দিকে পালিয়ে যাবার সময় এক নেকাবধারী বললো– 'হে বাহাদুর ও বিচক্ষণ মেয়ে! ভবনের পশ্চিম প্রাচীরের কোণে তোমার জন্য ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ভগবান তোমাকে রক্ষা করবেন।'

সকিনা পশ্চিম প্রাচীরের দিকে ছুটে যায়। ওই কোণে নেকাব পরিহিত এক লোক অন্ধকারে ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকিনা দ্রুত ঘোড়ায় আরোহণ করে বললো– 'হে রহমতের অজানা, অচেনা ফেরেশতারা! আমার পক্ষ থেকে, আমার গোত্রের পক্ষ থেকে এমনকি সমগ্র মানবতার পক্ষ থেকে সালাম কবুল করুন!'

নেকাব পরিহিত ব্যক্তি কিছু না বলে অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

***

গ্রামের অসংখ্য মানুষ অজিতের বাসভবনে সমবেত। তারা অবস্থার জটিল প্রেক্ষিতে নিজ নিজ ধারণা ও ভাবনামতে চিন্তা করে চলেছে। ভবনের খোলা মাঠে পড়ে আছে সিপাহিদের লাশ। ক্ষোভের আগুন দাউদাউ করছে। কিছু যুবক প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে প্রস্তুত হতে থাকে অজিতের খুনি সকিনার শাস্তির জন্য। বিমলা ও কামিনী চুপচাপ মানুষের এই শোরগোল দেখে চলেছে।

কামিনীর চোখে অশ্রু। সে বিমলার দিকে তাকিয়ে বললো– 'আমার ভাইয়ের মৃত্যুতে আমি শোকাহত। কিন্তু তার পরিণতি এমনই হওয়ার ছিলো। তার অন্যায়-অনাচার বহু দূর বিস্তৃত হয়ে পড়েছিলো।'

রাম দাস লোকজনকে সুরতহালের জটিল ও কঠিন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তিনি বলছেন– 'গ্রামের যুবকেরা! এই মুহূর্তে আমরা এক গভীর ও কঠিন দুর্দশা সামনে নিয়ে এসেছি। আমরা এক মহা মুসিবতে নিপতিত। আবেগের চেয়ে হুঁশিয়ার থাকা অধিক প্রয়োজন। অজিতজি মুসলমান নেতাদের পাগড়িতে হাত দিয়ে ভালো করেননি। যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা মুসলমানদের মোকাবেলা করার সামর্থ্য রাখি না।'

www.pathagar.com

এক যুবক রাগান্বিত হয়ে বললো– 'পণ্ডিতজি! তুমি তোমার ঘরে যাও এবং ভেতর থেকে ভালো করে দরজা বন্ধ করে বসে থাকো। তুমি বৃদ্ধ, তোমার শক্তি নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। আমরা নাদের খানের বসতি আগুন জ্বালিয়ে কয়লার স্তূপ বানিয়ে ছাড়বো।'

এমন সময় হঠাৎ যুদ্ধসাজে সজ্জিত একদল মুসলিম যুবক ঘোড়া দৌড়িয়ে ভবনে প্রবেশ করলো এবং বসতিবাসীর ওপর তৃষ্ণার্ত বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো। অজিতের সিপাহি ও গ্রামের প্রতিশোধপরায়ণ যুবকেরা তাদের প্রথম আক্রমণেই হাতিয়ার ছুড়ে ফেলে দিতে বাধ্য হয়। বসতিবাসী ঠায় দাঁড়িয়ে। মৃত্যুর বিভীষিকা তাদের মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে।

একজন মুসলিম যুবক ঘোড়া থেকে নেমে কোলাহলের সামনে এসে বললো– 'গ্রামবাসী! জীবনকে যদি প্রিয় মনে করো, তাহলে অজিতকে আমাদের কাছে সোপর্দ করো। সে আমাদের আসামি। তাকে আমরা তার পাপের কঠিন শাস্তি দেবো।'

রাম দাস কোলাহল থেকে বেরিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললেন– 'অজিত খুন হয়েছে। আমার বিশ্বাস, তোমরা গ্রামের নির্দোষ মানুষগুলোকে ক্ষমা করবে।'

রাম দাস সামনের কক্ষের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন– 'অজিতের রক্তাক্ত লাশ সামনের কক্ষে পড়ে আছে।'

যুবক লম্বা লম্বা কদমে গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে কক্ষের দিকে অগ্রসর হলো। তার প্রশস্ত সুদর্শন কপালে প্রত্যয়ের দীপ্ত ছাপ চিকচিক করছে। অজিতের রক্তাক্ত লাশ বিছানার ওপর পড়ে আছে। এখনো খঞ্জরের কোপ তার বুকে বিঁধে আছে। এমন সময় কামিনী, বিমলা, রাম দাস ও গ্রামের আরো ক'জন গণ্যমান্য মহিলা কক্ষে প্রবেশ করলো।

একজন বৃদ্ধা মুসলিম যুবকের পায়ে চুমু খেয়ে বড়ই মিনতির সুরে বললো– 'বাবা! গ্রামবাসী সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাদের মধ্যে কেউই অজিতের পাপে শরিক নেই। সরদার তার কৃতকর্মের শাস্তি পেয়ে গেছে। আমাদের ক্ষমা করে দাও!'

যুবক খুবই সম্মানের সাথে বৃদ্ধাকে তার পা থেকে উঠিয়ে বললো– 'মা! চিন্তিত হয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই। আমরা কোনো নিষ্পাপ ব্যক্তির ওপর

www.pathagar.com

হাত ওঠাবো না। আমাকে আমার বোন সম্পর্কে বলুন। আমি তাকে নিয়ে ফিরে যাবো।'

বিমলা ও কামিনী একে অন্যের দিকে তাকালো। রাম দাস বললেন- 'যুবক! আমি যদি বলি যে তোমার বোন তোমাদের বাড়িতে পৌঁছে গেছে, তাহলে তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?'

যুবক কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর ধিক্কারের সুরে বললো- 'না! আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারি না, কিন্তু এখন যেহেতু আমরা একে অন্যের বিরুদ্ধে তরবারি কোষমুক্ত করেছি, তাই এতো দ্রুত একে অন্যের কথা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। আপনি অবস্থার ভয়াবহতা আঁচ করতে পারছেন। আপনি আমাদের অপারগতার বিষয়টিও অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। আমাকে এর একটি বিহিত ব্যবস্থা করেই যেতে হবে।'

বিমলা বড়ই মহব্বতের সাথে ওই যুবকের চিকচিক করতে থাকা কপালে নিজের আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে। অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর যুবক বললো- 'এই অবিশ্বাস্য টানটান উত্তেজনাকর পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার একটি পথ আছে- আপনারা যদি এই দুর্দশা থেকে বেরিয়ে আসতে চান, তাহলে প্রমাণ হিসেবে অজিতের খুবই ঘনিষ্ঠ একজন মহিলাকে আমাদের কাছে সোপর্দ করে দিন। আমাদের বোন যদি ঘরে পৌঁছে থাকে, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে ওই মহিলাকে ফেরত পাঠাবো- এই আমাদের প্রতিজ্ঞা।'

বিমলা দ্রুত অগ্রসর হয়ে বললো- 'আমি অজিতের বোন। আমি তোমার প্রস্তাব মঞ্জুর করলাম। তোমার সাথে যাওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত।'

কারও কোনো কথা শোনার আগেই সবার আগে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো সে। একজন মুসলিম সৈনিক ঘোড়া এগিয়ে দিলো। বিমলা ঘোড়ার ওপর আরোহণ করার সময় রাম দাস কাতরকণ্ঠে বললেন- 'হে মুসলমান যুবক! এ আমার কন্যা। তার সম্মানের দিকে লক্ষ রাখবে। সে নির্দোষ। তাকে অজিতের অন্যায়ে সাজা দেবে না। সে জগন্নাথ দেবতার দেবী।'

এক মুসলিম যুবক বললো- 'তুমি ভুল বলছো, বাবা! এ শুধু তোমার বা তোমার গোত্রেরই জামিন নয়; বরং গোটা মানবতার সম্মানের জামিন। আর আমরা জামিনদারের যথাযথ সম্মান ও নিরাপত্তা দিতে কার্পণ্য করি না।'

www.pathagar.com

বিমলার ঘোড়া ত বেগে মুসলিম অশ্বারোহীদের ঘোড়ার সাথে সাথে দৌড়ে যাচ্ছে। ঘোড়ার টগবগ শব্দে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে চুরমার। চাঁদ-তারার গতিপথ রাত পেরিয়ে ভোরের আলোর দিকে ধেয়ে চলেছে। বিমলা কয়েকবার তার সাথিদের দিকে তাকিয়েছে, কিন্তু সকলের দৃষ্টি সম্মুখ গন্তব্যের দিকে। মাথা অবনত।

ভোর হতেই সংক্ষিপ্ত এই কাফেলা তাদের গন্তব্যে এসে পৌঁছায়। একজন যুবক বিমলাকে নিয়ে একটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত বাসভবনে প্রবেশ করে। ভবনের মালিক ও বসতির সরদার নাদের খান নামাজ থেকে ফারেগ হয়ে দোয়া করছিলেন। দোয়া থেকে ফারেগ হয়ে উঠে দাঁড়ালে নাদের খানের দৃষ্টি পড়ে তাঁর যুবক পুত্র ও বিমলার দিকে। দীর্ঘক্ষণ তিনি ক্রোধভরা দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। বেশ কিছুক্ষণ ভয়াল নীরবতার পর তিনি রাগতস্বরে বললেন– 'এই মেয়ে কে?'

যুবক খুব আদবের সাথে বললো– 'খান বাবা! এ হচ্ছে অজিতের বোন... অজিত সকিনাকে উঠিয়ে নিয়েছিলো!'

নাদের খান বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন– 'অজিতের বোনকে এখানে কেন আনা হয়েছে?'

যুবক বললো– 'খান বাবা! আমি তাকে জামিন হিসেবে নিয়ে এসেছি।'

নাদের খান ক্রোধে হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে বললেন– 'ওহ্ ইসমাইল! আমি তোমাকে এতোটা হীনম্মন্য, বেহায়া, নির্লজ্জ ও অপদার্থ ভাবিনি। আমি ভাবতেও পারছি না, আমার ছেলে এতোটা নীচ, নির্দয় ও নির্লজ্জ হতে পারে! তুমি জুলুমের বদলা জুলুম করে মারাত্মক অপরাধ করেছো!'

ইসমাইলের শরীর পুরোদমে কাঁপছে। সে হাত জোড় করে বললো– 'খান বাবা! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আসলে পরিস্থিতিটাই এমন ছিলো যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এমন অন্যায় করতে হয়েছে আমাকে। তখন আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

নাদের খান বাঘের মতো গর্জন করে বললেন– 'তুমি সামাজিকভাবে আমার মাথা নিচু করে দিয়েছো। এই নিষ্পাপ মেয়েকে কোন অপরাধের কারণে এতো বড় শাস্তি দেয়া হলো? অজিতের বোন হওয়া তো কোনো অপরাধ নয়!'

www.pathagar.com

ইসমাইল মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– 'আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি, খান বাবা! দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন।'

নাদের খান এগিয়ে এসে বিমলার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'মা, আমি লজ্জিত। তোমার ওপর বড্ড অন্যায় করা হয়েছে, এ জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। তবে তুমি চিন্তা কোরো না। আমি আমার ছেলেকে এমন শাস্তি দেবো– যা আমার মেয়ে সকিনা তোমার ভাইকে দিয়েছে। আমার সন্তান এমন অন্যায় ও কলঙ্কজনক আচরণ করেছে– যা করেছে তোমার ভাই অজিত। আমাকে তোমার পিতার দৃষ্টিতে দেখো। দ্রুত আমি তোমাকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। আপাতত তুমি আমার সঙ্গে চলো।'

বিমলা নাদের খানের পেছনে পেছনে চললো। মনে হচ্ছে, তার পা যেন আকাশ ছুঁয়ে চলেছে। নিজেকে সে খুবই নির্ভার অনুভব করতে লাগলো। চোখের সামনে তার স্বপ্নের জাদু দোলা খাচ্ছিলো।

নাদের খান তার থাকার ঘরের কাছাকাছি পৌঁছালে সে মৃদুস্বরে ভিতু ভঙ্গিতে বললো– 'খান বাবা! একটি অনুরোধ ছিলো আমার।'

নাদের খান পেছনে ফিরে স্নেহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আবারও মাথায় হাত রেখে বললেন– 'মা! কী বলতে চাও? আমি তোমার সব কথা শুনবো। তুমি আমার কাছে আমার মেয়ে সকিনার মতোই প্রিয়। যা বলতে চাচ্ছো নির্ভয়ে বলো।'

বিমলা হাত জোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– 'খান বাবা! ইসমাইলকে শাস্তি দেবেন না। সে অপরাধী নয়; নির্দোষ। তাকে ক্ষমা করে দিন।'

'না মা, না!' নাদের খান দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন– 'আমি খুবই অপারগ। এ ব্যাপারে আমি তোমার সুপারিশ গ্রহণ করতে পারি না। সে অপরাধী, অন্যায়ের শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে। আমি ইনসাফের সব চাহিদা পূরণ করবো, মা! অন্যায় ও শাস্তির ঘটনা যদি সুপারিশ দ্বারা বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে দুনিয়া তো অন্ধকারে ভরে যাবে। আমি ইনসাফের আলোটুকু হত্যা করতে পারি না।'

বিমলা তার কম্পিত চাহনি উঠিয়ে বললো– 'ইসমাইল আমাকে জোর করে উঠিয়ে আনেনি। আমি স্বেচ্ছায় খুশিমনেই এখানে এসেছি। আমি এখানে আসতে চেয়েছিলাম। এখানে না এলে আমি তো মরেই যেতাম, খান বাবা!

www.pathagar.com

আপনার সম্মান রক্ষাকারী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছেলে আমার ওপর অনুগ্রহ করেছে। আমাকে উঠিয়ে আনা হয়নি, আমি স্বেচ্ছায় এসেছি।'

নাদের খান আশ্চর্য হয়ে বললেন– 'কিন্তু আমি কীভাবে নিশ্চিত হবো যে, তোমাকে জোর করে আনা হয়নি? তুমি কি শোনোনি ইসমাইল কী বলেছে? সে তো তোমার সামনেই বলেছে যে, তোমাকে জামিন হিসেবে নিয়ে এসেছে। খুশিমনে এলে তোমাকে আমি সাধুবাদ জানাই।'

'খান বাবা! আমি মুসলমানদের কাছ থেকে দেখতে চেয়েছিলাম।'

নাদের খান চুপ হয়ে গেলেন। এরপর কী যেন ভেবে জিজ্ঞেস করলেন– 'পথে তোমার সাথে কেউ কোনো প্রকার অশুভ আচরণ করেনি তো? তোমাকে কোনো কষ্ট দেয়া হয়নি তো?'

'না'। বিমলার চোখ অশ্রুতে টলমল। সে বললো– 'আমি আকাশের আলো ঝলমল তারকার সাথে সফর করেছি।'

নাদের খান হাঁটতে থাকলে বিমলা পেছন থেকে বললো– 'খানা বাবা, আমার সুপারিশের জবাব দেননি।'

নাদের খান বললেন– 'আমি ইসমাইলকে খুবই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে চাই। কিন্তু তুমি আমাকে থামিয়ে দিলে। তুমি যেমন চাও তেমনই হবে।'

সকিনা এখনো তার মা খানজাদিকে তার দুঃখভরা ঘটনা শুনিয়ে যাচ্ছিলো। বিমলাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন সকিনা ও খানজাদি। উভয়ে এগিয়ে এসে তাকে যথেষ্ট সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানালেন।

খানজাদি জিজ্ঞাসুনেত্রে নাদের খানের দিকে তাকালে তিনি বললেন– 'ফাতেমা খানজাদি! তোমার ছেলে আমাদের মাথা নিচু করে দিয়েছে। ওই কমবখত এই নিষ্পাপ মেয়েকে অন্যায়ভাবে জামিন হিসেবে নিয়ে এসেছে। এ হচ্ছে অজিতের বোন।'

সকিনা বিমলার গলায় গলা লাগিয়ে কোলাকুলি করে বললো– 'আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত। তোমার সাথে অন্যায় করা হয়েছে।'

'ওই কমবখত কোথায় গেলো? আমি নিজ হাতে তাকে শাস্তি দিতে চাই।' খানজাদি রাগে-ক্ষোভে কম্পিত গলায় আরও বললেন– 'আমাদের রক্ত কী করে এতোটা নীচ আর নাপাক হয়ে গেলো?'

www.pathagar.com

নাদের খান বললেন– 'বেগম! আমি ইসমাইলকে বড় কঠিন ও কড়া শাস্তি দিতে চাই। কিন্তু এই মেয়ের সুপারিশে আমার হাত বেঁধে দেয়া হয়েছে।'

ফাতেমা খানজাদি বিস্ময়ভঙ্গিতে বিমলার দিকে তাকালে সে বললো– 'আপনারা সবাই আমাদের ধারণার অনেক ঊর্ধ্বে। সব মুসলমান কি এমন কৃতিত্বের অধিকারী?'

ফাতেমা খানজাদি আদর-দরদে তার সাথে কোলাকুলি করে বললেন– 'মা! এখানে কৃতিত্বের কী দেখলে? আমাদের জন্য তো এটা খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার।'

নাদের খান বললেন– 'মেয়েটার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিক। আমি খুব দ্রুত তাকে ফেরত পাঠাতে চাই। গ্রামের লোকজন হয়তো তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আছে।'

বিমলা হাত জোড় করে বললো– 'না, খান বাবা! আমি ফিরে যাওয়ার জন্য আসিনি।'

'কিন্তু মা, এটা ঠিক হচ্ছে না। তোমার গোত্রের লোকজন কী ভাববে?' নাদের খান বললেন।

বিমলা বললো– 'যার যা মন চায় ভাবুক। আমি কিছুদিন এখানে থাকবো।' এরপর সে দ্রুত সকিনাকে উদ্দেশ করে বললো– 'সকিনা! আমি নেকাব পরিহিতের দোয়ার সুফল নিয়ে এসেছি।'

সকিনা আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাকে আবার গলায় জড়িয়ে ধরে বললো– 'আমি যদি বলি ওই তিন ফেরেশতার মধ্যে তুমিও একজন, তাহলে হয়তো তা ভুল হবে না।'

বিমলার দুই চোখ হতে অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে। সে কেঁদে কেঁদে বললো– 'আমি খুবই অপারগ ছিলাম, এর চেয়ে বেশি কিছু সাহায্য আমি করতে পারিনি।'

নাদের খানের চোখও অশ্রুসিক্ত। তিনি বিমলার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে বললেন– 'আজীবন আমরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।' তিনি দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

বিমলা নাশতার পর খানজাদি ও সকিনাকে তার কষ্ট-নির্যাতনের অশ্রুতে ভরা

www.pathagar.com

দুঃখের কাহিনি শোনালো। দুপুরের খাবারের পর নাদের খান এসে বললেন– 'মা! এখন ঘরে যাবার জন্য প্রস্তুতি নাও।'

বিমলা সকিনার দিকে তাকালো। সকিনা বললো– 'খান বাবা! বিমলা কয়েক দিন আমাদের সাথে থাকতে চায়।'

নাদের খান বললেন– 'মা! বিমলা এখানে থাকলে আমরা খুব খুশি হবো, কিন্তু পরিস্থিতির চাহিদা হচ্ছে তাকে অতি দ্রুত ঘরে পৌঁছে দেয়া। তার গ্রামবাসী উদ্বিগ্ন। তারা আমাদের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলবে।'

সকিনার জানা ছিলো যে, নাদের খান তার সিদ্ধান্তে অটল, তাই সে চুপ হয়ে যায়।

বিমলা বললো– 'আমি চলে যাবো কিন্তু যাওয়ার আগে আমার দুঃখভরা জীবনকাহিনি অবশ্যই আপনাকে শুনিয়ে যাবো।' নাদের খান চেয়ারে বসলেন।

বিমলা তার পা ছুঁয়ে বললো– 'প্রথম কথা হচ্ছে আমি অজিতের বোন নই; বরং তার বোন কামিনীর সখী।' এরপর সে কান্নাভেজা কণ্ঠে নাদের খানকে জগন্নাথ দেবতার মন্দিরে সংঘটিত সেই ভয়াল দুঃখের কাহিনি শোনালো। শেষে সে বললো– 'খান বাবা! আমি আমার ধর্মের ব্যাপারে বিতৃষ্ণ। এখন ইসলামই আমার প্রত্যাশার একমাত্র বাতিঘর ও আশ্রয়দাতা। আমি ইসলাম কবুল করতে চাই। আপনাদের খোদা কি আমার ছিন্নভিন্ন অস্তিত্বকে তাঁর স্মরণের জন্য কবুল করবেন?'

নাদের খানের চোখ অশ্রুসিক্ত। তিনি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন– 'বিমলা মা! তুমি মহান!'

এরপর তিনি বিমলার মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে বললেন– 'মা! আমাদের আলাদা কোনো খোদা নেই। আমাদের খোদা সবার খোদা। সারা জগতের খোদা। এটা ভিন্ন প্রসঙ্গ যে, কেউ কেউ তাকে ছেড়ে পাথরে তৈরি নিষ্প্রাণ টুকরোকে পূজা করা শুরু করে দিয়েছে। তোমার অস্তিত্ব ছিন্নভিন্ন নয়। তুমি তো নিজের ভেতর একটি পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বহন করে চলেছো। খোদা বড়ই দয়ালু ও মেহেরবান। তিনি তাঁর বান্দার ওপর সর্বদা ও সর্বত্র রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করে চলেছেন। যে যতো বেশি ধোঁকা-বঞ্চনা সহ্য করে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে, সে তাঁর কাছে ততো বেশি সম্মানিত ও মর্যাদাবান

www.pathagar.com

হিসেবে বিবেচিত। চূর্ণ-বিচূর্ণ কাচ কাচের কারিগরের কাছে খুব প্রিয় হয়ে থাকে। তুমি যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করতে চাও, তাহলে তা আমাদের জন্য খুবই আনন্দদায়ক ব্যাপার হবে।'

'জি, খান বাবা! আমি আমার আত্মার শান্তির জন্য ইসলাম কবুল করার আশা নিয়ে এসেছি।'

'মারহাবা!' নাদের খান বললেন।

কিছুক্ষণ পর বসতির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে বিমলা হকের কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। মুসলমান হওয়ার পর তার নাম রাখা হয় 'কুলসুম'।

দিনের পড়ন্ত বেলায় কুলসুম নাদের খানের ঘর থেকে বিদায় নেয়ার সময় তার চোখেমুখে ঝলমল করতে থাকে তৃপ্তির নুর। ইসমাইল তাকে দিয়ে আসতে বের হয়।

কুলসুম ঘোড়ায় আরোহণের আগ মুহূর্তে বললো- 'খান বাবা! ক'দিন পর জগন্নাথ মন্দিরের পূজারিরা আমাকে নিয়ে যেতে আসবে। এ কথাটি খেয়াল রাখবেন।'

নাদের খান তাকে স্নেহের পরশমাখা বুকে টেনে নিয়ে বললেন- 'কুলসুম! দুশ্চিন্তা কোরো না। এখন তুমি মুসলিম জাতির গৌরব। আর তোমার জেনে রাখা উচিত- আমরা তথা মুসলিম জাতি তাদের মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যাদের সম্মানের নিরাপত্তা দিতে জানি।'

কুলসুম ও ইসমাইল খুবই চুপিসারে সফর করে চলেছে। উভয়ের চেহারায় আনন্দের বন্যা। সন্ধ্যাবেলায় তারা গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছালে ইসমাইল বললো- 'কুলসুম! আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো।'

কুলসুম মুচকি হেসে বললো- 'আমিও তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। তুমি আমাকে পরম সত্যের সন্ধান পেতে সুযোগ করে দিয়েছো। ইসমাইল! আমি খুব খুশি। এখন আমি লক্ষ-কোটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র আত্মার আত্মীয় হবার গৌরব অর্জন করতে পেরেছি!'

***

রাম দাসের দরজায় শব্দ হচ্ছে। দরজা খুলে তিনি সামনে দেখতে পান- ইসমাইল ও তার মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

www.pathagar.com

রাম দাস খুশি হয়ে বললেন– 'এসো, বাচ্চারা ভেতরে এসো।'

এরপর ইসমাইল একটি থলে বের করে কুলসুমকে দিয়ে বললো– 'আমি ফেরার অনুমতি চাই। আম্মাজান এ অল্প কিছু জিনিস দিয়েছেন, এগুলো রাখুন।'

এরপর ইসমাইল ঘোড়া নিয়ে রওনা দিলো। কুলসুম অনেকক্ষণ ধরে ঘোড়ার টগবগ শব্দ শুনে যাচ্ছিলো। পরে ঘরে প্রবেশ করে পিতার কাছে সব বৃত্তান্ত খুলে বললো। সে বললো– 'পিতাজি! আমি মুসলমান হয়ে গেছি। এখন আমি মনে ভীষণ শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করছি। আমার আহত আত্মার ব্যাকুলতা দূর হয়ে গেছে। জীবনের ডুবন্ত ও হেলে পড়া তরি তীর খুঁজে পেয়েছে।'

রাম দাস মেয়ের কপালে চুমু খেয়ে বললেন– 'সাধুবাদ তোমাকে, তুমি তৃপ্তি অনুভব করছো।' এরপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে কিছু ভাবার পর বললেন– 'মা! আমিও মুসলমান হতে চাই।'

কুলসুম থলেটি খুলে দেখতে গেলে তার চোখ বেয়ে বিস্ময়ের অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। মূল্যবান হীরার সুদৃশ্য একটি অলংকার ছাড়াও ওটাতে দামি দামি কিছু কাপড় রয়েছে। এসব মূল্যবান বস্তুর নিচে ছিলো একটি লিখিত চিরকুট।

–'মা, একজন মায়ের কাছে দোয়া ছাড়া আর কী থাকতে পারে? আমার অফুরান দোয়া রয়েছে তোমার জন্য। খুব স্বল্প সময়েই তুমি তোমার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলে, এতে আমি বেশ ব্যথিত। এই হীন বস্তুগুলো ছাড়া আর কিছু তোমাকে দিতে পারলাম না, তাই আমি খুবই লজ্জিত। তোমাকে যদি আরো কিছুদিন রাখা সম্ভব হতো, তাহলে তোমাকে উপযুক্ত মর্যাদায় বিদায় দিতাম। আশা করি, তুমি একজন মায়ের দোয়া এবং এই বস্তুগুলো গ্রহণ করে নেবে। কুলসুম! চিন্তা করবে না, আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানিতে আমরা দ্রুত আবার মিলিত হবো। এরপর একে অন্যের কাছ থেকে আর কখনো পৃথক হবো না। তোমাদের খান বাবা খুবই অপারগ হয়ে তোমাকে তোমার ঘরে ফেরত পাঠিয়েছেন। আর হ্যাঁ, কোনো চিন্তা করবে না, এখন তুমি গোটা মুসলিম জাতির মর্যাদার প্রতীক। তুমি দেখবে, তোমার এক আহ্বানে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব লাব্বাইক বলে জুলুমের কুণ্ডলীতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

www.pathagar.com

ওয়াসসালাম

তোমার মা, ফাতেমা খানজাদি

কুলসুমের নয়ন থেকে মুক্তোর মতো অশ্রুদানা গড়িয়ে পড়ছে। সে পিতার বুকে মাথা রেখে বললো– 'আল্লাহর শপথ! আমার আত্মা একেবারেই নির্ভার হয়ে গেছে, বাবা! মনে হচ্ছে, আমি আকাশের তারাদের সঙ্গে অজানা, অদেখা কোনো দেশে পৌঁছে গেছি। যে দেশে আশা-প্রত্যাশারা ডানা মেলে উড়ে, শান্তি ও নিরাপত্তার ঘ্রাণে সর্বত্র মোহিত ও সুবাসিত। পিতাজি! তুমিও ইসলামের ছায়াতলে চলে এসো, এতে তোমার মনের সব দুঃখ মিটে যাবে।'

রাম দাস দূর আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'যে পথে তুমি চলেছো ওটাই আমার পথ। কিন্তু আপাতত আমি আমার এ প্রত্যয়ের ব্যাপারটি গোপন রাখতে চাইছি।'

ধীরে ধীরে রাত গভীর হয়ে যায়।

পরের দিন রাম দাসও ইসলামের চিরন্তন শ্বাশত শান্তির ছায়ায় আশ্রয় নেন। কিন্তু উভয়ে গ্রামবাসীর কাছ থেকে নিজেদের ধর্ম পরিবর্তনের বিষয়টি গোপন রাখে। কেবল কামিনীই জানতো রাম দাস ও বিমলার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ঘটনা। সে ছিলো যথেষ্ট নিষ্ঠাবান। খুবই সুহৃদ ও প্রশস্ত মনের অধিকারী ছিলো কামিনী। দীর্ঘদিন ধরে সে নিজেও হিন্দুদের জীবনাচার ও সামাজিক অনাচারের ব্যাপারে বিতৃষ্ণ। তাদের সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতো।

নাদের খানের পক্ষ হতে পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় একজন খতিব কুলসুম ও তার পিতা রাম দাস– যার ইসলামি নাম 'আহমাদ হাসান'– এদের ইসলামি শিক্ষা ও নামাজ পড়াতে আসেন। গভীর রাত পর্যন্ত তিনি এদের ইসলামের বিভিন্ন বিষয়-আশয় শিক্ষা দিতে থাকেন।

যাবার সময় আহমাদ হাসানের সাথে মুআনাকা (কোলাকুলি) করার সময় বললেন– 'ভাই আহমাদ হাসান! প্রতি রাতে আমি আসবো।'

আহমাদ হাসান বললেন– 'মাওলানা! এতে তো আপনার ভীষণ কষ্ট হবে!'

খতিব সাহেব বললেন– 'আপনি এ ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। আল্লাহর পথে কষ্ট সহ্য করা অনেক বড় সওয়াবের কারণ।'

www.pathagar.com

এসব কর্মকাণ্ড যথেষ্ট গোপনে চলতে থাকে। কিন্তু যেভাবে ফুলের সুবাস মুঠোবন্দী করা যায় না, তদ্রূপ এদের ইসলামের ব্যাপারটিও বহু চেষ্টা-কসরত সত্ত্বেও উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। বাপ-বেটি উভয়ে মন্দিরে আসা-যাওয়া ছেড়ে দেয়। একাকী জীবনযাপন করতে থাকে তারা। গ্রামবাসীর সুখ-দুঃখ ও ধর্মীয় রীতিনীতিও ছেড়ে দেয়। তাদের এই নির্জনবাস সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ জাগায়। কিছু মানুষ এক রাতের শেষ প্রহরে মুসলিম খতিবকে তাদের ঘর থেকে বেরোতে দেখে। এভাবে এক সপ্তাহ পেরিয়ে যায়।

একদিন গ্রামের মন্দিরের পুরোহিত তাদের ঘরে আসে। এতে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে কুলসুম। আহমাদ হাসান দৃঢ় প্রত্যয়ে তাকে বসান এবং আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে পুরোহিত বললেন– 'পণ্ডিতজি! গ্রামে বিভিন্ন ধরনের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। লোকজন তোমার এবং দেবীজির ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগ তুলছে। ভালো হবে যদি তোমরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে মানুষকে সন্তুষ্ট করো। না হলে তুমি তো জানো, এর ফলাফল হবে খুবই তিক্ত।'

আহমাদ হাসান বললেন– 'গ্রামবাসী আমাদের সম্পর্কে কী ধরনের অভিযোগ করে থাকে?'

আহমাদ হাসানের এ প্রশ্নের জবাবে মন্দিরের মহাদেব খুবই কর্কশ সুরে বললেন– 'যখন থেকে বিমলা দেবী নাদের খানের বসতি থেকে এসেছে, তখন থেকে তোমরা উভয়ে মন্দিরে আসা-যাওয়া ছেড়ে দিয়েছো, ধর্মীয় কোনো প্রকার আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছো না, দেবী পূজারিদের দর্শন ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু এর কারণ কী? বিমলা দেবী আর তোমার চিন্তাধারা কেন এতোটা বদলে গেলো?'

আহমাদ হাসানের পায়ের নিচের মাটি কাঁপছে। বৃদ্ধ চোখের সামনে সে এক ভয়ংকর ভবিষ্যতের বার্তা দেখতে পাচ্ছেন। ভয় আর শঙ্কার রাক্ষসগুলো তাদের চারপাশে নৃত্য করে চলেছে।

খুব কষ্টে তিনি তার অস্থিরতার ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখে বললেন– 'মহাত্মাজি! এসবই গ্রামবাসীর কুধারণা। নতুবা আমাদের আশা-ভরসা এবং প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস তো আগের মতোই গ্রামবাসীর সুখে-দুঃখে একাকার। বিমলা দেবী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তুমি তো জানো মহাত্মাজি, কোনো কুমারী নারী মুসলমানদের ঘরে যাওয়া কতোটা অঘটনের কারণ! এই অঘটনে বিমলার

www.pathagar.com

মনপ্রাণ আহত হয়ে পড়েছে। দেবীজি এক কঠিন দুর্দশার শিকার, তাই সে লোকজন থেকে দূরে সরে থাকতে চায়। দেবী এ ব্যাপারে ভীষণ দুঃখ পেয়েছে যে, কী করে মুসলমানরা তাকে জামিন হিসেবে নিয়ে গেলো আর পূজারিরা তার কোনো কাজে এলো না! মুসলমানদের সম্মান জানানো উচিত, কারণ তারা দেবীর সম্ভ্রমহানি করেনি! সসম্মানে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।'

পুরোহিত বললেন– 'কিন্তু দেবী তো স্বেচ্ছায় নিঃসংকোচে মুসলমানদের সাথে গিয়েছিলো। দেবী তো গ্রামবাসীর সামনে মিথ্যে বলেছে যে, সে অজিতের বোন।'

কুলসুম দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ, সবকিছু শুনে যাচ্ছিলো। এবার সে বেশ তিক্তকণ্ঠে বললো– 'আমি কামিনীকে আরেকটি শোকের হাত থেকে বাঁচাতে মিথ্যে বলেছিলাম। কারণ, সে সময় তার জন্য আপন যুবক ভাইয়ের নিহত হওয়ার ঘটনা কোনো অংশেই কম শোকের ব্যাপার ছিলো না। এছাড়া আমার বিশ্বাস ছিলো যে, গ্রামবাসী আমাদের রক্ষা করার জন্য মুসলমানদের সামনে লোহার মতো অটুট প্রাচীর হিসেবে দাঁড়াবে। কিন্তু মহাত্মাজি, পূজারিরা আমাদের মুসলমানদের দয়া আর অনুগ্রহের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। তরবারি তো দূরের কথা; কেউ উচ্চকণ্ঠে কথাও বলতে পারলো না! এখন আমি কীভাবে বা কী প্রয়োজনে পূজারিদের দর্শন দেবো? মহাত্মাজি! তুমি অন্যায় বিষয়ে কথা বলতে এসেছো, তোমার ভাষা আমাকে ভীষণ দুঃখ দিয়েছে।'

মহাত্মার চেহারায় গভীর চিন্তার ছাপ। তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে কী যেন ভাবছিলেন। এরপর তিনি কুলসুমের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন– 'আমার ওপর এখনই এ বিষয়ে জ্ঞান দেয়া হয়েছে।'

'তা কী?'

কুলসুম জিজ্ঞেস করলে মহাত্মা বলতে থাকেন– 'মুসলমানদের আচার-ব্যবহারে তোমরা উভয়ে প্রভাবিত। সনাতন ধর্মের শুভবার্তাগুলো থেকে তোমরা দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছো।'

কুলসুম বললো– 'তুমি ভুল বুঝছো মহাত্মাজি! এটা কোনো কথা নয়; যেটাকে তুমি জ্ঞান প্রকাশ হয়েছে বলে বুঝেছো, সেটা নিছক তোমার মনের কুমন্ত্রণা। আমার মন সাগরের মতো গভীর। আমি দেবী, কাউকে ঘৃণা করি

www.pathagar.com

না। অবশ্য আমি বেশ দুঃখ পেয়েছি, দুঃখের গভীর ক্ষত হতে এখনো রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ক'দিন নির্জনে থাকলে এমনিতেই দুঃখ ভুলে যাবো।'

পুরোহিত উঠে যাবার সময় কঠিন সুরে বললেন– 'যা হবার তা হয়ে গেছে। এ ক্ষতের কথা ভুলে গিয়ে কাল থেকে তোমরা উভয়ে নিয়মমাফিক মন্দিরে আসা শুরু করো, নতুবা পরিণতির সমস্ত দায়ভার তোমাদেরই নিতে হবে। এটা গোটা গ্রামবাসীর সম্মিলিত সিদ্ধান্ত।'

কুলসুম দৃঢ়কণ্ঠে বললো– 'মহাত্মাজি! আমরা তোমার বা গ্রামের লোকজনের জায়গির নই যে তোমার গ্রামের লোকজনের মর্জির বিপরীতে কিছুই করতে পারবো না! তুমি আমাকে সাধারণ মনে করে গ্রামবাসীর সাথে তুলনা করতে পারো না! আমারও কিছুটা ব্যক্তিত্ব আছে। মর্জি হলে মন্দিরে আসবো, মন না চাইলে কখনোই মন্দিরে আসবো না। আমি জগন্নাথ দেবতার পবিত্র দেবী, সাধারণ কোনো দেবী নই! আগামীতে বুঝেশুনে আমার সামনে কথা বলবে!'

মহাদেবের চোখ রাগে-ক্ষোভে রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। তিনি যাবার বেলায় বললেন– 'মনে হচ্ছে তোমার জীবনের আশ মিটে গেছে! তুমি এক দুর্ঘট দশার ওপর চলতে শুরু করেছো। তুমি বিধর্মী ও নাস্তিকতার পথ বেছে নিয়েছো!'

মহাদেব রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে চলে গেলেন।

'বাবা! এখন এখানে অবস্থান করা আমাদের জন্য উচিত নয়। মনে হয়, কাফেররা সবকিছু আঁচ করতে পেরেছে। এখান থেকে দ্রুত আমাদের হিজরত করে খান বাবার বসতিতে চলে যাওয়া উচিত। বিপদের ঘোর অন্ধকার আমাদের মাথার ওপর আসছে। অন্যায় ক্রোধের আগুন দাউদাউ করছে সবার মনে। মহাদেবের কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে, গ্রামের হিন্দুরা আমাদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর কোনো ষড়যন্ত্রের ফাঁদ এঁকে চলেছে। ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে পা তুলছে তারা।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আহমাদ হাসান বললেন– 'আগামীকাল শুক্রবার। মাওলানা সাহেব আসবেন। তাঁর সাথে রাতেই এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। তুমি এর মধ্যেই প্রয়োজনীয় সামানপত্র গুছিয়ে রেখো।'

বাপ-বেটির রক্তাক্ত চিত্তের আর্তনাদ কেবল গহিনেই বিলীন হয়। রক্তের দাগ মুছে আর কতোটুকুই-বা আড়াল করা যায় ক্ষত, অশ্রুজলে

www.pathagar.com

কতোটুকুই বা নেভানো যায় ভাঙা বুকের দাবানল। ধর্ষিত সত্ত্বার নগ্নতা দেখে বিমলা লজ্জিত নিজেই নিজের কাছে, বাতাসের উপহাসে ব্যাকরণহীন হয় মনের না-বলা ভাষা।

জুমার রাতের প্রথম প্রহর। আহমাদ হাসান ও কুলসুমের হৃৎকম্পন বেড়েই চলেছে। উভয়ের দৃষ্টি দরজার দিকে। কারও হাতের শব্দ শোনার জন্য তারা অধীর অপেক্ষায়। ক্ষণে ক্ষণে তাদের হৃৎকম্পন বেড়ে চলেছে। দূর গ্রামের এক কোণে কুকুরের কান্নার চিৎকার ভেসে আসছে। কুলসুম বললো– 'বাবা! আজ রাতে কিছু একটা ঘটতে পারে। বলা হয়ে থাকে– কোথাও কোনো কুকুর কান্না করা মৃত্যুর সংকেত বহন করে।'

আহমাদ হাসান কুলসুমের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'তুমি মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছো?'

'না, বাবা!' কুলসুম বললো– 'শাহাদাতের মৃত্যু তো মর্যাদার সোপান। কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে কাফেরদের এই গ্রামে আমাদের মৃত্যু হলে তারা আমাদের খুবই লাঞ্ছিতভাবে ধ্বংস করে দেবে।'

আহমাদ হাসান বললেন– 'আমরা যখন মুসলমান হয়ে ভালোবাসাময় শাহাদাতগাহে পা রেখেছি, তো এমতাবস্থায় মৃত্যুকে শাস্তি মনে করা উচিত হবে না।'

কুলসুমের চেহারায় নুরের আলোকচ্ছটা। সে বললো– 'বাবা! আমি খান বাবার বসতিতে মৃত্যুর প্রত্যাশা করি।'

আহমাদ হাসান বললেন– 'আল্লাহ তোমার মনের আশা অপূর্ণ রাখবেন না।'

জগতের সবকিছুই ঠিকঠাকমতো চলছে। রাতের আকাশ গভীর অন্ধকারে ঢেকে গেছে। হঠাৎ দরজায় মৃদু শব্দ। আহমাদ হাসান দ্রুত এসে দরজা খুলে দেন। মাওলানা নুর মুহাম্মাদ নুরি ভেতরে প্রবেশ করতেই দ্রুত দরজা বন্ধ করে দেন আহমাদ হাসান।

মাওলানা জিজ্ঞেস করলেন– 'আহমাদ হাসান ভাই! মা কুলসুম কোথায়?'

আহমাদ হাসান বললেন– 'সে নিজ কক্ষে নামাজ পড়ছে।'

মাওলানা নুর মুহাম্মাদ নুরি বললেন– 'আমার মনে হচ্ছে, আজকের রাতটি বেজায় ভারী। আমি নড়াচড়া করতে থাকা ছায়ার মতো কী যেন তোমাদের

www.pathagar.com

ঘরের আশপাশে পালিয়ে যেতে দেখেছি। দ্রুত আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে পড়া উচিত।'

এমন সময়ে কুলসুমও কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেছে। সে বললো– 'আমরা প্রস্তুত। আমি দীর্ঘক্ষণ ধরে বিপদের ভয়াল সংকেত আঁচ করে যাচ্ছি।'

এরপর হঠাৎ মন্দিরের ঘণ্টা আর কাঁসরের শব্দ ভেসে আসতে লাগলো। কুলসুম আশ্চর্য হয়ে বললো– 'অসময়ে কেন এই ঘণ্টা বাজানো হচ্ছে? মনে হচ্ছে, আমরা জালে আটকা পড়েছি।'

মাওলানা নুর মুহাম্মাদ নুরি কুলসুমের মাথায় হাত রেখে বললেন– 'মা, ভয় পেয়ো না। মুসলমান হওয়া সহজ কোনো ব্যাপার নয়। এখানে শাহাদাতের মাঠে পা রাখতে হয়। যেভাবে বাতি নিজে জ্বলে অন্যকে পথ দেখায়, ঠিক তদ্রূপ মুসলমানদের জীবন। আমি তুমি পরীক্ষাকেন্দ্রের দুর্দশা কাটিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছার যাত্রী। মহান আল্লাহর কাছে ধৈর্য ও অবিচলতার দোয়া চাওয়া উচিত। তাঁরই অপার কৃপায় আমরা পার পাবো। অন্যায়-অবিচারের এই গহিন অন্ধকার দ্রুতই মিটে যাবে।'

এমন সময় হঠাৎ বাহির থেকে সশস্ত্র কিছু লোক দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে গেলো। তাদের তরবারি কোষমুক্ত। একজন দৌড়ে ঘরের দরজা খুলে দিলো। জগন্নাথ দেবতার দুজন মহাদেবকে দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে দেখা গেলো। বাইরে প্রচুর মানুষের জটলা। একজন মহাদেব এগিয়ে এসে ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে কুলসুমের চুলের মুঠি করে ধরে টেনে বিছানার নিচে নামিয়ে বললেন– 'তুমি বিধর্মী হয়ে গেছো!'

মাওলানা নুর মুহাম্মাদ নুরি ক্রোধে গর্জন করতে থাকা সিংহের মতো এগিয়ে এসে মহাদেবের মুখে সজোরে এক থাপ্পড় মেরে বললেন– 'নাপাক কুত্তা! তুই তো এমন অপকর্ম করে মুসলমানদের মাহাত্ম্য আর মর্যাদার ওপর কলঙ্কের কালিমা লেপন করেছিস! আমি তোদের রক্ত পান করে তবেই ক্ষান্ত হবো।'

মুহূর্তকাল বিলম্ব না হতেই বিশাল হিন্দু গোষ্ঠী মাওলানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। নিমিষেই তারা মাওলানাকে রক্তে রঞ্জিত করে দিলো। আহমাদ হাসান ব্যথায় দগ্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন। প্রতিটি পলকেই নির্মম অত্যাচারের খড়্গ চলতে থাকলো তাদের ওপর।

www.pathagar.com

সে রাতেই জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের মহাদেবরা কুলসুম, আহমাদ হাসান ও মাওলানা নুর মুহাম্মাদ নুরিকে নিয়ে রওনা হয়।

কামিনী এই নিষ্পাপদের পরিণতি সম্পর্কে অবগত ছিলো। তার জানা ছিলো, জালেম হিন্দু মহাদেব মন্দিরে গিয়ে তাদের সাথে কেমন দুর্ব্যবহার করবে। সে তার পুরনো দাসীকে ডেকে বললো– 'তুমি আমার মায়ের মতো। তুমি আমাদের গোপন ভেদ জানো। আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজে এক জায়গায় যাচ্ছি। আশা করি, তুমি কাউকে আমার এখান থেকে কোথাও যাওয়ার ব্যাপারে অবহিত করবে না।'

দাসী বললো– 'মা! পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। খুবই ভয়ংকর পরিবেশ। তার পরও আমি তোমাকে নিষেধ করবো না। তুমি যাও, কিন্তু যতো দ্রুত সম্ভব ফিরে আসার চেষ্টা করবে।'

www.pathagar.com

প্রতিশোধযোদ্ধা

গাছের ছায়া লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে পশ্চিম দিকে। তেজতপ্ত সূর্য হেলে যেতে আরম্ভ করেছে পশ্চিম দিগন্তে। নাদের খান তার সুউচ্চ সুন্দর বাসভবনের পাশে বাগানের এক কোণে ক'জন সঙ্গীর সাথে বসে আলাপ করছেন। তার গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারায় অজানা শঙ্কার ছাপ। উদাস উদ্বিগ্নতায় তিনি বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন। শেষে একজন সুহৃদ জানতে চাইলেন– 'খান! কী ব্যাপারে? তোমাকে বেশ উদ্বিগ্ন আর পেরেশান দেখা যাচ্ছে! আমাদের কি বলবে না?'

নাদের খান আসন পরিবর্তন করে বললেন– 'যুবাইর, তুমি ঠিকই ধরেছো, আমি খুব পেরেশান। অজানা এক শঙ্কা আমার ভেতরটা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। কী এক দুর্ঘটনার আগাম সংকেতে কলজেটা মোচড় দিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, চরম ভয়াবহ পরিস্থিতি আমার দিকে ধেয়ে আসছে। আল্লাহ আমাদের মঙ্গল করুন... মাওলানা নুর মুহাম্মাদ নুরি এখনো ফিরে আসেননি।'

এমন সময় একজন সশস্ত্র সিপাহি দৌড়ে এসে বললো– 'অপরিচিত এক মেয়ে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে।'

নাদের খানের বুক ধড়ফড় করে কাঁপছে। তিনি বললেন– 'এখনই তাকে এখানে নিয়ে এসো।'

কিছুক্ষণ পর দীর্ঘদেহী অপরূপা কামিনী নাদের খানের সামনে এসে দাঁড়ালো। নাদের খান চঞ্চলকণ্ঠে বললেন– 'মা, তুমি কোথা হতে এসেছো? কী বলতে চাচ্ছো?'

www.pathagar.com

কামিনী কুর্নিশ করে হাত জোড় করে বললো– 'সরদার! আমি ভদ্রেক গ্রাম থেকে এসেছি। আমার নাম কামিনী। আর বিমলা– যার ইসলামি নাম কুলসুম– আমি তার সখী।'

নাদের খান এগিয়ে এসে তাকে বললেন– 'আমি আমার কন্যাকে খোশ আমদেদ জানাই, মা কামিনী! তোমার নামের একটি চিত্তাকর্ষক চিত্র আমার বুকে খোদাই করা আছে।' এরপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নাদের খান বললেন– 'মা কামিনী, তোমাকে ভীষণ উদ্বিগ্ন ও ভীত দেখা যাচ্ছে, হেতু কী? আমাদের মা কুলসুমের কী অবস্থা?'

কামিনী কান্নাজড়ানো কণ্ঠে বললো– 'বাহাদুর সরদার! আপনাদের মজলুম মেয়ে, তার পিতা ও মাওলানা রক্তপিপাসুদের নখর থাবায় আক্রান্ত। আমি মাঝরাতের নিস্তব্ধতায় ওই অসহায় নিষ্পাপদের আর্তচিৎকার এবং হিংস্র হায়েনাদের অট্টহাসি নিজ কানে শুনেছি। জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের মহাদেব ও পূজারিরা তাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গেছে। ওরা এদের জীবিত ছাড়বে না। তাদের রক্ষায় কিছু একটা করুন... সময় খুব ভয়াবহ।'

নাদের খান দাঁড়িয়ে বললেন– 'হিন্দু গাদ্দাররা মুসলমানদের ইজ্জতের ওপর হাত দিয়ে নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে। কুলসুম একা নয়, অসহায় নয়!'

কামিনী বললো– 'সরদার! দ্রুত কিছু করুন! কিঞ্চিৎ সময়ক্ষেপণ ওই নিষ্পাপদের জন্য শত বছরের অপেক্ষা মনে হবে।'

নাদের খান যুবাইর ও অন্য সঙ্গীকে উদ্দেশ করে বললেন– 'সম্ভবত আমি এই শঙ্কাতেই উদ্বিগ্ন ছিলাম। মা কুলসুমের আর্তচিৎকার বহু দূর হতে আমি অনুভব করতে পেরেছি। তোমরা বসতির যুবকদের ঘোষণা দিয়ে দাও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এই বাসভবনের কাছে যেন সমবেত হয়ে যায়। আগামীকাল ভোরেই আমার কন্যাকে রক্ষা করে ফিরবো।' এরপর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে ধরে বললেন– 'হে মহামহিম আল্লাহ! আপনার মহত্ত্বের গুণে আমাদের কন্যাকে আপনি জালেমদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন।'

মুহূর্তেই বসতির অগণিত যুবক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাসভবনের সামনে সমবেত হয়ে স্লোগানে স্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলছে।

www.pathagar.com

কামিনী তাদের কপালে সিংহের মতো ক্ষিপ্রতা আর সাহসের রেখা দেখে অভিভূত। সে এখন অনেকটা নির্ভার ও তৃপ্ত।

নাদের খান জনগণকে বিস্তারিত ঘটনা উল্লেখপূর্বক বললেন– 'কুলসুম আমাদের কন্যা। ইসলামের কন্যারা আমাদের মর্যাদার প্রতীক। তার কিছু হয়ে গেলে আমরা নিজেদের ক্ষমা করতে পারবো না। এই সময় জীবন-মরণের সময়। এটা পরীক্ষার মুহূর্ত। নির্দয় পূজারীরা আমাদের এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করেছে। আমরা ধর্মীয় সম্প্রীতি ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, কিন্তু দুরাচার ও চরমপন্থী হিন্দু মহাদেবরা আমাদের তরবারি কোষমুক্ত করতে বাধ্য করেছে। ইসলামের সৈনিকেরা তাদের মর্যাদার মুকুট নিয়ে ছিনিমিনি খেলা লোকদের আল্লাহর জমিনে জীবিত থাকতে দিতে পারে না। এই কঠিন সময়ে হয়তো কুলসুমের দুটি কান আমাদের ঘোড়ার শব্দ আর দিগ্‌বিদিক প্রকম্পিত করা তাকবিরধ্বনি শুনতে অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।'

ঠিক এমন সময়ে একজন তেজস্বী যুবক ভবনে প্রবেশ করলো। তার সঙ্গে ডজনখানেক সশস্ত্র সৈনিক। আগত যুবকের নাম হাশিম; সে নাদের খানের ভাতিজা এবং গোহাটির কেল্লাদার সরফরাজ খানের ছেলে। হাশিম ঘোড়া থেকে নেমে নাদের খানের পায়ে হাত দিয়ে উৎকণ্ঠার সুরে বললো– 'চাচা হুজুর! ঘটনা কী? লোকজন সশস্ত্র হয়ে কেন স্লোগান দিচ্ছে? কোনো উদ্ভট পরিস্থিতি ঘনিয়ে এলো কি?'

নাদের খান হাশিমের মাথায় চুমুর পরশ এঁটে দিয়ে বললেন– 'অতর্কিত তোমার আগমন আমাদের জন্য গায়েবি নুসরাতস্বরূপ, বাবা!'

হাশিম বললো– 'চাচা হুজুর, আমাকেও ঘটনা সম্পর্কে কিছুটা অবহিত করুন।'

নাদের খান বললেন– 'বাবা! সময় খুব কম। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে একটি পর্বত আমাদের হটাতে হবে। তোমার জন্য পীড়াদায়ক এ সংবাদটিই যথেষ্ট যে, কিছু হিন্দু হায়েনা তোমার চাচার পাগড়ি কেড়ে নিয়ে তাদের নাপাক পায়ের নিচে পিষ্ট করার স্পর্ধা দেখিয়েছে। এ মুহূর্তের এই সমাগম তোমার সেই নিষ্পাপ বোনের আর্তচিৎকারের প্রতিধ্বনি– যে আমাদের মুখে ডাকা কন্যা। সে ক'দিন আগে হিন্দুধর্ম ছেড়ে ইসলাম কবুল করেছে। আমি তোমাকে বিশ্রাম দেয়ার পরিবর্তে এই জিহাদে রওনা করাতে চাচ্ছি।'

www.pathagar.com

হাশিম ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে বললো– 'চাচা হুজুর! যতোক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের বোনকে হিন্দুদের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করতে না পারবো, ততোক্ষণ পর্যন্ত বিশ্রামের ব্যাপারে কোনো ভাবনা মাথায় নেয়াই পাপ মনে করি। দোয়া করুন, দোয়া আমাদের ভীষণ প্রয়োজন।'

নাদের খান বললেন– 'আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো।'

ইসমাইল এগিয়ে এসে নাদের খানের পা ছুঁয়ে বললো– 'বাবা হুজুর! আমাদের ওপর আস্থা রাখুন। ইনশাআল্লাহ আমরা রাতের মধ্যেই কুলসুম ও তার পিতা এবং মাওলানা নুর মুহাম্মাদ সাহেবকে হিন্দু নরপশুদের বন্দীখানা থেকে মুক্ত করে আনবো। আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন।'

নাদের খান বললেন– 'তোমরা সবাই আমার সন্তান। আমি তোমাদের সাহস ও বীরত্ব সম্পর্কে অবগত। কিন্তু মনে রেখো, আমাদের কন্যা ছাড়া এ বসতিতে ফিরে আসার স্পর্ধা দেখাবে না। যাও, আল্লাহই তোমাদের সাহায্যকারী। আমাদের দোয়ার ছায়াতলে কদম বাড়িয়ে এগিয়ে চলো।'

বসতির যুবকেরা স্লোগান দিতে দিতে ঘোড়ায় আরোহণ করলো। নাদের খান কামিনীর মাথার ওপর হাত রেখে বললেন– 'মা কামিনী! আমার সঙ্গে এসো, সকিনা ও তার মা তোমাকে পেয়ে ভীষণ খুশি হবে।'

কামিনী বললো– 'সরদার! এ মুহূর্তে এই সৈনিকদের সঙ্গে যাওয়া আমার ভীষণ প্রয়োজন।'

হাশিম কামিনীর দিকে তাকালো।

নাদের খান বললেন– 'মা, তুমি চিন্তা করো না। এরা ওইসব লোক– যারা পা বাড়ালে জমিনের প্রশস্ততা হাত গুটিয়ে আত্মসমর্পণ করে।'

কামিনী হাত জোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– 'এটা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু খান বাবা! মন্দিরের অন্ধকার নির্জন কক্ষ– যেখানে কুলসুম, তার পিতা ও মৌলভি সাহেবকে আটকে রাখা হয়েছে, তা খুঁজতে খুঁজতে এঁদের হপ্তা পেরিয়ে যাবে। ওই সময়টুকুতে হিন্দু মহাদেব ও পূজারিরা কুলসুম ও তার সাথিদের জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেবে। আমি সেই সব অন্ধকার রাস্তা সম্পর্কে অবগত। ওদিক দিয়ে গিয়ে দ্রুত আমরা ওই নরপশুদের আস্তানায় পৌঁছাতে সক্ষম হবো।'

www.pathagar.com

একটু ভেবে নাদের খান বললেন– 'সম্ভবত তুমি সঠিক বলছো।'

কিছুক্ষণ পর জানবাজদের ক্ষুদ্র এই বাহিনী– যাদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে একশ'র অধিক ছিলো না– হাশিম ও ইসমাইলের নেতৃত্বে বসতি হতে বের হয়ে জগন্নাথ দেবতার মন্দির অভিমুখে রওনা করলো। নাদের খান সেখানেই আল্লাহর দরবারে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। কেঁদে কেঁদে বললেন– 'হে আল্লাহ! আপনিই এদের সফলতার জামিন হতে পারেন।'

কামিনী খুব সহজভাবে হাশিম ও ইসমাইলের সাথে ঘোড়া দৌড়িয়ে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চললো। ঘন বন-জঙ্গল ও উঁচু উঁচু পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে এই বাহিনী এক অপরিচিত পথ ধরে অতর্কিতভাবে মন্দির পর্যন্ত পৌছে যেতে চায়। তাদের জানা ছিলো, মন্দিরের প্রহরীরা গুরুত্বপূর্ণ সব পথে ভালো করে পাহারা বসিয়েছে। কিন্তু কামিনী ও ইসমাইলের অভিনব কৌশলের কাছে জগন্নাথ মন্দিরের পূজারিদের কড়া সতর্কতা টিকলো না।

এখনো রাতের তৃতীয় প্রহর চলছে। তারকাগুচ্ছ এখনো মিটিমিটি আলো বিলিয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট এই বাহিনী জগন্নাথ মন্দিরের পেছনে প্রবাহিত নদীর ধারে এসে পৌছেছে। এই নদীর উভয় তীরে ঘন গাছের বন। গাছের দীর্ঘ ছায়া অন্ধকারের চাদর আরো গাঢ় করে রেখেছে।

কামিনী ঘোড়ার লাগাম টেনে গভীর নিশ্বাস নিয়ে বললো– 'আমাদের সফর শেষ হয়েছে। এক কঠিন দশা পেরিয়ে এলাম আমরা। নিজেদের বাহনগুলো জঙ্গলের অন্ধকারে লুকিয়ে রাখো। এই জঙ্গলের কোথায় যেন গোপন সুড়ঙ্গের চোরাপথ আছে। আমার ধারণা– ভোর হলে কোনো-না-কোনো পূজারি নিশ্চয় এদিকে আসবে। তাকে আক্রমণ করে আমরা খুব সহজেই তার থেকে সব তথ্য জেনে নিতে পারবো।'

হাশিম তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বললো– 'বন্ধুরা! নিজ নিজ ঘোড়ার মুখ বেঁধে সতর্কতার সাথে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকো। যে-ই মন্দিরের কোনো পূজারিকে দেখতে পাবে, অতর্কিত তাকে ধরে বেঁধে ফেলবে।'

হাশিম, কামিনী ও ইসমাইল ছড়িয়ে পড়লো এদিক-ওদিক। তারা মন্দিরের প্রাচীরের খুব কাছেই আছে। ভোর ঘনিয়ে আসছে। আলোকিত হতে চলেছে চারদিক। মন্দিরের ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। রাতের নিস্তব্ধতায় এক রহস্যময় অধ্যায় সমাপ্তির পথে। জানবাজরা সতর্ক।

www.pathagar.com

নদীর তীরে এক জায়গায় লম্বা লম্বা ঘন ঘাসে ঘেরা একটি ঢাকনা। একজন সিপাহি ওই ঢাকনার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। একধরনের সন্দেহ তার ভেতর। তার ধারণা এই ঢাকনার নিচে কোনো গর্ত আছে। ভোরের আভা দীপ্তমান। সূর্য কিরণ মেলেছে। হঠাৎ ঘাসগুলোতে নড়াচড়া অনুভূত হচ্ছে। সিপাহি ঘন একটি ঝাড়ের নিচে লুকিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর ঘাস চিরে উঠতে দেখা গেলো মোটা গড়নের ভুঁড়িওয়ালা এক পূজারিকে। সে খুবই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকালো। এরপর নিশ্চিন্ত মনে এগোতে থাকলো নদীর দিকে। তার মাথায় ছিলো লম্বা চুলের বেণি; যা তার ডান কাঁধে ঝোলানো। এখনো সে নদীর তীরে পৌঁছাতে পারেনি। লুকিয়ে থাকা সিপাহি ধীর কদমে এগিয়ে এসে পেছন থেকে বললো– 'নমস্কার, মহাত্মাজি!' পূজারি পেছনে ফিরে তাকালো। এরপর সশস্ত্র যুবককে দেখে ভীতকণ্ঠে বললো– 'তুমি কে? এদিকে কেন এসেছো?'

সিপাহি হাত জোড় করে বললো– 'মহাত্মাজি! দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই! আমার নাম মোহন। আমি স্নান করতে নদীতে এসেছি।'

পূজারি উদ্বেগের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললো– 'কিন্তু তোমাকে তো আগে কখনো দেখিনি!'

'দেখেননি তো কী হয়েছে? এখন ভালো করে দেখে নিন!'

মোহনের কথা শুনে পূজারি পেছনের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো– 'তোমার ভাষা তো ভীষণ কর্কশ! আমার সামনে থেকে দূর হও!'

মোহন সামনে গিয়ে বেশ আহ্লাদে পূজারির দীর্ঘ চুলের বেণি ধরে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিয়ে বললো– 'চিৎকার-চেঁচামেচির কোনো চেষ্টা করবে না, নইলে এই তরবারির ফলা তোমার কলজে ভেদ করে ছাড়বে।'

মোহন তার গলায় পা রেখে ইসমাইল ও হাশিমকে ডাকলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাশিম, ইসমাইল, কামিনীসহ অন্য সিপাহিরা পূজারির চারপাশ ঘিরে দাঁড়ালো। এরপর তাকে নিয়ে যাওয়া হলো ঘোর ঘন এক ঝাড়ের আড়ালে।

ইসমাইল তার কণ্ঠনালির ওপর তরবারি রেখে বললো– 'তোমাকে খুন করার কোনো ইচ্ছে আমাদের নেই। কিন্তু তুমি যদি আমাদের সাহায্য না করো, তাহলে তোমাকে জীবিত ছাড়া হবে না!'

www.pathagar.com

পূজারি কেঁপে কেঁপে হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজ, সৌম্য করুন! আমি নির্দোষ। আপনাদের সার্বিকভাবে আমি সহযোগিতা করবো। আপনারা কারা? আমার কাছে আপনারা কী চান?'

ইসমাইল তরবারির ফলা মৃদু চেপে ধরে বললো– 'আমাদের হাতে সময় খুব কম। বলো, বিমলা দেবী কোথায়?'

কামিনী পূজারির ফুলে ওঠা পেটে তরবারির ফলা রেখে বললো– 'মহাদেবজি! এখন তুমি জীবন-মরণের প্রান্তরে শুয়ে আছো। বলো বিমলা দেবী, তার পিতা ও একজন মুসলিম আলেম কোথায় আছেন? তারা কি জীবিত আছেন, নাকি তোমাদের লোকেরা তাদের ইহজগৎ থেকে বিদায় জানিয়ে দিয়েছে?'

'তারা জীবিত আছে।' পূজারি একটু নড়েচড়ে বললো। কামিনী জানতে চাইলো– 'তারা এখন মন্দিরের কোন অংশে অবস্থান করছে?'

পূজারি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো তার চারপাশে অজস্র তরবারি চিকচিক করছে। কামিনী বললো– 'মহাদেবজি! এসব লোক মৃত্যুর সাথে খেলা করে থাকে। এরা মন্দিরের সকল পাপিষ্ঠ প্রেতাত্মাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছে। তুমি যদি সবকিছু ঠিক ঠিক বলে দাও, তাহলে আমরা আমাদের লোকদের চুপিসারে নিয়ে চলে যাবো।'

পূজারি বললো– 'আমি কিছু জানি না। মন্দিরের বড় বড় রহস্য সম্পর্কে তো মহাত্মাজি ভালো অবগত।'

কামিনী তরবারিটি তার থুতনির নিচে রেখে বললো– 'মিথ্যাবাদী পূজারিজি! একটু আমার দিকে তাকাও, আমাকে চেনার চেষ্টা করো, আমার নাম কামিনী!'

পূজারি চমকে গিয়ে কামিনীর দিকে তাকালো। এরপর কম্পিত হাত জোড় করে বললো– 'সৌম্য করো দেবী! ভগবানের জন্য আমাকে কিছু বলো না। আমি ঠিক ঠিক সব বলে দিচ্ছি।'

হাশিম তাকে উঠিয়ে বললো– 'ভাববেন না মহাদেবজি! আপনাকে কিছুই করা হবে না। সত্যি করে বলুন, আমাদের লোকদের এখন কোথায় রাখা হয়েছে?'

পূজারি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো– 'আমি তোমাদের সবকিছু বলবো। কিন্তু আমাকে তোমরা এখানে ছেড়ে যাবে না। কেননা, পরে মহাত্মাজি আমাকে জীবিত ছাড়বে না।'

www.pathagar.com

ইসমাইল বললো– 'আমরা যে প্রতিজ্ঞা করি সর্বাবস্থায় তা পালন করে থাকি। দ্রুত বলো আমাদের লোকেরা কোথায়?'

মহাদেব বললো– 'তোমরা তোমাদের লোকদের রক্ষার জন্য যথাসময়ে এসে পৌঁছেছো। মহাত্মা তাদের মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের লোকেরা গোপন কক্ষে শেকলাবদ্ধ আছে। আমি তোমাদের গোপন কক্ষে নিয়ে যেতে প্রস্তুত।'

কালো রঙের পাথরে তৈরি গোপন কক্ষের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ছিলো খুবই ভয়াবহ। কুলসুম ও তার পিতার চেহারায় মশালের আলোকরশ্মি পড়ায় তা জ্বলজ্বল করছিলো। গোপন কক্ষের মাঝ বরাবর ছিলো একটি বিশাল চুলা। তার ভেতর এক গভীর গর্ত। গর্তে তখন তপ্ত আগুনের কয়লা। গোপন কক্ষটিতে চার-পাঁচজন পূজারি উপস্থিত আছে। পূজারিরা মাওলানাকে চুলার কাছে নিয়ে এসেছে। চুলার উভয় প্রান্তে লম্বা লম্বা দুটি খঞ্জর। এর মাধ্যমে মনুষ্য শরীরের গোশত টুকরো টুকরো হয়ে চুলার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতো। এক অবিশ্বাস্য মর্মবিদারী যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে একেক অঙ্গ খসে পড়তো আর এভাবেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতো মজলুমেরা।

এক মহাদেব চুলার কাছে হাত রেখে বললো– 'দেবীজি! আমরা আমাদের শুভ কাজ আরম্ভ করতে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরই এই শ্রীমানজির চিৎকার শুনতে পাবে। ধ্যান-ধৈর্যের সাথে তা শুনবে। চোখ বন্ধ করলে তোমার চোখে তপ্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করা হবে। এই হতভাগার শেষ চিৎকারের পূর্বে তোমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবে। মনে রাখবে, মোক্ষম সময়টা পেরিয়ে গেলেই কিন্তু তোমাদের সাথে আরো ভয়ানক ব্যবহার করা হবে। জগন্নাথ দেবতার ভগবানের কষ্ট আজীবন স্মরণ করে করে তুমি কাঁদতে থাকবে!'

মাওলানা নুর মুহাম্মাদ কুলসুমের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মা, কুলসুম! পরীক্ষার এই কঠিন মুহূর্তের কষ্টটুকু বিচক্ষণতা আর ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করো। শাহাদাতের সিঁড়ি সবার ভাগ্যে জোটে না। এই শাহাদাতের পর তোমাদের জন্য রয়েছে অনন্তকালের শান্তি। সোনা যেভাবে আগুনে পুড়ে অলংকারে রূপ নেয়, তদ্রূপ বন্দেগির হক আদায় করার ক্ষেত্রেও বান্দাকে দুর্দশা ও কষ্ট-ত্যাগ সহ্য করে যেতে হয়। অটল, অবিচল থেকো মা! ইসলামের আঁচল কিছুতেই ছাড়বে না। সবর দ্বারা এই কঠিন পরিস্থিতি সামাল দেবে। দয়াময় আল্লাহ তোমাদের এই ধৈর্য আর অবিচলতা বৃথা যেতে দেবেন না।'

www.pathagar.com

পূজারি খঞ্জরের হাতলে হাত রেখে বললো– 'শ্রীমানজি! উপদেশ দেয়া বন্ধ করো এবং নিজের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নাও।'

মাওলানার চেহারায় ঘামের ফোঁটা মুক্তার দানার মতো চিকচিক করছে। আগুনের কয়লার উত্তাপে তার চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। তিনি বললেন– 'আমি ভয় পাই না মৃত্যুকে। শাহাদাতকে আমি এক অমৃত সুধাজ্ঞান করি। অত্যাচারীরা! তোমরা খুব দ্রুত মৃত্যুর বিভীষিকায় পতিত হতে যাচ্ছো। মৃত্যু হবে তোমাদের জন্য এক ভয়াবহ শাস্তির উপলক্ষ।'

পূজারি ক্রোধান্বিত হয়ে উনুনের চারদিকে চক্কর দিলো। মাওলানার শরীর চুলার ঘূর্ণনের সাথে সাথে ঘুরছে। চুলার সাথে আটকানো খঞ্জর ঘূর্ণনের সাথে সাথে এক এক টুকরো কাটছে। এভাবে মাওলানার বাহুর দুই টুকরো গোশত কেটে নিচে আগুনে পড়ে গেছে। কুলসুমের পিতার মুখে চিৎকার। তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন– 'এই নির্দোষ নিষ্পাপ মানুষটিকে মেরো না। আমি তোমাদের আসামি, আমাকে মেরে ফেলো, আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলো!'

এক পূজারি অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'দেবীজি! যা কিছুই করো না কেন, তোমার পালাও আসছে!'

মাওলানা নুর মুহাম্মাদ আল্লাহু আকবার স্লোগান উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকলেন। এমন সময় সুড়ঙ্গ থেকে শোনা যাচ্ছে ভারী পায়ের আওয়াজ।

পূজারিরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে একে অন্যের দিকে তাকালো। এক মহাদেব অবচেতনভাবে বলে উঠলেন– 'কারা এখানে ধেয়ে আসার স্পর্ধা দেখাচ্ছে?'

অকস্মাৎ ইসমাইল, হাশিম ও মোহনকে দেখা গেলো। পূজারি সিঁড়ির দিকে পালাতে চাইলে মোহন তার গতি রোধ করে তরবারি কোষমুক্ত করে বললো– 'জানোয়ার! এখন কোথায় পালাচ্ছিস? সময় তোদের ওপর জীবনের সব কটি দ্বার বন্ধ করে দিয়েছে। তোরা রাক্ষস! তোদের জীবিত থাকা ভগবানের পছন্দ নয়!'

একজন মহাদেব কম্পিত কণ্ঠে বললেন– 'তোমাদের আমরা অঙ্গার করে ছাড়বো! জগন্নাথ দেবতার শক্তি তোমাদের ধূলিসাৎ করে ছাড়বে! আমার পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও, নইলে দেবতার কুদৃষ্টিতে তুমি অঙ্গার হয়ে যাবে!'

www.pathagar.com

মোহন তরবারি ঘুরিয়ে বললো– 'আমার ওপর তোর অভিশাপের কোনো প্রভাবই পড়বে না।'

এমন সময়ে হাশিম ও ইসমাইল মাওলানাকে চুলা থেকে তুলে আনতে সক্ষম হয়। ওদিকে কামিনী এবং আরো ক'জন জানবাজ কুলসুম ও তার পিতা আহমাদ হাসানকে শেকলমুক্ত করেছে।

কুলসুম তার চাদর ছিঁড়ে মাওলানার ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধতে শুরু করে। মোহন অতর্কিতভাবে এক মহাদেবের পেটে তরবারি দিয়ে আঘাত বসিয়ে দেয়। গোটা তরবারি গেঁথে আছে তার পেটে। সে বুনো ষাঁড়ের মতো লাফিয়ে উঠলো এবং একটু পরই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। একজন মুজাহিদ তার নিথর লাশ উঠিয়ে ফেলে দিলো গর্তে।

মাওলানা আহতকণ্ঠে বললেন– 'বাবারা! নিঃসন্দেহে এইসব লোক কোনো প্রকার অনুগ্রহের উপযুক্ত নয়; তার পরও তাদের ক্ষমা করে দাও। ভালো হবে, আমাদের মোকদ্দমা হাশর মাঠের অধিপতির কাছে সোপর্দ করলে।'

শেখর অন্য এক পূজারিকে হত্যা করে বললো– 'মাওলানা! এ মুহূর্তে তাদের শেষ পরিণতির কথা আমাদের জানা হয়ে গেছে। ন্যায়ের চাহিদাকে আমরা পূর্ণ করতে চলেছি। এরা ধরার বুকে কলঙ্ক। নাপাক জন্তুগুলোর এই জগতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই।'

মুহূর্তের মধ্যেই গোপন কক্ষে থাকা সব পূজারিকে মৃত্যুঘাটে পৌঁছে দেয়া হয়। ইসমাইল মাওলানাকে কাঁধে তুলে নিতে চাইলে তিনি বললেন– 'এ কী করছো? আমার তো কিছুই হয়নি! নিজ পায়ে আমি দাঁড়াতে পারবো এবং হাঁটতেও পারবো।'

কামিনী কুলসুমকে হাঁটতে সহযোগিতা করছে। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো।

ইসমাইল বললো– 'কুলসুম! আমাদের ক্ষমা করে দিও। যদিও আমরা এক মুহূর্তও বিলম্ব করিনি, তার পরও তোমরা যে অপরিসীম দুঃখ-যাতনার মুখোমুখি হয়েছো, সে জন্য আমরা আন্তরিকভাবে লজ্জিত ও দুঃখিত।'

'না!' কুলসুম জোর গলায় বললো– 'আনন্দের আধিক্য আমায় হাসতে দিচ্ছে না।'

www.pathagar.com

হাশিম বললো– 'এখন আমাদের এখান থেকে বের হওয়া উচিত। খুন-খারাবির অনুমতি আমাদের দেয়া হয়নি।'

গোপন কক্ষের জ্বলন্ত লাশগুলো থেকে ছড়িয়ে পড়ছে দুর্গন্ধ। পূজারিদের লাশ পোড়া লাকড়ির মতো অঙ্গারে রূপ নিতে থাকে।

***

সূর্যের সোনালি রোদ উঁচু উঁচু পর্বত ও বিশাল গাছপালার চূড়ায় চুমু খেতে লাগলো। সকালের সময়টাতে বিরাজ করছিলো সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ। চারদিকে পাখপাখালির কিচিরমিচির ঝংকার। বাহাদুর সৈন্যদের ছোট্ট একটি অংশ সফলতা ও সার্থকতার উদ্দীপনার সাথে লক্ষ্যপানে দ্রুতগতিতে চলতে লাগলো। ঠিক দুপুর নাগাদ এমন স্থানে গিয়ে সৈন্যদল পৌঁছলো, যেখানে এক রাস্তা ভদ্রেকের দিকে গেছে, অপর রাস্তা গেছে নাদের খানের বসতির দিকে। কামিনী ওই দ্বিমুখী রাস্তায় পৌঁছে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলো। এরপর হাস্যোজ্জ্বল নয়নে মুজাহিদদের দিকে তাকিয়ে বললো–

'সম্মানিত ভ্রাতৃবৃন্দ! এখন আমার ঘরে ফেরার সময় এসেছে।'

সব মুজাহিদ এক এক করে আপন আপন ঘোড়া থেকে অবতরণ করলো। কুলসুম কামিনীর সাথে আলিঙ্গন করার সময় বললো– 'কামিনী! তুমি অনেক বড় হও! তোমার মর্যাদার উচ্চতা পর্বতচূড়া পেরিয়ে আকাশের গায়ে মিশে আছে। তোমার সারা জীবন নিরাপদে থাকুক। তোমার প্রতিটি কদম আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তুমিও আমাদের স্মরণ রেখো। রাতের নিস্তব্ধতায় চাঁদ ও তারকারাজির কাছ থেকে আমাদের হালত জানিও।'

কামিনী বললো– 'তুমি প্রজ্জ্বলিত হও! আমি চাঁদ, তারকারাজি ও নীলাকাশ থেকে তোমার অবস্থা কী জিজ্ঞেস করবো? তুমি তো আমার মনমন্দিরের দেবী! আমি তোমাকে মান্য করি এবং সব সময় মান্য করেই যাবো। আমার মনের দৃঢ় বিশ্বাস, দ্রুত সময়ে আবার মিলিত হবো আমরা এবং আর কখনো পৃথক হবো না।'

ইসমাইল শেখরকে সম্বোধন করে বললো– 'শেখর! তুমি মাওলানা সাহেবকে নিয়ে বসতিতে চলে যাও। আমি কামিনীকে তার গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য যাচ্ছি।'

www.pathagar.com

মাওলানা সাহেবকে শেখর তার সামনে বসিয়ে দিলো। মাওলানা সাহেবের চেহারায় হলদে আভা। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে শরীরে দুর্বলতা এসে গেছে। শেখর ঘোড়ার পদাঘাত করলো এবং ব্যঘ্রগতিতে বসতির দিকে ছুটে চললো।

কামিনী ঘোড়ার পিঠে চড়তে গিয়ে বললো– 'মন্দিরের মহাদেবজির জন্য আমাদের ভদ্রেকে কোনো সমস্যা হবে না। এছাড়া মহাদেবজির উপস্থিতিতে হিন্দুদের অরাজকতা ও নৈরাজ্য থেকে রেহাই পাওয়া সহজতর হবে।'

মহাদেবজি কামিনীর সঙ্গে যাওয়ার জন্য ঘোড়ার ওপর চড়ে বসলে কামিনী ইসমাইল ও তার সাথিদের সম্বোধন করে বললো– 'তোমরা সবাই বসতিতে চলে যাও। খান বাবা পেরেশানিতে ভুগবেন। ...নমস্কার!'

কামিনী ঘোড়ার পদাঘাত করলে মহাদেবও তার অনুসরণ করলো। ইসমাইল, হাশিম, কুলসুম, আহমাদ হাসান ও তাদের অন্য সাথিরা অনেকক্ষণ ধরে তাদের ঘোড়ার পদধ্বনি শুনতে থাকে। চোখ থেকে তারা অদৃশ্য হয়ে গেলে বাকি সবাই বসতির দিকে রওনা হলো।

শেখর মাওলানাকে নিয়ে অনেক আগেই পৌঁছে গেছে বসতিতে। ইসমাইল, হাশিম ও তার সাথিদের সাফল্যের সংবাদ শেখরের মাধ্যমে পৌঁছে যায়। বসতির নিরাপত্তা বাহিনী খুশির স্লোগান দিতে দিতে জড়ো হতে থাকে নাদের খানের প্রাসাদের সামনে। চারদিকে উৎসবের আমেজ। হেকিম হুসাইনি বেগ মাওলানা সাহেবের ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়ে পট্টি বেঁধে দেন।

দিন প্রায় শেষের দিকে। প্রাচীর ও বৃক্ষরাজির ছায়া প্রলম্বিত হতে থাকে পুব দিকে। বীর সিপাহিদের ছোট দলটি বসতিতে প্রবেশ করলে সংবর্ধনার উচ্ছ্বাসভরা স্লোগানে স্লোগানে আকাশ-বাতাস কেঁপে ওঠে। কুলসুমের চোখে বৃষ্টির ফোঁটার মতো অশ্রুবিন্দু।

তার কোমল চেহারায় ছড়িয়ে আছে খুশির রঙ। নাদের খানের প্রাসাদের বড় দরজা খোলা হলে রাজ অশ্বারোহীরা নিজ নিজ ঘোড়া থেকে অবতরণ করলো। নাদের খান লম্বা কদমে কুলসুমের কাছে এসে পৌঁছালেন। তার মাথায় হাত রেখে মৃদু স্বরে ডেকে বললেন– 'মা কুলসুম! এখন আমরা আর কখনো একে অপরের কাছ থেকে পৃথক হবো না। আমি বুঝতে পেরেছি তোমাকে ফেরত পাঠিয়ে আমি ভুল করেছি। কিন্তু মা! এটা করতে আমি বাধ্য

www.pathagar.com

ছিলাম। যদি তোমাকে ভদ্রেকে ফেরত না পাঠাতাম, তাহলে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ও মিথ্যাচারী বলে সাব্যস্ত হতাম।'

কুলসুম নাদের খানের বুকের ওপর মাথা রেখে ছোট্ট বাচ্চার মতো কাঁদতে লাগলো। সে কান্নারত অবস্থায় বললো- 'খান বাবা! ওটা ছিলো আমাদের জীবনে এক কঠিন পরীক্ষার কাল। খোদার অনুগ্রহ ও দয়ায় আমরা কৃতকার্য হয়েছি।'

নাদের খান আহমাদ হাসানের দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন- 'তুমি মা কুলসুমের পিতা, তাই না?'

জবাবে আহমাদ হাসান বললেন- 'কুলসুম আমার ঘরে জন্ম নিয়েছে তা ঠিক, তবে আপনাকেই তার পিতা বলা যুক্তিযুক্ত, সরদার!'

'তুমিই কুলসুমের পিতা। আমি তোমার কাছে এবং কুলসুমের কাছে লজ্জিত।' বললেন নাদের খান।

নাদের খান আহমাদ হাসানের সাথে আলিঙ্গন করতে করতে বললেন- 'ভাই আহমাদ হাসান! অতীতের সব স্মৃতি ভুলে যাও। এখন তুমি এক নতুন দুনিয়ায় নতুন পরিবার ও নতুন বন্ধুবান্ধবের সাথে নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছো। আমরা তোমার ভাই। কুলসুম ও সকিনা তোমার কন্যাদ্বয়। সব তোমার ছেলেপেলে। তুমি আমাদের প্রিয়দেরই একজন।'

অতঃপর নাদের খান ইসমাইল ও হাশিমের দিকে মৃদু হেসে উচ্ছ্বাসভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন- 'তোমরা সংবর্ধিত হবার যোগ্য।' ইসমাইলের পেছনে দাঁড়ানো মোহনকে ইশারায় ডেকে বললেন- 'তুমি তোমার ভাইয়ের পেছনে কেন লুকিয়ে রয়েছো? কাছে আসো আমার। আমার সাথে আলিঙ্গন করো। তোমার কি জানা নেই, তুমি আমার কতোটা প্রিয়ভাজন?' মোহন অগ্রসর হয়ে নাদের খানের পা ছুঁয়ে বললো- 'সরদার! আপনি আমাদের ভগবান! আমরা আপনারই পূজারি।'

নাদের খান তার কপালে চুমু খেয়ে বললেন- 'তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? ভগবান কাকে বলে জানো?'

'আমি জানি।' মোহন উত্তর দিলো। 'যার পূজা করা হয়, তাকেই ভগবান বলা হয়।'

www.pathagar.com

নাদের খান বললেন– 'না বেটা, না! আমাকে বাবা বলেই ডাকো; ভগবান নয়! ভগবান তো গোটা বিশ্বজগতের মালিককেই বলা হয়! ঠিক আছে, চলো!'

মোহন হাত জোড় করে বললো– 'অনুগ্রহ করুন! আমরা আপনাকে হৃদ্যতার ভগবান বলেই ডাকবো।'

নাদের খান মৃদু হাসি দিয়ে বললেন– 'ভাই আহমাদ হাসান! এ হলো আমার কালো মানিক।'

আহমাদ হাসানের দু'চোখ জলে টইটম্বুর। তিনি বললেন– 'সরদার! মোহন তো ঠিকই বলেছে। আপনি আমাদের হৃদ্যতার ভগবান।'

নাদের খান ইসমাইলের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'ইসমাইল! কুলসুমকে প্রাসাদের ভেতরে নিয়ে যাও। তোমার মা ও সকিনা অনেকক্ষণ ধরে তার অপেক্ষায় আছে।'

নাদের খান আকাশের দিকে দু'হাত প্রসারিত করে বললেন– 'হে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা! তুমি কতোই না মর্যাদার অধিকারী! আমরা তোমার অক্ষম বান্দা। তোমার রহমতের ও সাহায্যের বারিধারা গণনা করে শেষ করতে পারবো না। এসব তোমারই করুণায় সম্ভবপর হয়েছে। তোমার লাখো-কোটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তুমি তোমার অক্ষম বান্দাদের ইজ্জত রক্ষা করো।'

এরপর তিনি জনতার দিকে লক্ষ করে বললেন– 'ভাই সকল! জিহাদ এখনো শেষ হয়নি বরং আমি মনে করি, জিহাদ মাত্র শুরু হয়েছে। মহাত্মা, মহাদেব ও তাদের পূজারিরা গোপন কোনো চক্রান্তে মেতে উঠতে পারে। মানবতার দুশমন অতি দ্রুত ষড়যন্ত্রের জাল ফেলার প্রয়াস চালাবে। নতুন নতুন পদ্ধতিতে হিংস্রতার দ্বার উন্মুক্ত করবে। এতে আমরা মোটেই বিচলিত নই। আমরা আমাদের পেশিশক্তির চেয়ে আল্লাহর করুণার ওপর অধিক ভরসা করি। তোমরা সবাই এক তাৎপর্যবহ কর্মযজ্ঞ সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করেছো। তোমরা মানবসভ্যতাকে পশুত্বের রক্তারক্তি থেকে বের করে সম্মান ও আত্মসম্ভ্রমবোধকে উঁচু করে তুলে ধরেছো।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি আবার বলতে লাগলেন– 'আমার মন চাচ্ছে, মন্দিরের মহাদেব ও আসামের মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের প্রতি অনুগ্রহের সব

www.pathagar.com

পথ বন্ধ করে দেয়া হোক এবং তাদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া হোক। তোমরা জানো, মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের শ্যেনদৃষ্টি এখন গোহাটির দুর্গ এবং তার আশপাশের এলাকার ওপর। ওই এলাকাগুলোকে সে নিজের শাসিত রাষ্ট্রের হারানো ভূখণ্ড মনে করে। মহারাজা এ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে লাভবান হতে পুরো শক্তি ব্যয় করবে। সে হিন্দু মহাদেব, পণ্ডিত, পূজারি ও ভক্তদের মাধ্যমে ওই এলাকায় বিদ্রোহ সৃষ্টি ও সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মীয় সহিংসতার বিস্তার ঘটাতে জোর চেষ্টা চালাবে।'

মোহন বললো– 'আমরা পদে পদে তাদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে আসামের রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছে যাবো। মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের স্বপ্নকে আমরা মাটির সাথে মিশিয়ে দেবো।'

নাদের খান খুশিতে মুচকি হাসি দিয়ে বললেন– 'যদি জয়ধ্বজ সিং আমাদের স্বাধীনতা ও ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে লুণ্ঠন করতে চায়, তাহলে আমরা ইটের জবাব পাথরে দেবো। আমি কালই গোহাটি দুর্গের অধিপতি ফিরোজ খানকে অবস্থার ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত করতে গোহাটি যাবো।'

***

প্রকৃতপক্ষে সরদার নাদের খানের বসতি তৎকালে ছিলো বাংলার মুসলিম রাজত্বের এক মজবুত সিংহাসন। বসতিটি চারদিক থেকে মজবুত প্রাচীরে ঘেরা। এই বসতিটি প্রতিরোধক্ষমতার দিক দিয়ে একটা ছোট দুর্গের মতো ছিলো। তার ভেতরে পূর্ব প্রান্তের দরজা থেকে শুরু করে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত বসতির অদূরে ছিলো বিশাল এক খোলা মাঠ। ওই মাঠের দৈর্ঘ্য ছিলো দুই মাইলের মতো। এদিকে প্রস্থ ছিলো এক মাইলের কাছাকাছি। যোদ্ধাদের বিভিন্ন ট্রেনিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হতো এই মাঠ। মাঠের একপাশে প্রাচীরের পাশাপাশি সৈন্যদের জন্য বসতিও ছিলো। বসতিগুলোতে দশ থেকে পনেরো হাজার সৈন্য অনায়াসেই বসবাস করতে পারতো। এই মাঠে প্রতিনিয়ত সৈন্যরা অনুশীলন করে থাকে। ঘোড়দৌড়, বল্লম-বর্শা দিয়ে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ, তলোয়ার চালানো, সৈনিকদের চৌকস তিরন্দাজ হিসেবে গড়ে তোলা এবং লক্ষ্যস্থল আক্রমণে সক্ষম হওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এ বিশাল মাঠে। নাদের খান নিজেও এসবে অংশগ্রহণ করতেন। ওই সময় তিনি

www.pathagar.com

মাঠের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থান করতেন এবং হিন্দু-মুসলিমকে একসাথে সমবেত করে ভাষণ দিতেন।

বসতির লোকরা বেশ সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করতো। তাদের মাঝে কখনো দেখা যেতো না গোত্রীয় কিংবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-ফ্যাসাদ। সব সময় হৃদ্যতা ও ভালোবাসার শীতল হাওয়া বিরাজ করতো। নাদের খানের বসতির দক্ষিণ দিকে প্রায় বিশ মাইল দূরে ভদ্রেক নামীয় মনোরম গ্রাম। এখান থেকে জগন্নাথ দেবতার গ্রাম পুব দিকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে অবস্থিত। আসাম হতে জগন্নাথের সীমান্ত অনেক কাছে।

জগন্নাথ ও ভদ্রেক গ্রামগুলোতে বসবাস করতো হিন্দুরা। আসামের মহারাজা জয়ধ্বজ সিং ওই সব এলাকাকে নিজের দখলকৃত এলাকা মনে করে। তাই এসব অঞ্চলকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে সে। সে গোহাটি পর্যন্ত সবুজ শস্যশ্যামল এলাকাগুলো দখলে নিতে কূটকৌশলের আশ্রয় নিতে থাকে।

বাংলার হাকিম নবাব আলি কুলি খান আসামের মহারাজার নৈরাজ্য ও দুষ্ট চরিত্র সম্পর্কে ভালোই জ্ঞান রাখেন এবং তিনি এটা নিয়ে সব সময় ভাবেন। নাদের খান জনতাকে লক্ষ করে বললেন– 'ইতিহাস আমাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে পারবে না। সময় আমাদের কাছ থেকে বড় পাষাণ ভঙ্গিতে বারবার পরীক্ষা নিচ্ছে। পরীক্ষার কঠোরতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তপ্ত ময়দানের অগ্রভাগে অবস্থানকারী লোক আমরা।'

বসতির মন্দিরের মহাদেব স্বামী মনোহর লাল হিন্দু রীতি অনুসারে হাত জোড় করে বললেন– 'আমি জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের মহাত্মা কাশিরামের মন্দ চরিত্রের ব্যাপারে অবগত। সে বিষাক্ত কালনাগ, ঘাতক, রাক্ষস, জঙ্গলের হিংস্র প্রাণী। তার ধমনিজুড়ে জুলুম-অত্যাচারের অবাধ বিচরণ। সে সাধকরূপী গোপন হায়েনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস– সে চারদিকে বিষ ছড়াবে। গোঁড়ামির আগুন জ্বালাবে। শান্তিপ্রিয় মানুষকে রক্তাক্ত করবে। যদি ওই বিষাক্ত অজগর সাপকে ফণা তোলার আগেই পর্যুদস্ত করা যায়, তাহলে অনেক ভালো হবে। তখন আমরা যুদ্ধ ও রক্তারক্তির ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে বেঁচে যাবো। আমার পরামর্শ হচ্ছে, মহাত্মা কাশিরামকে গ্রেফতার করে জেলখানায় বন্দী করে রাখা হোক। তাকে মহারাজা জয়ধ্বজ সিং পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগই যদি দেয়া না হয়, তবেই মঙ্গল।'

www.pathagar.com

নাদের খান তার ঘোড়ার গর্দানের উপরিভাগের লোমের ওপর হাত বুলাতে বুলাতে মুচকি হাসি দিয়ে বললেন– 'স্বামীজি! সময় ও চাহিদা অনুসারে আপনার পরামর্শ অনেক মূল্যবান ও গুরুত্ববহ। আমি আপনার বিচক্ষণতা ও রাজনৈতিক দক্ষতা সবসময় স্বীকার করি। আপনার প্রতিটা পরামর্শ দেশের জন্য কল্যাণকর। আমি হয়তো আপনার পরামর্শের ওপর কাজ করতে সক্ষম হবো। এই কষ্টদায়ক অবস্থার সামনে আমরা বহু দুর্বল। আমরা আসামের মহারাজার সাথে লড়াই করতে সক্ষম। পূর্ণ শক্তির সাথে তার বর্বরতার প্রসার রুখে দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু নিজের অধিকৃত ভূমির ভেতরে একজন ব্যক্তির মতানৈক্যেও কোনো সংস্কারমূলক কাজ করতে আমি অপারগ। আমরা চলমান পরিস্থিতিকে ভাগ্য ও নসিবের ওপর ছেড়ে দিই। প্রথমে মহাত্মার ইচ্ছেটা কী, সেটা আমরা দেখবো। সন্দেহ ও অনুমানকে কোনো কাজেরই মূল ভিত্তি বানাবো না। কেউ অপরাধী হবার আগেই তাকে শাস্তির উপযোগী বলে ফেলা নৈতিকতাকে রক্তাক্ত করার নামান্তর। এই দুনিয়া হচ্ছে প্রতিফলের কেন্দ্র। যেখানে দ্রুত অথবা অল্প দেরিতে সব কাজেরই পরিণতি ভুগতে হয়। যদি মহাত্মা কাশিরাম মরণকর্মকেই পছন্দ করে, তাহলে তাকেও মৃত্যুর কালে দু-চার খণ্ড হয়ে যেতে হবে।'

স্বামী মনোহর লাল মাত্রাতিরিক্ত ব্যগ্রতায় ব্যাকুল হয়ে নাদের খানের চরণ স্পর্শ করে বলতে লাগলো– 'সরদার! তুমি খুব ঘন ছায়াময় বিস্তৃত বৃক্ষের মতো। কোনো জঘন্যতম শত্রুও যদি চায় তোমার ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারে। তুমি ভালোবাসার দেবতা!'

নাদের খান স্বামী মনোহর লালের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে শ্রদ্ধাভরে বললেন– 'স্বামীজি! কখনো কখনো আপনি অতিরিক্ত আবেগের জোয়ারে ভেসে বহু দূরে চলে যান। আমি দেবতা নই! আমি তো আপন প্রতিপালকের বড় অক্ষম, বড় নস্যি, বড় পাপিষ্ঠ গোলাম!'

নাদের খান চুপ হলে বসতির এক লোক হাত জোড় করে বলে– 'সরদার! আমার বিচার অনুসারে স্বামীজির কথামতো কাজ করা খুব জরুরি। মহাত্মা বেশরম ও চক্রান্তবাজ লোক। সে দেশে হিংসার আগুন বৃদ্ধি করবে। আমাদের একতা খণ্ড-বিখণ্ড করে দেবে। হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে হিংসা ও অরাজকতার পর্দা বিছিয়ে দেবে, যা উৎপাটন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। প্রতিহিংসার আগুন বহু ভয়াবহ, যা তখন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে

www.pathagar.com

না। সবকিছু জ্বালিয়ে কয়লা করে দেবে। কোনো কিছুই তখন আর অবশিষ্ট থাকবে না। ভাই ভাইয়ের গর্দানের ওপর ছুরি চালাবে। নিরাপত্তা ও শান্তির চাবি দূর কোথাও কোনো অদৃশ্য ভুবনে হারিয়ে যাবে।'

নাদের খান বড়ই অলস্য কণ্ঠে বললেন– 'তোমরা কি মহাত্মা অথবা অন্য কারও খুনের ক্ষুধায় ক্ষিপ্ত হয়ে কোনো একদিন আমার গর্দানে ছুরি চালাতে প্রস্তুত হয়ে যাবে?'

'সরদার! আপনাকে আপনার খোদা ও রাসুলের দোহাই দিয়ে বলছি– এ কথাটি দ্বিতীয়বার আর বলবেন না! আমরা মরে যাবো। আমাদের প্রাণ বের হয়ে যেতে প্রস্তুত। আপনার শাণিত কথাবার্তা আমাদের আত্মাকে ঘায়েল করে রেখেছে।'

জগৎজির বলা কথাগুলো মানুষকে কাঁদিয়ে দিলো। সমস্বরে সকলে কান্না শুরু করে দিলো। নাদের খান বললেন– 'আমরা আমাদের বাকি জীবনের সময়গুলো তাসবিহর দানার মতো একটা একটা করে গুনে চলেছি। আমি দুনিয়ার রীতিনীতি পছন্দ করি না। যদি রামের স্বপ্নের প্রাসাদ টুকরা টুকরা হয়ে যায়, সে কিছুই করতে পারবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস– হিন্দু জনসাধারণ আমাদের শত্রুপক্ষকে পারস্পরিক সহযোগিতা করবে না। আমরা আজ পর্যন্ত কারও সীমালঙ্ঘন করিনি। তাহলে কেন আমরা অনুশোচনার কষ্টে বিভক্ত হবো? যদিও কয়েকজন পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাদের থামিয়ে দিয়ে নিজ নিজ গন্তব্যে পাঠিয়ে দেবো। এই পৃথিবীজোড়া মানুষের কর্মকাণ্ড একই সমান হয় না।

'দেখা যায়, চার ভাইবোনেই নিজেদের পরিবার আছে। ছেলেপুলে নিয়ে যে যার মতো করে দিন কাটাচ্ছে। তার পরও দেখাশোনা, যাতায়াতের মতো সম্পর্কের জায়গাটি তো আছে। সেখানে সূত্রটি নাটাইয়ের সুতোর মতো নিয়মমাফিক ছাড় হয়। আবার গুটিয়েও আসে। ঘুড়ির সুতো কাটাকাটি হয় না। এইটুকু সম্পর্কের বাঁধনকে ঠিক রাখে। শিথিল হয়ে যাওয়া জায়গা আবার ফিরে আসে। এতে সবাই মোটামুটি সন্তুষ্ট থাকে। মনে করে সবাই ভালো আছে। তার পরও একই পরিবারে একই ধরনের সময়-প্রবাহে বড় হলেও প্রত্যেকের ভাবনার সূত্র এক নয়। এক হবে না এটা ধরে নেয়ার সঙ্গত কারণ, ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির চৈতন্যে নিবিষ্ট থাকে। যার দ্বারা মানুষ এক থেকে অপর হয়। অপর থেকে আলাদা। ওরা প্রত্যেকেই বোঝে শৈশব-

www.pathagar.com

কৈশোরের দিনগুলোতে যে মাধুর্য এবং মমতা ছিলো, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সম্পর্কে নানা ধরনের জটিলতা ঢুকে গেছে। প্রত্যেকে ব্যক্তিস্বার্থে স্বাতন্ত্র্যের জায়গা তৈরি করেছে। যে যার মতো করে পথ চিনে নিয়েছে। জীবন পরিবর্তনশীল। আমরা আমাদের জীবনকে পরিচ্ছন্ন করবো। আমাদের জীবনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হতে দেবো না।'

নাদের খান দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করতে গিয়ে বললেন– 'আমরা মাওলানা নুর মুহাম্মাদের সাক্ষাতে যাবো। চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। আমরা সময়ের সামনে আমাদের অক্ষমতা অপারগতাকে প্রকাশ করবো না। যেকোনো ধরনের আগ্রাসনের প্রতিরোধ আমরা যেকোনো স্থান থেকে করবো। সব সময় রণসাজে সজ্জিত থাকবো।'

নাদের খান ঘোড়ার ওপর চড়ে বসলেন। ঘোড়া দৃষ্টিনন্দন একটি চক্কর দিয়ে সামনের পা দুটো উঁচিয়ে দৌড়াতে লাগলো বসতির দিকে। নাদের খানের পাগড়ির পেছনের অংশ উড়তে লাগলো স্বাধীনচেতা বীরের নিশানের মতো। শেখর, মোহন, ইসমাইল, হাশিম ও চন্দনের ঘোড়াও দৌড়াতে লাগলো তার পিছু পিছু।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মাওলানার চিকিৎসা চলছিলো। তার আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে পট্টি বেঁধে দেয়া হয়েছে। রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়েছে। নাদের খান বড়ই বেদনাকাতর হয়ে তার কপালে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন– 'আপনার অবস্থা কেমন?'

মাওলানা সাহেব নাদের খানের সম্মানার্থে শোয়া থেকে উঠে বসতে চাইলেন। নাদের খান তার কাঁধে দু'হাত মালিশ করে বললেন– 'আপনার উঠে বসার প্রয়োজন নেই, শুয়েই থাকুন। আপনাকে খুব দুর্বল দেখাচ্ছে। অনুমান করা যাচ্ছে– আপনার শরীর থেকে বহু রক্তক্ষরণ হয়েছে।'

মাওলানা দু'চোখ বন্ধ করে নিলেন। তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগলো।

হেকিম হুসাইনি বেগ বললেন– 'তিনি আঘাতের ব্যথায় কাঁদছেন না। আমি ভালো করে দেখাশোনা করেছি এবং ক্ষতস্থানে মলম ও পট্টি বেঁধে দিয়েছি। আমার মনে হয়, মাওলানা সাহেব মানসিক বা অন্য কোনো কিছু স্মরণ করেই মন খারাপ করে আছেন।'

নাদের খান তার সামনে বসে জিজ্ঞেস করলেন– 'মাওলানা সাহেব! কিসের দুশ্চিন্তা করছেন?'

www.pathagar.com

মাওলানা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– 'আমি পেরেশান নই। আমি তো শাহাদতের আশা করেছিলাম। আমাকে মনে হয় বঞ্চিত করা হয়েছে।'

নাদের খান উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন– 'আমি বুঝছি না, কে আপনাকে বঞ্চিত করেছে? আপনি নিজেকে হতভাগা ভাবছেন কেন?'

মাওলানা ঝরে পড়া অশ্রুজল মুছতে মুছতে বললেন– 'আমাকে আমার প্রভু তাঁর দরবার থেকে বের করে দিয়েছেন। আমি তো সব সময় শহিদি মৃত্যু কামনা করতাম। আমার দোয়ার শুরু-শেষে শাহাদাতের জন্য আকুল আবেদন ছিলো। অতঃপর সময়ের করুণায় শহিদি মৃত্যুর খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। যে সময় জগন্নাথ মন্দিরের গোপন কক্ষে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম, আমি অনেক পুলক অনুভব করছিলাম। আমার অনুভূতিতে জান্নাতুল ফেরদাউসের সুগন্ধি ভরে যেতে লাগলো। শাহাদাতের মঞ্জিল স্বল্প সময় ও অল্প নিশ্বাসের ব্যবধান ছিলো মাত্র। কিন্তু কেন জানি সৃষ্টিকর্তা আমাকে তাঁর ইচ্ছে পাল্টিয়ে মৃত্যুর খুব কাছাকাটি থাকা সত্ত্বেও শহিদি মৃত্যুর আশা থেকে নৈরাশ করে বাইরে নিক্ষেপ করলেন! এখন আমি সারা জীবন ওই মূল্যবান শহিদি মৃত্যুর কথা স্মরণ করে করে ক্রন্দন করতে থাকবো।'

নাদের খান বসা থেকে উঠে বললেন– 'মাওলানা সাহেব! আমি দীনের আলেম নই, কিন্তু আমি এতোটুকু জানি যে, শাহাদাতের আশা-প্রত্যাশায় বেঁচে থাকা এবং প্রতিটি নিশ্বাসে শাহাদাতের লক্ষ্যে এগিয়ে চলায় শাহাদাতের স্বাদ অনুভূত হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোনো বড় মহৎ উদ্দেশ্যে আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আপনার জন্য কল্যাণকর হবে অজ্ঞতার বিপরীতে জ্ঞান দিয়ে জিহাদ করা।'

নাদের খান হেকিমখানা থেকে বেরিয়ে যান। তার চেহারায় প্রশান্তির প্রলেপ। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলতে লাগলো। নাদের খান নবযৌবনে পদার্পণকারী এক ছেলেকে কাছে ডেকে বললেন– 'বেটা চন্দন! আমি তোমাকে জগন্নাথের বসতিতে পাঠাতে চাচ্ছি।'

চন্দন তার সামনে গিয়ে চরণ স্পর্শ করে বললো– 'আমি যেকোনো সময় ওখানে যেতে তৈরি আছি।'

নাদের খান তার কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'নিশ্চয় তুমি এতোক্ষণে জেনে গেছো আমি কী উদ্দেশ্যে তোমাকে সেখানে পাঠাতে চাচ্ছি! চন্দন, তুমি জন্মগতভাবে কঠিন, দুরূহ, দুর্বোধ্যতাকে পছন্দ করো। এছাড়া এসবের সাথে তুমি প্রতিনিয়ত খেলা করা একজন সাহসী বীর। তোমার এই যাত্রা তোমার

www.pathagar.com

অভ্যাসের একদম বিপরীত। আমি তোমাকে কোনো মহোদ্যম কাজের জন্য সেখানে পাঠাচ্ছি না; বরং তোমার স্মরণশক্তি, তোমার ধৈর্যশীলতা এবং তোমার বিচক্ষণতার পরীক্ষা করা আমার উদ্দেশ্য। আমার প্রত্যাশা– তুমি এই দুর্বোধ্য পরীক্ষায় সফল হবে। আমি তোমাকে এই দুরূহ লক্ষ্যস্থানে প্রেরণ করছি– যেখানে পদে পদে তোমাকে তোমার তরবারিটি বহু কষ্টে নিজ আয়ত্তে রাখতে হবে এবং ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিতে হবে।'

চন্দন মাথা নত করে বললো– 'আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী আমি কাজ করবো।'

নাদের খান বললেন– 'তোমার জীবন আমাদের কাছে খুব প্রিয়। উগ্রতার আশ্রয় নিয়ে বোকামি কোরো না। নীরব থেকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে। কারো সাথে জড়ানোর প্রয়োজন নেই। জগন্নাথের মন্দির, মহাত্মা এবং বসতিবাসীর কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে খুব দ্রুত ফিরে আসবে। আমরা তোমার আনীত তথ্যপুঞ্জিকে সামনে রেখেই ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ঠিক করবো। মৌয়াল রঘুনাথের সাথে সাক্ষাৎ করবে।

'যদি তোমার ধারণা হয়, মহাত্মা কাশিরাম বসতির লোকদের পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে, তাহলে কাউকেই কিছু বলবে না। তুমি ভালো একজন সৈনিক। আমার প্রত্যাশা– তুমি সফল হয়েই ফিরবে। হতে পারে মন্দিরের পূজারিরা আমাদের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াচ্ছে। ভালোবাসা আর বিশ্বাসগত একতার কারণে এসব তোমার সহ্য হবে না। কিন্তু তোমাকে এসব তিক্ততার কষ্ট অবশ্যই সহ্য করতে হবে।'

চন্দন বেশ চিন্তামিশ্রিত দৃষ্টিতে নাদের খানের দিকে তাকিয়ে বললো– 'আমাকে যথেষ্ট কঠিন পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি আমার সরদারকে দেবতা মনে করি। কীভাবে আমার দেবতার দোষ চর্চাকারীদের কুৎসা সহ্য করবো?'

নাদের খান তার ঘোড়ার দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন– 'এখন তোমার যাবার সময় হয়েছে। সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত অনেক মূল্যবান। তোমাকে বিকেলেই পৌঁছে যেতে হবে। আমরা তোমার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় থাকবো। অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে আসার চেষ্টা করবে।'

কিছু সময়ের মধ্যেই চন্দনের দ্রুতগামী ঘোড়া জগন্নাথ দেবতার বসতির দিকে দৌড়াতে লাগলো। বৃক্ষরাজির ছায়া প্রলম্বিত হচ্ছিলো পুব দিকে।

www.pathagar.com

নতুন চক্রান্ত

জগন্নাথ দেবতার মন্দির অনেক বড়। মথুরা, কাশি ও বেনারসের প্রসিদ্ধ মন্দিরের মতো এটাকেও গণ্য করা হয় মহামান্য মন্দিরের তালিকায়। মন্দিরের বাইরের প্রাচীর দুর্গের সীমানাপ্রাচীরের মতো দৃঢ় ও উঁচু। প্রাচীরের কোণে বড় বড় মিনার। সোনায় বাঁধানো মন্দিরের শীর্ষভাগ। তার ওপর একটা সবুজ রঙের নিশান টানানো– যেটা দেখা যেতো বহু দূর থেকে। গম্বুজের নিচে কাশির একটা টেকসই সিন্দুকের ভেতরে বিশাল আকারের ঘণ্টা। ওই ঘণ্টাটি বাজানো হয় বিশেষ বা ভয়ানক ক্ষয়ক্ষতির সময়। তার আওয়াজ শোনা যায় বহু দূর পর্যন্ত। মন্দিরে প্রতিনিয়ত আগত হিন্দু, ত্রিপুরা পূজারি, ভক্ত ও সাধুদের সমাগম; যারা তাদের ধর্মীয় ও গোত্রীয় গীতা জপতে থাকে।

মন্দিরের ভেতরে প্রতিমা সংরক্ষণের জন্য একটা বিশাল বিস্তৃত ঘর আছে। ওই ঘরের মধ্যে রুপার সুদৃশ্য একটা চৌকির ওপর জগন্নাথ দেবতার বিশাল আকারের প্রতিমা। এই কক্ষটা মার্বেল পাথর দ্বারা তৈরি করা। দেয়ালের সাথে দেব-দেবীর ছোট ছোট মূর্তি। প্রতিমা কক্ষের নিকটে ছোট ছোট কামরা। এখানে মহাদেব ও ভক্তরা থাকে। দেবদাসদের বসবাসের কক্ষ আলাদা। মন্দিরের পূর্ব প্রান্তে রয়েছে আশ্রমের মনোরম প্রাসাদ। এখানে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয়। মন্দিরের পেছনে রয়েছে স্নানাগার। স্নানাগারে চামেলি, গন্ধরাজসহ বিভিন্ন প্রকারের ফুলের কেয়ারি সাজানো। মন্দিরের ভেতরে ও বাইরে টাঙানো আছে ছোট ছোট কাঁসর ঘণ্টা। রাতে যখন ঘণ্টাগুলো বাজানো হয়, তখন ঝনঝন শব্দে সৃষ্টি হয় জাদুময়ী এক পরিবেশ। মন্দিরের ভেতরে সব সময় প্রবহমান থাকে সুগন্ধি ধোঁয়া।

www.pathagar.com

এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাতের নিস্তব্ধতায় বিস্ময়কর নির্জন পরিবেশ। আকাশের শূন্যতাকে তারকারাজি আলোকিত করে রেখেছে। জগন্নাথের বসতির ঘরে ঘরে জ্বালানো হচ্ছে সন্ধ্যাবাতি। অলিগলি ও বাজারগুলোতে স্বল্প দূরত্বের ব্যবধানে জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে বড় বড় অগ্নিমশাল।

চন্দনের ঘোড়া দুর্বল হয়ে খুব বেশি হাঁপাতে লাগলো। সে বসতিতে পৌঁছে ঘোড়ার রশি ঢিল করে ছেড়ে দিলো। ঘোড়া আস্তে আস্তে নিজের সওয়ারির ইচ্ছেমতো এক গলিতে ঢুকে গেলো। রঘুনাথের ঘরের দরজার সামনে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামলো চন্দন। ঘোড়ার লাগাম ধরে অভ্যর্থনাকক্ষে প্রবেশ করলো সে। অভ্যর্থনাকক্ষের একজন সেবক তার হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম নিয়ে বললো– 'নমস্কার! মনে হচ্ছে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন। আপনার ঘোড়া অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে।'

চন্দন মুচকি হাসি দিয়ে বললো– 'মৌয়ালজির সাক্ষাতে এসেছি। তিনি কি ঘরে আছেন?'

সেবক কক্ষের দিকে ইঙ্গিত করে বললো– 'ওখানে আরাম করে বসুন। আমি উনাকে আপনার ব্যাপারে অবগত করছি।'

চন্দনের জামাকাপড় ধুলোয় ভরে গেছে। সে সবুজ রেশমি কাপড়ের কোমরবন্ধনি পরে ছিলো। কোমরবন্ধনির মধ্যখানে তরবারি ঝোলানো। কক্ষের ছাদের সাথে ঝোলানো হারিকেন জ্বলছে। বিছানায় কম্বল বিছানো আছে। চন্দন পা ছাড়িয়ে বসে পড়লো। কিছুক্ষণ পর কক্ষের দরজায় শব্দ হলো এবং একজন মধ্যবয়স্ক দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক কক্ষে প্রবেশ করলেন। ইনিই মৌয়াল রঘুনাথ।

রঘুনাথের মাথায় পাগড়ি বাঁধা। চন্দন উঠে দাঁড়ালো। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে হাত জোড় করে বললো– 'নমস্কার চাচাজি! আমি চন্দন।'

রঘুনাথ তার সাথে আলিঙ্গন করলেন। বড়ই আদরের সাথে চন্দনের কপালে চুমু খেয়ে বললেন– 'আমি অনেক খুশি হয়েছি।' চন্দন ঝুঁকে উনার পা স্পর্শ করে বললো– 'অনেক দিন ধরে আপনার দর্শন পাবার জন্য মন চাচ্ছে।'

রঘুনাথ হাত ইশারা করে বললেন– 'বসো! তোমাকে অনেক ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তোমার পোশাকও ধুলো-বালিযুক্ত হয়ে আছে। জামা পাল্টে ফেলো। একসাথে আহার করবো।'

www.pathagar.com

'সরদার নাদের খানের কী অবস্থা? আশা করি তিনি ভালোই আছেন।'

চন্দন দ্বিতীয়বার হাত জোড় করে বললো– 'চাচাজি! আমি গত পরশু বসতি থেকে বেরিয়েছি। তখন তো সরদার ভালোই ছিলেন। আমার আশা– ভগবানের কৃপায় তিনি এখনো ভালো অবস্থায় আছেন।'

রঘুনাথ বললেন– 'কেন? কী হয়েছে? তুমি গত পরশু বসতি থেকে বেরিয়েছো, আর আজকে এখানে পৌঁছেছো?'

চন্দন বাহানা করে বললো– 'আমি আমার নানার বাড়ি নাগপুরে গিয়েছিলাম।'

রঘুনাথ বললেন– 'ঠিক আছে।' তারপর তিনি একজন সেবককে ডাকলেন। সেবক কক্ষে প্রবেশ করলে তিনি বললেন– 'এ হচ্ছে আমার ভাতিজা। কোনো সাধারণ মেহমান নয়। তার স্নানের ব্যবস্থা করো। দেখো! তার সেবায় যেন কোনো ধরনের কমতি না হয়।'

চন্দন সেবককে নিষেধ করে বললো– 'স্নানের প্রয়োজন নেই।' তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে সামান্য গন্ধ পেয়ে বললো– 'এই দুর্গন্ধ কোত্থেকে আসছে, চাচা! মনে হয় শ্মশানে কোনো শবদেহ পোড়ানো হচ্ছে। বসতির কোনো চিতাখোলায় কি কোনো মানুষ পোড়া হচ্ছে?'

রঘুনাথ বললেন– 'বসতির কোনো চিতাখোলায় তো কোনো মানুষকে পোড়া হচ্ছে না। আমি অনেক আগে থেকেই এ দুর্গন্ধটা পাচ্ছি। কিন্তু আমি সেদিকে লক্ষ করিনি।'

এমন সময় মন্দিরের দিক থেকে বড় ঘড়ির ঘণ্টার গর্জন বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং সাথে বীণাবাদ্যও বাজতে শুরু করলো। মৌয়ালজি হতবাক হয়ে বললেন– 'এসব কী হচ্ছে? মনে হচ্ছে কোনো অঘটন ঘটেছে।'

মুহূর্তেই চারদিকে এক ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলো। চন্দনের হৃৎপিণ্ড জোরে জোরে লাফাতে থাকে। সে ভীতসন্ত্রস্ত স্বরে বললো– 'চাচাজি! আপনার ধারণা অনুসারে কী মনে হয়? বলুন তো কী হতে যাচ্ছে?'

রঘুনাথ বললেন– 'বড় কোনো সমস্যা তো অবশ্যই হবে। তুমি চিন্তা কোরো না। এখনই খবর পেয়ে যাবো। মন্দির থেকে কোনো পূজারি অবশ্যই আসবে!'

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পরেই একজন সেবক এসে বললো– 'মহাদেব হরিচন্দ এসেছেন। আপনার দর্শন পেতে চাচ্ছেন।' রঘুনাথ তাড়াতাড়ি বললেন– 'তাকে বাইরে কেন আটকে রেখেছো? ভেতরে নিয়ে এসো।'

গাছের লাঠি সাথে নিয়ে ভয়াল শারীরিক গড়নের একজন মহাদেব কক্ষে প্রবেশ করলেন। তিনি রঘুনাথের সামনে হাত জোড় করে বললেন– 'নমস্কার! মৌয়ালজি! আপনাকে এখনই মন্দিরে যেতে বলা হয়েছে।'

রঘুনাথ বললেন– 'মন্দিরে তো আমি যাবো। কিন্তু আগে বলো, কী হয়েছে?'

মহাদেব বললেন– 'বড় একটা ঘটনা ঘটেছে। পুরো হিন্দু জাতি আজ আক্রান্ত। অত্যাচারীরা নির্যাতনের পর্বত ঢেলে দিয়েছে। আমরা সবাই ধোঁকা ও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি।'

চন্দন ব্যাকুলতা প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলো– 'শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে?' আপনারা কোন অত্যাচারীর কথা বলছেন?'

মহাদেব বেশ রাগান্বিত দৃষ্টিতে চন্দনের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তুমি কে?'

চন্দন বলার আগেই রঘুনাথ তার প্রশংসা করতে করতে বললেন– 'এ হচ্ছে স্বামী মনোহর লালের ছেলে চন্দন। এখনই সে এখানে পৌঁছেছে।'

মহাদেব হরি অগ্নিচোখে তার দিকে তাকান। তিনি সাপের মতো ফোঁসফোঁসাতে লাগলেন। তিনি বললেন– 'তুমি তো নাদের খানের বসতিতে থাকো। তুমি এখানে কেন এসেছো? মনে হচ্ছে তোমাকে তোমার মৃত্যু এখানে ডেকে এনেছে।'

চন্দন অবাক হয়ে রঘুনাথের দিকে তাকালো। তারপর মহাদবকে লক্ষ করে বললো– 'মহাদেবজি! আমি এসব একদম সহ্য করতে পারি না। আমি উঁচু জাতের হিন্দু। আমার সম্পর্ক ব্রাহ্মণ পরিবারের সাথে। আমি কোনো নীচু জাতের লোক নই।'

রঘুনাথ হরিচন্দকে বললেন– 'চন্দন আমাদের মেহমান। তুমি আমার সাথে কথা বলো। আমি তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। সে কী অপরাধ করেছে? তার দোষ-ত্রুটিই বা কী?'

মহাদেব ক্রোধে ফেটে পড়া কণ্ঠে বললেন– 'এ হচ্ছে মুসলমানদের গুপ্তচর। সে আমাদের সর্বনাশার দৃষ্টান্ত দেখতে এসেছে। এ হিন্দু জাতির

www.pathagar.com

বিশ্বাসঘাতক। নাদের খানের জ্বালানো আগুন সে একটু একটু করে জ্বালিয়ে রেখেছে। এ অপদার্থ এটাই দেখতে এসেছে।'

রঘুনাথ বললেন– 'মনে হয় আপনি কোনো ভয়ানক ভুল ধারণার শিকার হয়েছেন। ধীরে সুস্থে কথা বলুন। আর বারবার সরদার নাদের খানকে অপবাদ করা থেকে বিরত থাকুন। তিনি সবার অন্নদাতা।'

মহাদেব রাগান্বিত হয়ে বললেন– 'আমি তার সামনে কোনো কথাই বলবো না। আপনি মন্দিরে চলুন। সেখানে মহাত্মাই আপনাকে সব বলে দেবেন।'

'এ স্বামী মনোহর লালের ছেলে। তুমি তার ওপর ভরসা করতে পারো।'

মহাদেব এবার শান্তস্বরে বললেন– 'ঠিক বলেছেন, মৌয়ালজি! ইনি বড় পিতার ছেলে। মনোহর লালকে আমিও মান্য করি। কিন্তু এখন সেই বিশ্বাসের সময়টা আর নেই।'

মহাদেব সিদ্ধান্তের ভাব ধরে এ উক্তিটা করে বসলে রঘুনাথ বললেন– 'যতোক্ষণ আসল ঘটনা সম্পর্কে আমি অবগত হবো না, ততোক্ষণ আমি মন্দিরে যাবো না।'

হরিচন্দ বাধ্য হয়ে বললেন– 'তাহলে তাকে বাইরে পাঠিয়ে দিন।'

চন্দন দাঁড়িয়ে বললো– 'রঘুনাথজি! এটা আমার অপমান নয়; বরং আপনাদের ব্যর্থতা। আমি এখানে আর থাকবো না। আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি নাগপুর থেকে আপনার দর্শন পেতে এসেছিলাম। যদি আমি জানতাম আমার সাথে এ অশুভ আচরণ করা হবে, তাহলে কখনো আমি এখানে আসতাম না।'

মহাদেব কথার ভঙ্গিমা পাল্টিয়ে বললেন– 'তুমি নাগপুর থেকে এখানে এসেছো?'

চন্দন বললো– 'হ্যাঁ! আমি নাগপুর গিয়েছিলাম। ওখান থেকে সোজা এখানে এসেছি।'

'কী যা-তা বলছো? নাদের খানের বসতি আর নাগপুরের মাঝে পার্থক্য তো বিস্তর! তুমি আসলে কী বলতে চাচ্ছো?'

মহাদেব জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি তোমার বসতি থেকে কখন বেরিয়েছো?'

চন্দন উত্তর দিলো– 'আমি গত পরশু ঘর থেকে বেরিয়েছি।

www.pathagar.com

মহাদেব বললেন– 'তুমি কি সত্য বলছো?'

চন্দন রাগান্বিত ভাব নিয়ে বললো– 'সত্য বলার অভ্যাসটা আমার বেশ পুরনো।'

মহাদেব তার হাতে চন্দনের হাত নিয়ে বললেন– 'ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করো। ক্রোধান্বিত হয়ে অনেক তিক্ত কথা বলে ফেলেছি।'

রঘুনাথ বললেন– 'এখন তাহলে বলুন, আসলে ঘটনা কী ঘটেছে?'

মহাদেব হরিচন্দ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন– 'আজ সকালে হিন্দু জাতির গর্দানের ওপর ছুরি চালানো হয়েছে। চারদিক রক্তাক্ত করা হয়েছে। পরিস্থিতি শ্মশানভূমির আকার ধারণ করেছে। আমাদের হৃদয়ের গভীরে কোনো বিষাক্ত কাঁটা বিদ্ধ করা হয়েছে। দেবতা মন্দিরের পবিত্রতাকে বিনষ্ট করা হয়েছে।'

তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। চন্দন তরবারির কবজায় হাত রেখে বললো– 'মহাত্মাজি! আমরা এখনো বেঁচে আছি! আমাদের বাহুতে শক্তির চমক এখনো দৌড়াদৌড়ি করে। এ তরবারি আমি হিন্দু জাতির রক্ষা ও শান্তির জন্যই বহন করে বেড়াই। আমরা ভগবানের পবিত্রতা বিনষ্টকারীদের এ পৃথিবীতে কখনো জীবিত ছাড়বো না।'

মহাদেব মায়াভরা দৃষ্টিতে চন্দনের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'এ সময়ে হিন্দু জাতির জন্য তোমার মতো বীর বাহাদুরদের বড়ই প্রয়োজন।'

অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মহাদেব আবার বলতে শুরু করলেন– 'আজ সকালে নাদের খানের কিছু সৈন্য জগন্নাথ দেবতার কোমল কুমারী ও নতুন দেবী বিমলাকে মন্দির থেকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে।'

চন্দন খুব জোরে অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'প্রথমে আমার সন্দেহ ছিলো, এখন আমি পুরো নিশ্চিত– তুমি একটা পাগল।'

মহাদেব দ্বিতীয়বার ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন– 'তুমি বেয়াদবি করছো।'

চন্দন হাত জোড় করে বললো– 'মহাদেবজি ক্ষমা করুন। বলুন, বিমলা দেবী ওখানে কোথায় ছিলো? সে তো তার পৈতৃক বাড়ি ভদ্রেকে অবস্থান করছে এবং হতে পারে আপনার জানা নেই যে, সে তার পিতাসহ মুসলমান হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

রঘুনাথ ব্যাকুলসুরে চন্দনের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'এ তুমি কী বলছো? আশ্চর্য কথা বলছো! এসব কি সত্য?'

চন্দন বললো– 'মৌয়ালজি চাচা! আমি সত্যিটাই বলছি। তারা আমাদের সবার সামনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।'

অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর সে বললো– 'মনে হয় মহাত্মা বড় কোনো ভুল করে বসেছেন, যার শাস্তি পুরো হিন্দু জাতির পেতে হবে।'

কালবিলম্ব না করে হরিচন্দ বললেন– 'তুমি একজন অজ্ঞ! তুমি বেদ ও শাস্ত্রের কোনো জ্ঞানই রাখো না। শুনো! কোনো দেবী অথবা কোনো অবতার অধর্মী হতে পারেন না। বিমলা দেবী কখনোই মুসলমান হতে পারেন না। তাকে জাদুটোনা করে বশ করে রাখা হয়েছে। মন্দিরের গোপন কক্ষে তার ওপর করা জাদুটোনা কেটে ফেলা হয়েছে। কীভাবে জানি মুসলমানরা সে ব্যাপারটা জেনে গিয়েছিলো। তারা মন্দিরের গোপন কক্ষে আত্মগোপন করে দেবীকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং সেখানে অবস্থানরত চারজন পুরোহিতকে হত্যা করে।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে হরিচন্দ জিজ্ঞেস করলেন– 'আমাদের এমন কী ভুল হয়েছে, যার শাস্তি পুরো হিন্দু জাতিকে পেতে হবে?'

চন্দন কিছু ভেবে বললো– 'আমার ধারণা, মহাত্মাই বিমলাকে ভদ্রেক থেকে অপহরণ করে মন্দিরে আটকে রেখেছেন। আপনারা কি জানেন, মুসলমানরা হিংসা ও নৈরাজ্যে কতোটা নির্দয়, পাষাণ? জ্ঞানস্বল্পতার কারণে মহাত্মা বাঘের খাঁচায় পা দিয়েছেন। মুসলমানরা তার এ অপরাধকে কখনোই ক্ষমা করবে না।'

মহাদেব আবারও ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন– 'তুমি ভিতু ইঁদুরের ন্যায় পিছু হটছো। আমরা নই; বরং মুসলমানরাই বাঘের খাঁচায় পা দিয়ে মৃত্যু ডেকে এনেছে।'

চন্দন বললো– 'আপনি ঠিকই বলেছেন। মনে হচ্ছে মুসলমানদের ধ্বংস ও নির্মূলের দিন শুরু হয়ে গেছে।'

রঘুনাথ চন্দনের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন– 'তুমি কি পারবে তোমার সরদার নাদের খানের বিরুদ্ধে তরবারি ওঠাতে?'

www.pathagar.com

চন্দন অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'আমি লড়াই করে মরার সব কৌশল নাদের খান থেকে শিখেছি। আমি তার বাতলে দেয়া এবং তার শেখানো সব পদ্ধতিতে তার বিরুদ্ধেই লড়ে যাবো।'

মহাদেব হরিচন্দ জোরে জোরে অট্টহাসি দিতে লাগলেন– 'তোমাকে হিতাকাঙ্ক্ষী মনে হচ্ছে। মহাত্মার সাথে তোমার সাক্ষাৎ করা এবং ধর্মসভায় তোমার উপস্থিত হওয়া অনেক জরুরি। মহাত্মাজি তোমার কথাবার্তা শুনলে অনেক খুশি হবেন। এখনই যাওয়া উচিত। আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

চন্দন তার স্বর গম্ভীর করে বললো– 'আমার পিতাজি সেদিন থেকেই একা একা নির্জনে বসবাস করতে লাগলো, যেদিন বিমলা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমরা লড়তে জানি। আমরা দেবীকে মুসলমানদের হাতে বেশি দিন রাখতে দেবো না। আমরা কাউকেই ক্ষমা করবো না। বর্তমানে হাকিমের সেনাবাহিনীতে লক্ষাধিক হিন্দু সেনা আছে। আমরা তাদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করবো।'

মহাদেব হরিচন্দ চন্দনের মাথায় চুমু খেয়ে বললেন– 'হিন্দু সম্প্রদায়ের সব প্রজন্মই তোমাদের শক্তি ও সাহসিকতাকে স্মরণ রাখবে। ভগবান তোমাদের জীবনকে অমর করে দিক। মহাত্মাজি নাখোশ হবেন। এখন যাওয়া চাই।'

বাইরের নীরবতা ক্রোধ ও ক্ষোভে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। লোকদের দৌড়াদৌড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মন্দিরের বড় ঘণ্টাটি জোরে জোরে বেজে চলেছে। সানাই বাজানো হচ্ছে। চারদিকে মুহুর্মুহু শব্দে এক ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। চন্দন ও রঘুনাথ মহাদেবের পিছু পিছু মন্দিরে প্রবেশ করেছেন। মন্দিরের ভেতরে মারাত্মক পরিস্থিতি। অসংখ্য লোকের সমাগম। তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বিভিন্ন শ্লোগান দিতে লাগলো। অসংখ্য অগ্নিমশালে আগুন জ্বলছে। মন্দিরের বড় দরজার সামনে শুইয়ে রাখা হয়েছে পুরোহিতদের লাশ। মন্দিরের পূজারি, মহাদেব ও ভক্তরা মাথা মেরে মেরে ক্রন্দন করতে থাকে। অসংখ্য নওজোয়ান তরবারি ও বর্শা হাতে নিয়ে উঁচু করে নেড়ে নেড়ে শ্লোগান দিতে থাকে। 'প্রতিশোধ', 'প্রতিশোধ' আওয়াজে প্রকম্পিত করে তুলছে মন্দির।

www.pathagar.com

রঘুনাথ শবদেহের নিকট পৌঁছালে একজন নওজোয়ান বললো– 'মৌয়ালজি! আমাদের কেন বলা হচ্ছে না, এতো বড় নিষ্ঠুরতা আমাদের সাথে কে করেছে? আমরা তাদের কাউকেই ক্ষমা করবো না!'

রঘুনাথ হাত জোড় করে বললেন– 'ধৈর্য ধরো! ধৈর্য ধরো! চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমরা সবাই দেখছি, মর্মান্তিক অঘটন ঘটেছে। আমাদের মাঝে দ্বন্দ্ব বিস্তৃতি লাভ করেছে। আমরা মহাত্মার কাছে যাচ্ছি। সব বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে তোমাদেরও জানানো হবে। আমরা আমাদের বিদ্বান ও নির্দোষ পুরোহিতদের হত্যাকারীদের কাছ থেকে ভয়ানক প্রতিশোধ নেবো। আমরা সারা দুনিয়ার রাক্ষস ও হিংস্র প্রাণিদের জানিয়ে দিতে চাই, আমরা এখনো জীবিত এবং বেঁচে থাকার সব কৌশল আমাদের ভালো করেই জানা আছে।'

রঘুনাথের বক্তব্যে একটু নীরবতা দেখা দেয়। তখন চন্দন জলদি তরবারি কোমর থেকে বের করে চড়াকণ্ঠে বললো– 'আমাদের জোশ ও হুঁশের সাথে কাজ করা দরকার। ধারণা হচ্ছে, আমাদের দুশমন অনেক চালাক, বড় চক্রান্তবাজ ও রক্তপিপাসু। আমরা বড় কোনো ষড়যন্ত্রের শিকার। শান্তি ও স্বস্তির পায়রাগুলোকে তারা রক্তাক্ত করেছে। আমরা এক বিপজ্জনক রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে। আমাদের সামনে এক কঠিন মৃত্যুকূপ দেখা যাচ্ছে। এটা বড়ই নাজুক সময়। বিচক্ষণতার সাথে অগ্রসর হতে হবে এবং শত্রু-মিত্রের মাঝে পার্থক্য করতে হবে। আমাদের অল্প ভুলের কারণে শতাব্দীকাল ধরে শাস্তি পেতে হবে। আমাদের শত্রু আমাদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে গোপন হয়ে আছে। হিংস্রতার আগুন বারবার জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তাদের বের করে এনে সবার সম্মুখে উপস্থিত করা দরকার।'

মহাদেব হরিচন্দ চন্দনের বাহু ধরে বললেন– 'এটা ভাষণ দেবার সময় নয়। মহাত্মাজি নাখোশ হতে পারেন।' তিনি ফের মাথা নিচু করে হাত জোড় করে বললেন– 'একটু ধৈর্য ধরুন। মহাত্মাজি নিজেই এই অবস্থা সম্পর্কে সবিস্তারে বর্ণনা করবেন।'

তারা তিনজন একটা লম্বা রাস্তা পার হয়ে মুগ্ধ-করা প্রাসাদের একটি কক্ষে প্রবেশ করলো। মশাল জ্বালানো ছিলো কক্ষে। খুঁটির সাথে লাগানো রুপার সুদৃশ্য পাত্র ও সুগন্ধিতে কক্ষের অভ্যন্তরে অন্য রকম ভালো লাগা পরিবেশ। হালকা হালকা করে চক্কর দিতে লাগলো সুরমা রঙের ধোঁয়া। কক্ষের বিছানায় লাল রঙের একটি চাদর বিছানো। সুগন্ধির সয়লাবেও মানুষ পোড়ার

www.pathagar.com

অসহ্য দুর্গন্ধ অনুভূত হচ্ছে। মূর্তির চরণে জ্বলছে ছোট বাতি। কক্ষে দশ-বারো জন বরেণ্য ব্যক্তি উপস্থিত আছেন। রঘুনাথ কক্ষে প্রবেশ করলেন। লোকজন দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানালো। রঘুনাথ সবাইকে হাত জোড় করে প্রণাম করলেন। তারপর মা দুর্গা দেবীর চরণ ছুঁয়ে মূর্তির নিকটে মাথা নত করে বসে পড়েন। কক্ষ আবার গম্ভীর ও নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেলো। হরিচন্দ বললেন– 'আমি মহাত্মাকে অবগত করতে যাচ্ছি।'

কিছুক্ষণ পর কক্ষের প্রধান দরজা দিয়ে মহাত্মা কাশিরাম বিভিন্ন শব্দ জপতে জপতে কক্ষে প্রবেশ করলেন। তার গলায় কাঠের মোটা মোটা মালা ঝোলানো। মাথায় তিনটি লাল রঙের তিলক। লোকজন দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে তাকে প্রণাম করলো। মহাত্মার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে ক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ। তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে মা দুর্গার চরণ স্পর্শ করলেন। অতঃপর মূর্তির সামনে বসে, 'ওঁ ওঁ শ্রী মা কালী দুর্গা'– এরকম অনেক শব্দ জপতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে তার ভারী গর্জনে পুরো কক্ষ মুখরিত হয়ে উঠলো। তারপর তিনি সবার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগলেন– 'আমি ভগবানের জ্ঞান প্রকাশের অপেক্ষায় ছিলাম। এখনই আমি বহু গুরুত্বপূর্ণ সমাচার শোনাবো। ভগবান বাংলার ভূখণ্ডে রাম রাজ্যের শক্ত ভিত্তি রেখেছেন। আমার চোখে একটা স্বপ্ন দেখিয়েছেন।'

মহাত্মার ছোট ছোট চিকন চোখে একটা চমক দেখা গেলো। ওই সময় একজন পূজারি কক্ষে প্রবেশ করলো এবং হাত জোড় করে বললো– 'স্বামী ভবানী দাস আসছেন।'

মহাত্মা নাখোশ আর ঘৃণার ভাব প্রকাশ করে বললেন– 'আমি যখন খুব কড়াভাবে নিষেধ করেছি, তখন তাকে কেন ডাকা হলো?'

বৃদ্ধ স্বামী ভবানী দাস কক্ষে কদম রাখতেই বললেন– 'আমি ডাকা ব্যতীতই এসেছি। আমাকে ডেকে কেউ অপরাধ করেনি। কেন? আমার কি এ সভায় অংশগ্রহণ করার অধিকার নেই?'

লোকজন দাঁড়িয়ে গেলো। মহাত্মাও নিজের জায়গা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বানোয়াটি করে মৃদু হেসে বললেন– 'আপনার অনেক ভক্ত অনুরাগী আছে। আপনি একজন মহাপুরুষ ও বিদ্বান। আপনার তো সব অধিকারই আছে। আপনার কষ্ট হবে বলে, তাই বলছিলাম। আর এ সময়টা তো আপনার আসনে বসার সময়।'

www.pathagar.com

বুড়ো স্বামীর মাথার চুল রুপার মতো সাদা। তিনি তার হাতের লাঠি বিছানার ওপর রেখে বললেন– 'জ্ঞান, ধ্যান ও আসনে বসার সময়ের বিদ্যা আমি ভালো করেই জানি। ভক্তদের নিরাপত্তাবিষয়ক সভায় উপস্থিত হয়ে নিজের গুরুত্বপূর্ণ মতামত পেশ করাও অনেক পুণ্যের কাজ। আসল ভক্ত সে-ই হয়, যে নিজের ভুবনকে প্রত্যাশার রঙে সজ্জিত করতে চিন্তা করে। তোমরা নিজেদের কথা শুরু করো। বলো, কী বলতে চাও। লোকেরা আসল ঘটনা জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে।'

মহাত্মা কিছু সময়ের জন্য এদিক-ওদিক তাকালেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন– 'বসতির প্রধান ভগবানের পূজারিদের জন্য আজকের সকালটা খুবই ভয়ানক ছিলো। আজ সকালে আমাদের আকাশে তুলে পাতালের গভীরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। বসতির এ প্রান্ত হতে ও প্রান্ত হিন্দুদের রক্তে রঞ্জিত। আজকের সকালের ঘটনায় ওই আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখেছি, যে আগুন আমাদের প্রত্যাশা, আমাদের স্বপ্নকে, আমাদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত বহমান আকাঙ্ক্ষাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে।'

সবাইকে আবেগতাড়িত করে কিছুক্ষণের মধ্যে মন্দিরের গোপন কক্ষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া বস্তুগুলো তার সামনে এনে রাখা হলো। এরপর বিষাক্ত কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন– 'এখন মুসলমান ও আমাদের মধ্যখানে চার নির্দোষ মহাদেব হত্যার দায়ে একটা সুদৃঢ় পর্দা তৈরি হয়েছে। আমাদের রাস্তা তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে। সমস্ত আত্মীয়তা, সকল বন্ধন ভেঙে গেছে। আমরা দেবীদের অপহরণের ব্যথা ভুলতে পারি কিন্তু নির্দোষ মহাদেবদের হত্যা কখনো কোনো অবস্থাতে ক্ষমা করবো না। তারা সীমা লঙ্ঘন করেছে। হয়তো তোমরা জানো না, নিহত হওয়া চারজন মহাদেব আসামের অধিবাসী ছিলেন এবং তাদের সম্পর্ক যুদ্ধবাজ জঙ্গিগোষ্ঠী পাংখোর সাথে। এই ভয়ানক পরিস্থিতিতে মহারাজা জয়ধ্বজ সিং কোনোভাবেই মুসলমানদের ক্ষমা করবেন না। তিনি এর কঠিন প্রতিশোধ নেবেন।'

মহাত্মা কিছুক্ষণের জন্য চুপ হলে রঘুনাথ বলে ওঠেন– 'আমরা শুনেছি, বিমলা দেবী তার পিতাসহ মুসলমান হয়ে গেছে।'

মহাত্মা বড়ই রাগের স্বরে বললেন– 'তুমি মূর্খ লোক। তোমার কাছে গীতা শাস্ত্র ও পুরাণের বিদ্যা নেই। দেবীর ওপর জাদুটোনা করা হয়েছিলো।

www.pathagar.com

বেদের কথা অনুসারে কোনো দেবতা এবং কোনো দেবী বিধর্মী ও নাস্তিক হতে পারে না।'

রঘুনাথের কম্পন শুরু হয়ে গেলো। মহাত্মা শব্দগুচ্ছ বাড়িয়ে বললেন– 'তুমি ধনবান হবার মতো লোক। পরমাত্মা তোমার ব্যাপারে বহু ভালো সংবাদ শুনিয়েছে। কিন্তু তুমি তো নির্ধন হতে চাচ্ছো! মা দুর্গার চরণে ঝুঁকে যাও এবং ক্ষমা প্রার্থনা করো। নতুবা তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।'

রঘুনাথ দেবীর চরণে মাথা রেখে ক্রন্দন করতে লাগলেন। চন্দনকে রঘুনাথের কার্যকলাপ পেরেশান করে তোলে। তার ডান হাতের তরবারিটি কাঁপতে থাকে। তরবারি বের করে রঘুনাথকে মৃত্যুর ঘাট পার করে দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু হঠাৎ করে নাদের খানের নিষেধাজ্ঞা তার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মহাত্মা কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর রঘুনাথের মাথার ওপর হাত বুলিয়ে বললেন– 'মা দুর্গা তোমার চোখের জল গ্রহণ করেছেন। তুমি ধনবান হবে। দেব-দেবতার আশীর্বাদে তুমি রাজা হবে।'

একজন বৃদ্ধ লোক মুখ ভারী করে বললো– 'মহাত্মাজি! লোকসমাগম বেড়ে চলেছে। এ কঠিন পরিস্থিতির সমাধান কী? এখন আমরা সামনের দিকে এগোই।'

মহাত্মা বললেন– 'শুভরাজজি! চিন্তার কোনো কারণ নেই। এখন আমি জগন্নাথ দেবতার অবতারের রূপে ভাষণ দিচ্ছি। আমার মঙ্গলই ভগবানের মঙ্গল। আমার সিদ্ধান্তই ভগবানের সিদ্ধান্ত। আমরা কাল রাতেই আসামের দিকে যাত্রা করবো। মহারাজা জয়ধ্বজ সিংকে ঘটনা সম্পর্কে অবগত করবো। আমরা আশা করি, আসামের মহারাজা কালবিলম্ব না করে মুসলমানদের ওপর হামলা করবেন। আমরা এটাও জানি– মহারাজার ধাওয়া মৃত্যুর ধাওয়ার চেয়েও ভয়ংকর ক্ষতিসাধন করবে। আমরা তখন ওই জঙ্গলের হিংস্র প্রাণী ও কুকুরদের মুসলমানদের লাশ ভক্ষণ করতে দেখবো।'

স্বামী ভবানী দাস হাত উঁচু করে বললেন– 'কাশিরাম! নম্রস্বরে কথা বলো! তোমার ধমকের স্বর অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। এ সময়ে গাছের গহিন শাখার ভেতরে অনেক পাখি কিচিরমিচির করছে। যদি এ পাখিগুলো উড়ে যায়, তাহলে শান্তির কোমল ফুল ঝরে যাবে। এ বসতিটাকে অগ্নিকুণ্ড বানিয়ো না। তখন অনেক দুঃখ পাবে। লোকদের দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে তামাশা দেখো না। এতোটা দূরে যেও না, যেখান

www.pathagar.com

থেকে নিজের স্থানে ফিরে আসতে চাইলে রাস্তার দূরত্ব তোমাদের ধ্বংস করে দেবে। শেষ থেকে শুরু করো না।'

মহাত্মা রাগান্বিত স্বরে বললেন– 'ভবানী দাস! আমাদের সাথে যাওয়ার চেষ্টা করু। আর যদি তোমার দুর্ভাগ্যের কারণে অন্ধদের মধ্যে থেকে যেতে চান, তাহলে চুপ করুন।'

স্বামী মৃদু হাসি দিয়ে বললেন– 'তুমি সাপের মতো বিষাক্ত, শিয়ালের মতো চক্রান্তবাজ এবং হিংস্র প্রাণীর মতো রক্তপিপাসু। তোমার আত্মা কোনো ত্রুটিযুক্ত গন্ডারের মতো ভয়ানক হবে। তুমি মৃত্যুর ফাঁদ বিস্তৃত করে বড় অন্যায় করে যাচ্ছো! স্মরণ রেখো, পরমাত্মা সংসারকে রক্ষা করবে। আর তুমি তখন অবশ্যই আফসোস করবে এবং জ্বলন্ত কয়লার ওপর ছটফট করতে থাকবে।'

মহাত্মা আরো বললেন– 'আপনি একজন ভিতু কাপুরুষ। এখান থেকে সরে যান! নতুবা...'

স্বামী বড়ই নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বললেন– 'নতুবা কী করবে? আমাকে মৃত্যুর ঘাট পার করে দেবে। এটাই তো বলতে চাচ্ছো?'

মহাত্মা রাগে কাঁপতে লাগলেন। তিনি বললেন– 'হ্যাঁ! আমি আপনাকে মৃত্যুর ঘাট পার করিয়ে দেবো। আপনার জীবন হিন্দু জাতির মাথার ওপর কুলক্ষণ!'

ভবানী দাস বললেন– 'আমার রক্তে যদি তোমার রক্তপিপাসু আত্মা তৃপ্তি পায়, তাহলে তোমার আত্মাকে তৃপ্তি দাও। আমি মরার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। কিন্তু স্মরণ রেখো! আমার পরবর্তীতে তোমাকে রুখে দেবার জন্য নতুন প্রজন্ম তৈরি হবে। তুমি বলছো দেবীকে জাদুটোনা করে রেখেছো। বর্তমান সময়ে অনেক হিন্দু পরিবার মুসলমান হচ্ছে। তাদের সবার ওপরও জাদুটোনা করা হয়েছে? লজ্জা করা উচিত তোমার। অন্ধভক্তি ছাড়ো! ঘোর অন্ধকারে ডুব দেবার মতো বোকামি কেন করছো? যদি জাদুর মন্ত্রে এতোই শক্তি হয়, তাহলে কোনো একটা মুসলমানকে হিন্দু বানিয়ে দেখাও। আমরা সারা জীবন তোমার পূজা করবো।'

মহাত্মা পূজারিদের লক্ষ করে বললেন– 'এই বেকুব ইঁদুরটাকে মন্দিরের বাইরে নিক্ষেপ করো। হিন্দু জাতি আজকে এ ধরনের অজ্ঞ ভক্তদের ভাষণের

www.pathagar.com

কারণে পরাধীন হয়ে আছে। এই ধরনের লোকের ছড়ানো গুজবের কারণেই হিন্দুধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে চলে যাচ্ছে লোকজন।'

স্বামী দরজার দিকে অগ্রসর হতে হতে বললেন– 'আমি তো ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বিতরণ করি। আমার ভাষণ প্রভুর ভক্তির ভাষণ। যারা মুসলমান হচ্ছে তারা তোমাদের রাক্ষসী ও রক্তাক্ত কর্মকাণ্ডের কারণেই হচ্ছে। তোমরা যাদের ওপর অত্যাচার করেছো, তারা মুসলমানদের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। বিমলা দেবীর সাথে কী কী এই মন্দিরে হয়েছে, সেটা তোমরা ভালো করেই জানো। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি– তোমরা হিন্দু জাতিকে একটা অঘটনের দিকে নিয়ে যাচ্ছো। হিন্দু জাতিকে মৃত্যুর একটা অন্ধকার গহ্বরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার ব্যবস্থা করছো। তোমরা এইসব মূর্খ লোকের হিংসার আগুনের ইন্ধন হচ্ছো, যে তোমাদের সামনে মাথা নিচু করে বসে রয়েছে। ভগবানের ভঙ্গিমায় কথা বললেও ভগবানের ফুৎকার থেকে বাঁচতে পারবে না।'

মহাত্মা রাগান্বিত হয়ে বলেন– 'তাকে মন্দির থেকে বের করে দাও। যদি তাকে তার ঘরের বাইরে দেখা যায়, তাহলে তাকে মৃত্যুর ঘাট পার করে দেবে।'

পূজারিরা বৃদ্ধ স্বামীকে উঠিয়ে কক্ষ থেকে বের করে দিলো। মহাত্মা অনেকক্ষণ যাবৎ চোখ বন্ধ করে 'ওঁ শ্রী ওঁ কালী' এ-জাতীয় নাম ধরে ধরে জপতে লাগলেন। পরে তার আসন থেকে উঠলেন এবং দ্রুত হেঁটে মন্দিরের ওই স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন, যেখানে বসতির লোকেরা জমায়েত আছে। মন্দিরের ঘণ্টা ও সানাই তখনো বাজছিলো।

মহাত্মা বসতির হই-হুল্লোড়রত সমাবেশস্থলের দিকে লক্ষ করে ওপরের দিকে হাত উঁচু করে বললেন– 'ওহে জগন্নাথ দেবতার পূজারিরা! নাদের খান সুকৌশলে লজ্জাজনক কিছু কাজ করেছে। মুসলমান সৈনিকেরা শুধু আমাদের চারজন নির্দোষ পুরোহিতকে নির্মমভাবে হত্যাই করেনি; বরং তারা আমাদের জগন্নাথ দেবতার দেবীকেও অপহরণ করেছে। তারা যুগ যুগ ধরে চলা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং সমস্ত বন্ধন এক ধাক্কায় টুকরা টুকরা করে দিয়েছে। হয়তো মুসলমানরা আমাদের দুর্বল ভেবেছে। আমরা দুর্বল ও মনোবলহারা জাতি নই। আমরা পূর্ণ শক্তির সাথে এ নিষ্ঠুরতার জবাব দেবো। আমরাও তাদের সাথে সব ধরনেরর সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। যাদের

www.pathagar.com

দাসত্ব করতে গিয়ে আমরা আমাদের মস্তকে গোলামির লাগাম বেঁধে রেখেছিলাম, আমরা এখন থেকে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম। আমরা মুসলমান নেতাদের জন্য বিদ্রোহী।'

সমাগমস্থলে একধরনের নীরবতা বয়ে যেতে লাগলো। মহাত্মা লোকদের নীরবতাকে অনুভব করে বললেন- 'যে হিন্দু এ ধর্মীয় ও স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে না, ভগবান তার জীবন রক্ষার দায়িত্ব নেবেন না।'

তিলকচন্দ্র নামের এক বৃদ্ধ হাত জোড় করে বড়ই বিচক্ষণতার সাথে বললো- 'মহাত্মাজি! হুট করে কোনো সিদ্ধান্তে গেলে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে। এই ছোট্ট একটা বসতির হাজার খানেক লোকের হাতে নৈরাজ্যের হাতিয়ার তুলে দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করাটা কোনো বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কাজ নয়।'

মহাত্মা তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন- 'আপনি যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য প্রশ্ন করেছেন। ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। এই বসতির গুটি কয়েক হাজার লোকের পেছনে অগণিত দেবতার বুক মিলিত আছে। পর্বত ও জঙ্গলের মহারাজারা তবলা বাজাতে বাজাতে আসবেন। বড় কোনো তুফানের মতো বাংলার ভূখণ্ডের অলিতে-গলিতে হাহাকার ছেয়ে যাবে।'

তিলকচন্দ্র শঙ্কা প্রকাশ করে বললো- 'মনে হয় আজকের সভায় আসামের মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের কাছে সাহায্য প্রার্থনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে।'

মহাত্মা বললেন- 'তোমার ধারণা সঠিক। ভগবান মহারাজার বাহু মৃত্যুদেবতার শক্তিতে ভরপুর। আমি মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের দরবারে যাবো। আশা করি, মহারাজ আমাকে বঞ্চিত করবেন না। তখন শোকাহত আত্মারা শান্তি পাবে।'

তিলকচন্দ্র মাথা নিচু করে বললো- 'মহারাজা জয়ধ্বজ সিং অতীতের লজ্জাজনক পরাজয়ের ব্যথা এখনো ভোলেননি। নিজের বড় একটা সাম্রাজ্য থেকে হাত ধুয়ে ফেলতে হয়েছে তাকে। হয়তো এবার পুরো আসাম থেকে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে।'

তিলকচন্দ্র বাইরের দিকে বেরিয়ে যেতে চাইলে মহাত্মা গর্জন করে বললেন- 'এই বৃদ্ধ মহাপাপীর জিহ্বা কেটে দাও।'

কয়েকজন পূজারি অগ্রসর হলে এক যুবক তাদের পথ রুদ্ধ করে বললো-

www.pathagar.com

'একজনও আর সামনে এগোবে না। যদি সামনে বাড়ো, তাহলে মৃত্যুদেবীর সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবো।'

সে মহাত্মাকে সম্বোধন করে বললো– 'আপনি যখন কোনো ভগবানই নন, তাহলে ভগবানের ভঙ্গিমায় কথা বলছেন কেন? আপনি কারও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করার অধিকার রাখেন না। আপনি কতোজনের জিহ্বা কাটবেন?'

মহাত্মা একটু নরম স্বরে বললেন– 'এখন যদি লক্ষ্য বিনষ্টকারী কথাবার্তা বলার অনুমতি দিই, তাহলে আমার স্বপ্ন মাটি হয়ে যাবে।'

যুবক বললো– 'আমরা কোনো মহারাজাকে এই বসতির লোকদের হাড়ের ওপর স্বপ্নের তাজমহল বানাতে দেবো না এবং প্রশান্তির প্রাসাদ নির্মাণের অনুমতিও দেবো না। আমরা ভগবানের পূজারি। এ পরিস্থিতিতে আমরা আপনার সঙ্গ দেবো। কিন্তু আপনাকে ভগবান হতে দেবো না।'

মহাত্মা বললেন– 'আমি ভগবানের অবতার। ভগবান আমার আশা-প্রত্যাশা ও কামনাগুলোর সম্মান করবেন।'

রঘুনাথ সমাবেশস্থলে প্রবেশ করতে করতে বললেন– 'আমরা যদি নিজেদের মধ্যে পরস্পর এভাবে ঝগড়ায় লিপ্ত থাকি এবং একে অপরের দুর্বলতা নিয়ে খেলা করি, তাহলে আমাদের এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। এখন আমাদের দৃঢ় ঐক্য ও সম্প্রীতি বিনিময় করা দরকার।'

মহাত্মা বললেন– 'আমি যখন বিদ্বান, আমার কাছে ভগবানের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। আমি ঊর্ধ্বজগৎ দেখেছি। তার পরও কিছু মানুষের আমার বক্তব্য কেন বিশ্বাস হচ্ছে না?'

লোকজন আবারও স্লোগান দেয়া শুরু করলো।

রাতে পুব আকাশের পেট থেকে চাঁদ উদিত হয়। চাঁদের কিছুটা আলো দেখা যাচ্ছে। জগন্নাথের বসতি থেকে পঞ্চাশ-ষাটজন লোকের একটা দল মহাত্মার নেতৃত্বে আসামের দিকে যাত্রা করলো। মহাত্মা সাদা ঘোড়ার ওপর চড়েছিলেন। তার হাতে পিতল রঙের একটা ঝান্ডা। সবার হাতে অগ্নিমশাল। একটা চৌকিতে চার মহাদেবের জ্বলিত শবদেহ। লাশগুলো একটা চাদরে মোড়ানো।

www.pathagar.com

কিছু দূর আসার পর চন্দন নিজের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে রঘুনাথকে সম্বোধন করে বললো– 'চাচাজি! এখান থেকে আমার রাস্তা পৃথক হয়ে গেছে। আমি আমার ঘরে যাচ্ছি। আমি আমার পিতার অনুমতি ব্যতীত আসাম যেতে পারবো না। আমার প্রত্যাশা– যেকোনো সময় আপনাদের সাথে আবার সাক্ষাৎ হবে। তবে এ সময়টাতে অনেক কিছু পাল্টে যাবে। ওই যাত্রাতেই পরিবর্তন দেখতে পাবেন। আমি দুজনের কারও একটা মস্তক বহন করবো।'

রঘুনাথ বললেন– 'তুমি কোথায় যাচ্ছো? তুমি আমাদের সাথে চলো। তোমাকে আমাদের সাথে যেতেই হবে।'

চন্দন গাদ্দারি ভাব দেখিয়ে বললো– 'আস্তে বলুন! আমার হাতে এখনো তরবারি। আমি ওই স্বপ্নীল ভুবনের দিকে যাচ্ছি, যেখানে শান্তির জোয়ার বইছে। যেখানে সম্প্রীতির বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। যেখানে প্রত্যাশার ফুল ফোটে।'

এসব কথা বলে চন্দন তার ঘোড়ার পায়ে মৃদু আঘাত করলো। তারপর তার ঘোড়া খুব দ্রুত ছুটে অন্ধকারে হারিয়ে গেলো। ঘোড়ার পায়ের টগবগ শব্দ গর্জন করে যাচ্ছিলো রাতের নিস্তব্ধতায়।

www.pathagar.com

আবার ষড়যন্ত্র

প্রশস্ত ও বিশালাকার বড়ই দৃষ্টিনন্দন একটি প্রাসাদ। সুবিশাল ছাদটি আনুমানিক পঞ্চাশ-ষাটটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে। স্তম্ভের প্রস্থতা এতো বেশি যে দুজন ব্যক্তির পক্ষেও তা বেষ্টন করতে কষ্ট হবে। প্রতিটি স্তম্ভের সাথে সুদৃশ্য পাত্র ও সুগন্ধিদানি ঝোলানো- যেখান থেকে বেরোচ্ছিলো মনকাড়া সুগন্ধি। বারান্দায় রয়েছে অসংখ্য লোক বসার মতো ব্যবস্থা। সেখানে খুব সুন্দর বিছানা তৈরি করা আছে মার্বেল পাথর দ্বারা। প্রাসাদের দেয়ালে টাঙানো আছে বড় দেব-দেবীর প্রতিমা। রঙ-বেরঙের মূর্তিদের পেছনে আধো-আঁধারি গলিপথ। ওই গলিতে মূর্তি সারির আড়ালে মহারাজার কৃষ্ণ বর্ণের দীর্ঘদেহী প্রহরীরা বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এরা দরবারের নিরাপত্তায় নিয়োজিত এবং মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপে কড়া দৃষ্টি রেখে চলেছে।

মহারাজার দরবারে রাজ্যের গোত্রপ্রধানগণ ছাড়াও উপস্থিত আছেন জ্যোতিষী, জাদুকর এবং আসামের বিভিন্ন গোত্রের সরদাররা। ওই সব গোত্রের সরদারদের বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ তারা ভিন্নধর্মী, ভিন্ন সংস্কৃতি, বিরল প্রজাতি, দাঙ্গা-ফ্যাসাদ ও রক্তারক্তিতে বেশ প্রসিদ্ধ। এসব গোত্রের জন্য নির্দিষ্ট পোশাকও আছে। মহারাজা এদের ওপর যথেষ্ট আস্থা রাখেন। প্রধান ফটকে মনকাড়া পাথরে তৈরি পর্দা ঝোলানো। এটার তিন কোণেই রুপা দ্বারা পাড় দেয়া হয়েছে। মহারাজার সিংহাসন স্বর্ণালংকার দিয়ে খুব চিত্তাকর্ষক কারুকাজ করা। সিংহাসনের খুঁটি রুপার তৈরি। তার ওপর সোনার প্রলেপ। সিংহাসনের দৃশ্যটা বড়ই রাজকীয়। মহারাজার সিংহাসনের পেছনে অতুলনীয় সুন্দর একটা ব্যালকনি। মহারাজার বংশীয় মেহমান বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো অতিথি এলে ওই ব্যালকনিতে বৈঠক করেন।

www.pathagar.com

তিনি নিজের বড় সাদা-কালো ঘন গোঁফে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন– 'জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের মহাত্মা ও তার সাথিদের উপস্থিত হবার জন্য অনুমতি দেয়া হলো।'

মহারাজার পেছনে বর্শা হাতে নিরাপত্তাকর্মী দাঁড়ানো। সুগন্ধিতে ভরপুর প্রাসাদের অভ্যন্তর। মহারাজার চোখে-মুখে রঙিন আশার জোয়ার। এক দরবারি লোক উচ্চ আওয়াজে মহারাজার কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলো। সে বললো– 'মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের পক্ষ থেকে জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের মহাত্মা ও মেহমানদের বিশেষ কক্ষে উপস্থিত হবার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে।'

মহারাজা কোমর থেকে তরবারি বের করে সামনে রাখলেন। প্রধান দরজায় দাঁড়ানো দু-একজন দরবারি লোক উচ্চ আওয়াজে আবার বলতে লাগলো– 'মহাত্মা ও তার সাথিদের উপস্থিত হবার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে।'

মহারাজার নিরাপত্তাকর্মীরা প্রধান দরজায় সমবেত। কিছু সময় পর জগন্নাথ মন্দিরের মহাত্মা রাজকক্ষে প্রবেশ করলেন।

মহাত্মার শরীরে মেটে রঙের চাদর। মাথা মুণ্ডিত এবং লাল রঙের তিনটা তিলক। কানের পাশে লাল চুলগুলো চমকাচ্ছে। মহাত্মার পেছনে পেছনে পূজারিদের কাঁধে পুরোহিতদের চাদরে মোড়ানো শবদেহ। লাশের পেছনে মৌয়ালজিসহ অন্যরা অবনত মস্তকে হাত জোড় করে মহারাজার সিংহাসনের দিকে এগোতে লাগলো। মহাত্মা হাত জোড় করে মহারাজার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'আমরা জগন্নাথ দেবতার পক্ষ থেকে আপনাকে নমস্কার বলতে এসেছি।'

মহারাজা জয়ধ্বজ সিং মাথা নুইয়ে বললেন– 'আমার সৌভাগ্য, দেবতা ভগবান আমাকে ধন্য করেছেন। আমি দেবতা মহারাজের মহাত্মা এবং তার সাথিদের আমার রাজধানীতে সুস্বাগত জানাচ্ছি।'

তারপর মহারাজা চাদরে ঢাকা লাশের দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করলেন– 'এগুলো কী?'

মহাত্মা হাত জোড় করে বললেন– 'এ চাদরে বাংলার হিন্দু জাতিদের ভবিষ্যতের ভয়ানক দৃশ্য রয়েছে।'

মহারাজা বললেন– 'আমি দেখতে চাই এখানে কী আছে! মনে হচ্ছে, তোমরা সবিস্তারে কিছু বলতে চাচ্ছো না।'

www.pathagar.com

মহাত্মা এক-এক করে চারটি লাশ থেকে চাদর উঠিয়ে নেন। তিনি ব্যাকুলতা প্রকাশ করে বললেন– 'এই পোড়া লাশগুলো কার? লাশগুলোও বা এখানে কেন নিয়ে আসা হয়েছে?'

মহাত্মা ক্রন্দন করতে করতে বলতে লাগলেন– 'মহারাজ! আমরা আপনার ছায়া ও নিরাপত্তা ভিক্ষা চাইতে এসেছি। এ সময় বাঙালে মুসলমানদের নিপীড়ন সীমার অতিরিক্ত মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছে। সর্বদা এখন বাংলার হিন্দুদের দু'চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত। বিদগ্ধ তাদের স্বপ্ন এবং অতৃপ্ত তাদের আত্মা। এটাই এখন সেখানকার হিন্দুদের অবস্থা। এই পোড়া লাশগুলো হচ্ছে জগন্নাথ ভগবানের বিদ্বান নির্দোষ পুরোহিতদের। মুসলমানরা তাদের জীবন্ত জ্বালিয়ে দিয়েছে।'

মহারাজার চেহারার রঙ পাল্টে যেতে লাগলো। তিনি তরবারির দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে বললেন– 'আমি ঘটনার বিবরণ শুনতে চাই। এই বিদ্বান পুরোহিতদের কোথায় হত্যা করা হয়েছে? কোন অপরাধে তাদের মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে?'

মহাত্মা চাদর দিয়ে অশ্রু মুছতে মুছতে বললেন– 'তাদের জগন্নাথ দেবতার পবিত্র স্থানেই হত্যা করা হয়েছে। মুসলিম হাকিমের সৈনিকেরা ভগবানের দেবতার কোমল কুমারী দেবীকে অপহরণ করতে এসেছিলো। তখন এই মহাদেবরা তাদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান। আর তখনই নির্দয় ঘাতকেরা এদের অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেয় এবং দেবীকে উঠিয়ে নিয়ে যায়।'

মহারাজা ক্রোধাগ্নি হয়ে বললেন– 'জগন্নাথ দেবতার মন্দিরে সব সময় অসংখ্য পূজারি উপস্থিত থাকে। এছাড়া সেখানকার তীর্থযাত্রীও কম নয়। এতোগুলো লোকের উপস্থিতিতে কীভাবে এতো বড় অঘটন ঘটলো?'

মহাত্মা কাশিরাম ঘটনার সবিস্তারে বর্ণনা দিতে লাগলেন। তিনি বলেন– 'দেবীর ওপর জাদুটোনা করেছিলাম আমরা। সে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলতো। সে হচ্ছে পাঙ্কু রাশি। মহারাজার অবশ্যই জানা আছে, পাঙ্কু রাশির জাতক জাদুটোনার মন্ত্র জানে। আমরা দেবীকে পাঙ্কুর মহাদেবীর নিকট পাঠালাম। মন্দিরের গোপন কক্ষে জাদুর মন্ত্র পাঠ হচ্ছিলো। সাধারণ পূজারি তীর্থযাত্রীরা এ বিষয়ে কিছুই জানতো না। মুসলিম সৈনিকেরা কক্ষের গোপন সুড়ঙ্গপথে কক্ষে প্রবেশ করে এবং মহাদেবদের মন্ত্রপাঠের আগুনে ফেলে পুড়িয়ে মারে। তারপর দেবীকে নিয়ে পালিয়ে যায়।'

www.pathagar.com

মহারাজা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন– 'আমি তোমাদের সমবেদনা প্রকাশ করছি। সত্যিই আমি ব্যথিত। এটা সমগ্র হিন্দু জাতির জন্য দুঃখের সংবাদ।

মহাত্মা বললেন– 'মহারাজা! আমরা চরম দুঃখী ও ব্যথিত হয়ে আপনার কাছে এসেছি।'

দরবারে তখন নীরব নিস্তব্ধতা। লোকজন দগ্ধ লাশগুলো দেখছিলো।

মহারাজ বললেন– 'আমার আত্মা আজ আক্রান্ত। আমি এ ভয়ানক পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। আমি জানতাম এমন কিছু একটা হবে।'

অতঃপর মহারাজা নিজের তরবারি কোষমুক্ত করে বললেন– 'এখন তোমরা আমার কাছে কী প্রত্যাশা করো?'

মহাত্মা দু'পা আগ বাড়িয়ে মাথা নত করে বললেন– 'আমরা বাংলার হিন্দু জাতির নিরাপত্তা ও আশ্রয় ভিক্ষা করতে আপনার কাছে এসেছি। নৈরাশার অন্ধকারে শক্তির মশাল জ্বালিয়ে আলোকিত করে দিন, মহারাজ!'

মহারাজ বললেন– 'আমার আফসোস হচ্ছে এজন্য যে, তোমাদের সৃষ্ট অন্ধকারের কারণে অঞ্চলটি প্রত্যাশার ফুলে রাঙিয়ে তুলতে পারছি না। আমার কাছে বাংলার হিন্দুদের জন্য কোনো ভাঙা চেরাগও নেই, যেটা দিয়ে আলো দেবো। এখন বাংলার হিন্দুদের জন্য আমার রাজ্য শাসনব্যবস্থা কিছুই করতে পারবে না। বাংলার হিন্দু জাতি যুগ যুগ ধরে নৈরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে।'

'দোহাই মহারাজ! দোহাই! দেবতার দোহাই দিয়ে বলছি– আমরা বড় আশা ও চোখের জল নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আমাদের বিপদের মাঝে রেখে আপনি চেহারা ফিরিয়ে নেবেন না।'

মহারাজা বললেন– 'তোমরা অবশ্যই জানো, আমি দ্বিতীয়বার বাংলার মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে কী ভুলটাই না করেছিলাম। উভয়বারই আমাকে পরাজয়ের লজ্জা ও গ্লানির পাত্র হতে হলো। এখনো আমার ক্ষতস্থান থেকে, আমার ব্যথিত চোখ থেকে দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত ঝরে। আমরা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূখণ্ড হারিয়েছি। গোহাটির দুর্গ হারানোর বেদনা আমি জীবনভর কখনো ভুলবো না।'

আবার তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলতে লাগলেন– 'তোমরা এটা ভালো করেই জানো যে, অতীতের সব কটি যুদ্ধে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরাই

www.pathagar.com

বেশি আমাদের ক্ষতি করেছে। আমরা মুসলমানদের ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু হিন্দুদের কখনো ক্ষমা করবো না। যে ব্যক্তি তার অতীতের কঠিন অভিজ্ঞতাকে ভুলে যায়, তাদের অবস্থা সব সময় ভয়ানক ও প্রলয়ঙ্করী হয়ে থাকে। ইতিহাসের করুণাহীনতা বাংলার হিন্দুদের ভাসিয়ে কোনো গভীর গহ্বরে ডুবিয়ে দেবে। সময়ের চলমান প্রতিটি ক্ষণ মৃত্যুঘাটের মতো কঠিন।'

মহাত্মা কাশিরাম বললেন– 'মহারাজ, সময় পরিবর্তনশীল। আঁধারের গভীরতা থেকেই কিন্তু আলোর সৃষ্টি হয়। বাংলায় বিপ্লবের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আঘাতের পর আঘাত পাওয়ার পর এখন বাংলার হিন্দু জাতি জাগ্রত হয়েছে। মিথ্যা স্বপ্নের অন্ধকারকে প্রত্যাশার আলোতে পাল্টে দিয়েছে।'

মহারাজা দ্রুত জিজ্ঞেস করলেন– 'আপনার ধারণা অনুসারে সে মুক্তিদাতা কে হতে পারে?'

মহাত্মা মুচকি হাসি দিয়ে হাত জোড় করে বললেন– 'এখন আমি সেই মুক্তিদাতা দেবতার দ্বারেই দাঁড়িয়ে। আমার কাছে দেবতা ভগবানের জ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে। আকাশের পরমাত্মা মহারাজা জয়ধ্বজ সিংকে মৃত্যুর দেবতা এবং আমাকে তার শক্তির অবতার বানিয়েছে। বাংলার রাজসিংহাসন মহারাজার পথপানে চেয়ে আছে।'

মহারাজা তরবারির শাণের ওপর হাত রেখে বলেন– 'কাশিরামজি! আপনি এক মহান দেবতার মন্দিরের মহাত্মা। আমি আপনার জ্ঞান-বিদ্যাকে মিথ্যা স্বপ্নে প্রতিপন্ন করতে পারি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, বাংলার হিন্দু জাতি কাঁটাদার রাস্তায় চলাটা খুব ভালোই শিখে গেছে।'

মহাত্মা একটু পিছু হটে রঘুনাথ মৌয়ালজির দিকে ইশারা করে বললেন– 'ইনি হচ্ছেন রঘুনাথ। বসতির মৌয়াল। তিনি মুসলিম হাকিমের কর্মকর্তা। এ সময়ে তিনি এখানে থাকাটাই তো প্রমাণ করে মানুষের রুচিবোধ পাল্টেছে।'

মহারাজা রঘুনাথের দিকে তাকালেন। তারপর একটু চুপ থেকে বললেন– 'রঘুনাথ! তুমি কি বাংলার হিন্দু জাতির চেতনা জাগ্রত হওয়ার বিষয়টি নিজ চোখে দেখেছো?'

রঘুনাথ হাত জোড় করে অবনত মস্তকে বললেন– 'প্রভুর কৃপায় আমাদের চেতনার তেজ পাল্টে গেছে। মুসলিম নেতাদের নির্দয় অত্যাচারী কর্মকাণ্ড

www.pathagar.com

আমাদের বিদ্রোহের পথে চলতে বাধ্য করেছে। আমরা রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে গেছি এবং আমরা শেষ নিশ্বাস থাকা পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

মহারাজার চেহারায় ফুটে উঠলো প্রত্যাশার আভা। তার চক্ষুদ্বয় খুশিতে চমকাচ্ছে। তিনি বললেন– 'আমার জানামতে বাংলায় কয়েকজন নেতৃস্থানীয় হিন্দু লোক আছে। তোমাদের কি বিশ্বাস হয়, তারা আমাদের সাথে একাত্ম হয়ে আমাদের সাহায্য করবে।'

রঘুনাথ বললেন– 'বিদ্রোহের সামনে বাংলা রাজ্যের নেতৃবৃন্দের মাথা ঠিক থাকবে না। কেননা, জাতির সিদ্ধান্ত তো ভগবানের সিদ্ধান্ত। তারা ভগবানের সব সিদ্ধান্তকে না-ও মানতে পারে। ভগবান তাদের জীবনতরি ডুবিয়ে দেবে।'

মহারাজা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললেন– 'তুমি ঠিক বলেছো, জাতির বিদ্রোহ তাদের মাঝে তুফান সৃষ্টি করবে?'

মহারাজা ডান দিকে কাত হয়ে বসে প্রধান উজিরের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'প্রধানমন্ত্রী! আপনি তো মহাত্মা কাশিরাম ও রঘুনাথ মৌয়ালজির কথা শুনেছেন। আপনি বলুন– এখন আমি কী করতে পারি? মনে হয়, বাংলার হিন্দু জাতিকে রক্ষা ও নিজ ছায়াতলে আশ্রয় দেবার সময় এসে গেছে।'

প্রধানমন্ত্রী দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললেন– 'অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা সামনে রেখেই মহারাজাকে ভাবা দরকার। দ্রুত কোনো সিদ্ধান্তে গেলে ওটা অনেক কষ্টদায়ক হতে পারে।'

মহারাজা বাঁ দিকে তাকিয়ে সেনাপ্রধানকে জিজ্ঞেস করলেন– 'অজয় কুমার সেনাপতিজি! আপনি কি কিছু বলতে চান?'

নওজোয়ান সেনাপতি অজয় কুমার বসা থেকে উঠতে উঠতে হাতে রাখা তরবারিতে চুমু দিয়ে গম্ভীর স্বরে বললো– 'আমি মহারাজার বাহাদুর সৈনিকদের প্রধান সেনাপতি। আমরা কঠিন পরিস্থিতির সাথে লড়াই করেও টিকে আছি। ভয়ংকর পথে চলাটা আমাদের অভ্যাস। আমরা এখনো যুবক। আমাদের ধমনির রক্তে যৌবনের আগুন খেলা করে। মহারাজ! অতীতের কোনো পরাজয়কে ভেবে ভেবে কালক্ষেপণ করা আমাদের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই না। মহারাজার জন্য যেকোনো সিদ্ধান্তের অধিকার আছে। আমরা

www.pathagar.com

তো আপনার সেবক। মহারাজার ইচ্ছাগুলোকে মেনে চলাটাই আমাদের ধর্ম।'

মহারাজা অতিশয় সন্তুষ্ট ও আনন্দ প্রকাশ করে বললেন– 'আমি অচিরেই আমার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে সবাইকে জানিয়ে দেবো।'

মহারাজা দরবারের লোকদের দিকে তাকালেন। পাংখো গোত্রের সরদার হাত জোড় করে বললেন– 'আমরা আমাদের গোত্রের মহাদেবদের রক্তের প্রতিটা ফোঁটার কঠিন প্রতিশোধ নেবো।'

পাংখো গোত্রের সরদারের চোখ রক্তে রাঙা। তার হাতে লম্বা একটা বর্শা। মাথার ওপর পশু রঙের টুপি। মহারাজা হাতা প্রসারিত করে বললেন– 'ধৈর্য ধরো। আমি তোমাদের দুঃখ বুঝি। আমিও তোমাদের দুঃখে দুঃখী। আমরা আমাদের মহাদেবদের হত্যাকারীদের কখনো ক্ষমা করবো না।'

মহারাজা আসন ছেড়ে ওঠার সময় বললেন– 'দিনের শেষভাগে রাজধানীর শ্মশানে মহাদেবদের শবদেহের ক্রিয়াকর্মের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করবো। সে অনুষ্ঠানে আমি নিজেও অংশগ্রহণ করবো।'

মহারাজা লম্বা লম্বা কদমে পেছনের দরজা দিয়ে রাজমহল থেকে বেরিয়ে যান। সেনাপতি অজয় কুমার মহাত্মার সামনে হাত জোড় করে বললো– 'কোনো চিন্তা করবেন না। আমি মহারাজাকে বাংলায় অভিযান চালানোর জন্য বাধ্য করবো। আমরা বাংলার মুসলিম নেতাদের জীবনতরি রক্তের গভীর সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবো।'

দিনের শেষভাগে পাংখো মহাদেবদের লাশগুলোকে একটা বড় শবযাত্রার সাথে রাজধানীর শ্মশানে উপস্থিত করা হয়। ওই সভার সভাপতি ছিলেন খোদ মহারাজা। তার ডান হাতে একটা পিতল রঙের বর্শা। রাজধানীর মন্দিরের মহাদেব, পূজারি ও তীর্থযাত্রীরা শ্লোক ও বিভিন্ন শব্দ জপতে জপতে আসতে থাকে। জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের মহাত্মাসহ অন্যরা আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন। লাকড়ির মাঝে শবদেহগুলো রাখা হয়। অতঃপর পাংখো রীতিনীতি অনুসারে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

আগুন মহাদেবদের লাশগুলো পুড়িয়ে শেষ করে দিলে মহারাজা নিজ বর্শা ওপরের দিকে উঁচিয়ে বললেন– 'আমরা তোমাদের নিষ্পাপ আশাকে নিষ্ফল হতে দেবো না। আমরা তোমাদের নির্দয় ঘাতকদের এ জগতেই কঠিন শাস্তি

www.pathagar.com

র স্বাদ আস্বাদন করাবো। আমরা কোনো মুসলিমকেই ক্ষমা করবো না। তোমরা আকাশের ঊর্ধ্বজগতে বসে বসে সামনে এগিয়ে যাওয়ার গতি ও প্রতিশোধের ধরন পর্যবেক্ষণ করবে। আমাদের কামানের নিক্ষিপ্ত গোলার ভয়াবহতা পুরো দুনিয়া খুব কাছে থেকেই অনুভব করবে।'

এক ভক্ত রাজধানীর মন্দিরের মহাদেবকে দাম্ভিক সুরে জিজ্ঞেস করলো– 'মহারাজার কী হলো? তিনি রক্তারক্তির কথাবার্তা কেন বলছেন?'

মহাদেব ঠান্ডা মাথায় আস্তে করে বললেন– 'তুমি চুপ করো। তিনি ভগবানের স্বরে কথা বলছেন। মনে হয় খারাপ সময় তাকে বড় কোনো অঘটনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কেউ মহারাজাকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কারো কারো প্ররোচনায় তিনি মন থেকে সম্প্রীতি, জ্ঞান-বুদ্ধি ও সৌজন্যবোধ সব হারিয়ে ফেলেন। যখন কারো মনে কোনো রক্তপিপাসু রাক্ষস জায়গা করে নেয়, তখন তার আত্মা অন্ধ হয়ে যায়। ওহে প্রভুর ভক্ত! কালসাপের বিষাক্ত ফণার সামনে কথা বলতে নেই। যখন অন্তর থেকে দয়ামায়া দূরীভূত হয়ে যায় তখনই দেখা দেয় হিংস্রতা। এখন যেই মহারাজাকে দেখতে পাচ্ছো, তার অন্তরে মহাত্মা কাশিরাম বসে আছেন। কাশিরামকে মহাত্মা বলা হয়। অথচ সে কখনোই মহাত্মা হতে পারে না। সে কোনো মহান দেবতার পূজারিও নয়। সে নৈরাজ্যের আগুনকে প্রসার করছে। কিন্তু তুমি দেখো এবং অচিরেই দেখবে, এ অমানুষটা অনেক অনেক আফসোস করবে। তখন অনেক কান্না করবে।'

চিতার আগুন নিভে গেলে মহারাজা জয়ধ্বজ সিং ফিরে আসেন। তার পিছু পিছু মহাত্মা কাশিরাম, রঘুনাথ ও সেনাপতি অজয় কুমারও শ্মশানের বধ্যভূমি থেকে চলে যায়। মহারাজা জয়ধ্বজ সিং ঘোড়ায় চড়তে চড়তে বললেন– 'মহাত্মা কাশিরাম! আমি আজ রাতেই আমার মহলে আপনাকে ডাকবো। ততোক্ষণ পর্যন্ত আপনি মেহমানখানায় অবস্থান করুন। কোনো চিন্তা করবেন না। আপনি সবকিছুই শুনবেন।'

সন্ধ্যা হারিয়ে যেতে থাকে গভীর অন্ধকারে। পাহাড়ের রাত খুব অন্ধকার হয়। গভীর নিস্তব্ধতায় ছেয়ে যায়। সন্ধ্যার শুরুতে রাজধানীজুড়ে জ্বালানো হয় মশাল ও হারিকেন। মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের রাত বেশ রঙিন। রাতের প্রথম প্রহর অতিবাহিত হচ্ছে। রাজধানীর দুর্গের স্থানে স্থানে বড় বড় মশালের আলো। আকাশে তারার মিছিল। দুর্গের উঁচু উঁচু প্রাচীরের ওপর

www.pathagar.com

মশালধারী সৈনিকেরা টহল দিয়ে যাচ্ছে। মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের বিশেষ কক্ষে রাজ্যসভার বৈঠক চলছিলো।

মহারাজা সোনালি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তার সামনে রুপার সুদৃশ্য আসনে মহাসভার নেতৃবৃন্দ বসে আছেন। জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের মহাত্মা কাশিরাম ও মৌয়াল রঘুনাথ বসে আছেন মহারাজার কাছেই। মহারাজার দীর্ঘ চুল কাঁধের ওপর ছড়ানো। তার মোটা মোটা চোখে অদৃশ্য চমক। তার চেহারায় ফুর্তি ফুর্তি ভাব। কক্ষের ছাদের সাথে ঝোলানো রঙ-বেরঙের হারিকেনের আলোয় মনকাড়া ও জাদুময়ী এক পরিবেশ বিরাজমান। কক্ষের দেয়ালের সাথে রাখা সুগন্ধিদান পুরো সভাস্থলকে মনোমুগ্ধকর সুরভিত করে রেখেছে। মহারাজার সিংহাসনের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে নিরাপত্তারক্ষীরা। তাদের হাতে নগ্ন তরবারি চিকচিক করতে থাকে। মহারাজার নিরাপত্তাকক্ষের দরজা খোলা। কিছুক্ষণ পর পর্দা নড়াচড়া করলো। দুজন রূপবতী সেবিকার চেহারা প্রকাশ পেলো। মহারাজা তাদের দিকে তাকালেন। তারা অবনত মস্ত কে হাত জোড় করে নম্রকণ্ঠে বললো– 'মহারাজা! রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত আপনার দর্শনের অনুমতি প্রার্থী।'

মহারাজা বসা থেকে উঠে বললেন– 'আমি অনুসন্ধিৎসু নয়নে তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

সেবিকা একটু পেছনে সরে গেলো। কিছুক্ষণ পর রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত রূপের আগুন জ্বালিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলো। তার চেহারার অর্ধাংশে কালো রঙের নেকাব পরা ছিলো। তার চোখগুলো তারকার ন্যায় ঝলমল করছিলো। মহারাজা এগিয়ে এসে রাজকন্যাকে স্বাগত জানালেন। রাজকুমারী বড়ই সৌজন্যবোধ ও রাজসিক ভঙ্গিমায় মহারাজার চরণ স্পর্শ করলো এবং হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে গেলো। রাজকুমারীর চেহারায় একটা নিষ্পাপ হাসি লেগেই ছিলো।

মহারাজা তার প্রশস্ত ও সুদৃশ্য কপালে চুমু খেয়ে বললেন– 'আমরা অনেকক্ষণ ধরেই তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম।'

রাজকুমারী দ্বিতীয়বার তার চরণ স্পর্শ করে হাত জোড় করে বললো– 'অপরাধ মার্জনা করুন, মহারাজ! অক্ষমতার কারণে ভুল হয়ে গেছে। মহারাজকে আমার অপেক্ষায় রেখেছি ভেবে সত্যিই আমি লজ্জিত!'

www.pathagar.com

মহারাজা তাকে নিজের পাশের আসনে বসিয়ে বললেন– 'চন্দ্রকান্ত! তুমি আমার চোখের মণি। তোমার জানা আছে, আমি তোমার অনুপস্থিতিতে রাজ্যের কোনো বড় সিদ্ধান্ত নিই না।'

রাজকুমারী মাথা নেড়ে বললো– 'আমার জানা আছে। এটা মহারাজের কৃপা।'

কিছুক্ষণ পর মহারাজ উপস্থিত সকলকে বসার ইঙ্গিত দিয়ে বলতে শুরু করলেন– 'আমরা বাংলায় খুন হওয়া মহাত্মাদের লাশগুলোকে নিজের চোখে দেখেছি। ওই নির্দোষ ভক্তদের চিতা এখনো জ্বলছে। মুসলমান দুষ্কৃতকারীরা জগন্নাথ দেবতার কোমল ও সুন্দরী দেবীকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে গেছে। দেবতাদের মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করার চক্রান্ত চলছে। শতাব্দীর প্রাচীন প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। বর্তমান সময়ে বাংলার হিন্দুদের ভাগ্যের প্রদীপ ভয়ানক অন্ধকারে পতিত। আমরা মুসলমান অপহরণকারীদের এমন ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ড কখনো সমর্থন করি না। আমরা পুরো শক্তি ও বল প্রয়োগ করে এ বর্বরতার মোকাবেলা করবো। যদি আমরা পুরো সক্ষমতার সাথে মুসলিমদের হিংস্রতার পথ বাংলায় রুদ্ধ করতে না পারি, তাহলে তাদের নিষ্ঠুরতার অন্ধকার আমাদের রাজধানীর সিংহাসন পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।'

সেনাপতি অজয় কুমার হাত জোড় করে বললো– 'আমরা মনে করি, মহারাজের সিদ্ধান্ত ভগবানের সিদ্ধান্ত। আমরা বাংলার নদী-নালার পানি রক্তে লাল করে দেবো। আসামের সৈন্যরা বাঘের মতো।'

মহারাজা আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, 'আমি জানি। এখন আমাদের সেনাদের সাহসিকতা রুখে দাঁড়ানোর সাধ্য কারো নেই। আমরা হামলার পর হামলা চালিয়ে বাংলার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাবো। কিন্তু আমি রাজকুমারীর মতামত জানাটা অত্যন্ত জরুরি মনে করি।'

রাজকুমারী মৃদু হেসে বললো– 'পিতাজি মহারাজের সিদ্ধান্তের বিপরীত বলার স্পর্ধা কে দেখাবে, বলুন?'

মহারাজা রাজকুমারীর মাথায় হাত রেখে বললেন– 'তুমি ঠিক বলেছো। আমার সামনে বিপরীত ওই হতভাগাই করবে, যার জীবনের দিন শেষ। কিন্তু আমি তোমাকে সে অধিকার দিয়েছি।'

www.pathagar.com

রাজকুমারী বললো– 'মহারাজের বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতা আমার থেকে অনেক বেশি। যখন আমার পিতা মহারাজ বাংলায় আক্রমণ করার পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন, সেখানে আমার কিছু বলা অনর্থক সাব্যস্ত হবে।'

মহারাজ বললেন– 'তারপরও তুমি অন্তত কিছু বলো! আমরা তোমার মতামত গভীর মনোযোগী হয়ে শুনবো। আর যদি সম্ভবও হয়, তাহলে তোমার কথার ওপরই চলবো। আমরা অবশ্যই জানি তোমার সিদ্ধান্ত অনেক গুরুত্ববহ।'

রাজকুমারী দীর্ঘক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর চিন্তক দৃষ্টিতে মহারাজার দিকে তাকিয়ে বললো– 'রাজপুতজি রাজধানীতে আছেন। ওনার জ্ঞানগর্ভ মতামত জেনে নিলে অনেক ভালো হবে। তাছাড়া আমি মহারাজার সাথে ব্যক্তিগত আলোচনাও করবো।'

মহারাজা সামনে দাঁড়ানো একজন সৈনিককে আদেশ দিয়ে বললেন– 'যোগীকে হাজির করা হোক।'

দরবারকক্ষে একরকম নীরবতা বিরাজ করছে।

সবাই হারিয়ে গেছে যার যার চিন্তাজগতে। রাজকুমারীর চোখে-মুখে চিন্তার ঢেউ।

রাজকুমারী সেনাপতি অজয় কুমার ও তার ছোট ভাই কৃষ্ণকুমারের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালো। তারা দুই ভাইয়ের চোখে নৈরাজ্যবাদী লিপ্সা খেলা করছে। উভয়ের চেহারায় অদৃশ্য অজানা আনন্দের আভার বিস্তৃতি।

কিছুক্ষণ পর প্রধান দরজা দিয়ে একজন বৃদ্ধ প্রবেশ করলো। তার হাতে পিতলের একটি পাত্র। রাজকুমারী, মহারাজা ও উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে অবনত মস্তকে তাকে প্রণাম করলেন। যোগী তার পায়ে কাঠের খড়ম পরেছিলো। তার ডান হাতে পিতলের পাত্র ও বাম হাতে লাঠি। চোখে-মুখে গুরুগম্ভীর ভাব। চেহারায় জ্ঞানগাম্ভীর্যতা। রাজকুমারী অগ্রসর হয়ে তার চরণ স্পর্শ করে বললো– 'আমাদের অনেক সৌভাগ্য আপনি এসেছেন।'

যোগী রাজকুমারীর মাথায় হাত রেখে বললেন– 'আমরা আমাদের বন্ধন ছিন্ন করেছি। আমি প্রভুভক্তির মালা জপি। আমরা দয়া ভোগ করি। তিনিই একমাত্র দাতা। আমি কোনো রাজা-মহারাজার সামনে মস্তক অবনত করতে অভ্যস্ত নই। কিন্তু তোমরা তো মহান দেবী। তোমাদের আত্মা পবিত্র।

www.pathagar.com

তোমাদের জানা আছে, আমি এখানে অনর্থক আসিনি। আমি অন্ধকার ধ্যানাসনে সর্বদা মগ্ন থাকি। ব্রাহ্মণকে স্মরণ করি। নীল গগনের ব্রাহ্মণের জ্ঞান প্রকাশের কারণেই তো আমি তোমাদের রাজধানীতে এসেছি। মহারাজা আমাকে ডাকলেও আমি এ সভায় অবশ্যই উপস্থিত হতাম।'

মহারাজা হাত জোড় করে বললেন– 'যোগীজি! আপনি আসন গ্রহণ করুন।' কক্ষের বিছানায় বসতে বসতে যোগী বললেন– 'সোনা-রুপার চেয়ারে বসা আমার মাটির দেহের জন্য অনুচিত, মহারাজ!'

রাজকুমারী হাত জোড় করে বললো– 'আমাদের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটাতে আপনি অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও আসন গ্রহণ করুন।'

যোগী রাজকুমারীর জোড়া হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'যদি এটা তোমার আদেশ হয়, তাহলে আমি অমান্য করবো না।'

রাজকুমারী যোগীর হাত ধরে আসনে বসিয়ে দিয়ে বললো– 'এটা আমার আশা; আমি হুকুম করার যোগ্যতা রাখি না।' বৃদ্ধ যোগী স্নেহভরে রাজকুমারীর মাথায় হাত বাখলেন এবং আসন গ্রহণ করলেন।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মহারাজা বললেন– 'যোগীজি! আপনার ধ্যান-জ্ঞানের সাহায্যে আমাদের এ কঠিন সময় থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি, তার উপায় বলে দিতে হবে। এ সময়ে বাংলার হিন্দু জাতি বড়ই দুঃখে-কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। তাদের সাহায্য করতে তারা আমাদের স্মরণ করেছে। আমরা এখন বাংলায় হামলা করতে চাই। এ ব্যাপারে যদি আপনি একটু কষ্ট করতেন! আমরা আমাদের মতো করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। কিন্তু মনে হচ্ছে, রাজকুমারীর কাছে আমাদের সিদ্ধান্ত পছন্দ হয়নি।'

বৃদ্ধ যোগী মৃদ হেসে রাজকুমারীর দিকে তাকালেন। যোগীর জাদুময়ী দৃষ্টি ছিলো। তিনি রাজকুমারীর দিকে তাকিয়ে বললেন– 'রাজকুমারী! তুমি কি তোমার পিতাকে রুখে দিতে চাচ্ছো?'

রাজকুমারী বললো– 'আমি রক্তারক্তিকে ভালো মনে করি না। আমি জগৎজুড়ে সম্প্রীতি, অসাম্প্রদায়িকতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে পছন্দ করি।'

যোগী মুচকি হেসে বললেন– 'তুমি তো প্রেমের দেবী। তোমার মতামত ও সিদ্ধান্তে তোমার আত্মার রঙ মিশে আছে। কিন্তু চিন্তার দরকার নেই। এ মুহূর্তে তোমার পিতা মহারাজকে তার চাহিদা অনুসারে চলতে দাও।

www.pathagar.com

মহারাজা তার জীবনের একটা বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ওপর চলতে যাচ্ছেন। তুমি এটাকে ভগবানের মঙ্গল ভেবে নাও। অনেক বড় একটা বিপ্লব হতে চলেছে। আকাশে বড় বড় ও অবিশ্বাস্য সিদ্ধান্ত হচ্ছে। আমি আসাম ও বাংলার উভয় সীমান্ত চৌকি ভেঙে পড়তে দেখছি। যেমনভাবে রাতের অন্ধকারের গভীরতা থেকে আলোর দেবতা জন্ম নেয়, ঠিক ওরকমই মহারাজা জয়ধ্বজ সিং মৃত্যুর ভয়াল থাবা থেকে এক নতুন উপাখ্যান জন্ম দিতে যাচ্ছেন। যখন মহারাজা বাংলা থেকে ফিরে আসবেন, তখন তার মনোভাব খুবই অসন্তুষ্ট থাকবে। অতঃপর কক্ষের ছাদের দিকে তাকিয়ে খুব গাম্ভীর্যভাব নিয়ে বললেন– 'মেঘ আসবে। নীলাকাশের কোথাও গোপন থাকা মেঘ অবশ্যই আসবে। কোথাও সম্প্রীতির বৃষ্টি ঝরবে। আর কোথাও দুর্ভিক্ষের বজ্রপাত হবে। আমি জানি, কোথায় বৃষ্টি হবে, আর কোথায় বজ্রপাত হবে।'

যোগী দাঁড়িয়ে বললেন– 'রাজকুমারী! তোমার পিতাকে সঙ্গ দাও। তোমার পিতা মহারাজ দেবতার সমান।'

যোগী ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি বলে বলে চলে যান।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর মহারাজ রাজকুমারীকে বললেন– 'আশা করি, আমার মেয়ের ব্যাকুল মন এবার শান্ত হয়েছে।'

রাজকুমারী মহারাজার কাঁধে মাথা রেখে বললো– 'হ্যাঁ, পিতাজি মহারাজ! এখন আমার মন শান্ত।'

এরপর শুরু হয়ে যায় আসাম সেনাবাহিনীর রণপ্রস্তুতি পর্ব। বেশ কদিন ধরে অস্ত্র তৈরির কারিগররা রাত-দিন একাকার হয়ে তরবারি, ঢাল, তিরসহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র তৈরি করতে থাকে। রাজধানীজুড়ে চলতে থাকে যুদ্ধের প্রস্তুতি। মহারাজা নিজেই এসবের তদারকি করতে থাকেন। তার এক নির্দেশেই আসামের জঙ্গি ও পাহাড়ি গোত্রগুলো রাজধানীতে রণপ্রস্তুতি নিয়ে সমবেত হতে থাকে। বড় নির্দয় ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী এসব গোত্র দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসেবে জগৎজুড়ে কুখ্যাত। ডাকাতি, রাহাজানি ও আত্মসাৎ করাই মূলত তাদের পেশা।

একদিন আসামের মহারাজা মহাত্মা কাশিরাম এবং অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ করে বললেন– 'আমরা যুদ্ধের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছি।

www.pathagar.com

আমাদের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। সবাই এখন আমার অপেক্ষায়। আপনাদের আজ চলে যাবার আজ্ঞা দেয়া হলো। আমরা বাংলার গোটা হিন্দু জাতিকে আমাদের সঙ্গী হিসেবে পেতে চাই। হিন্দুদের মাঝে আত্মচেতনাবোধ জাগ্রত করুন। মুক্তির উন্মাদনা সৃষ্টি করে তোলাই এখন আপনাদের কাজ। কোনো প্রকার কালবিলম্ব না করে আপনাদের পেছনে পেছনেই আমরা বাংলা অভিমুখে আসছি। হয়তো আগামীকালই আমাদের সেনাবাহিনীর প্রথম বহরটি রওনা হবে। আমাদের প্রথম ঘাঁটি হবে ভদ্রেক– যা বিমলা দেবীর জন্মস্থান। সর্বাগ্রে এ বসতিতেই আমরা বিজয় নিশান ওড়াতে চাই। ইতোপূর্বে মুসলমানরা সেখানে বিজয় নিশান উড়িয়ে হিন্দু জাতির সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলো।'

মহাত্মা কাশিরাম সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন– 'মহারাজ! আমরা দেবতা ভগবানের মহাত্মা, মহাদেব, ভক্ত ও পূজারিদের বাংলার আনাচ-কানাচে মুক্তির আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে পাঠিয়ে দিয়েছি। ওরা যথাযথভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতিকে খেপিয়ে তুলছে।'

www.pathagar.com

যুদ্ধের নাকারা

নাদের খান হাশিম ও মোহনকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তোমাদের কি স্মরণ আছে, কামিনীকে আমি আমার কন্যা মনে করি! এই হতভাগা কী দুর্দশায় আছে, কে জানে? এদিকে আমরা তো বেশ খুশি, কিন্তু আমার মেয়ে হয়তো নিঃস্ব হয়ে আমাদের পথের দিকে চেয়ে আছে।'

অনেক কষ্টে তিনি চোখের পানি সংবরণ করে রাখেন। এরপর তিনি এদের ভদ্রেক অভিমুখে দ্রুত রওনা হতে বললেন এবং রক্তপিপাসু মহারাজার রক্তনখরের থাবা থেকে কামিনীকে মুক্ত করে আনতে নির্দেশ দিলেন।

মোহন, হাশিম ও শেখর পঞ্চাশ-ষাটজনের একটি বাহিনী নিয়ে দুপুরের আগেই ভদ্রেকের উদ্দেশে রওনা করে। সেখানে যাওয়ার সহজ পথের পরিবর্তে তারা পাহাড়ি দুর্গম পথ দিয়ে সন্ধ্যার আগেই ভদ্রেক পৌঁছে যায়।

একটি পর্বতচূড়ায় ঘোড়া থেকে নেমে সাথিদের উদ্দেশে হাশিম বললো– 'আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি। এ মুহূর্তে আমরা ভদ্রেকের পশ্চিম সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছি।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে শেখরের কাঁধে হাত রেখে বললো– 'তুমি সব সাথিকে নিয়ে এখানেই অবস্থান করবে এবং আমার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। মোহন আমার সঙ্গে থাকবে। ভোরের আগেই আমরা ফিরে আসবো। খুব বেশি দেরি হলে দুপুর হতে পারে। দুপুর পর্যন্ত তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। এ সময়ের মধ্যে যদি আমরা ফিরে আসতে না পারি, তাহলে ভেবে নেবে যে আমরা গ্রেফতার হয়ে গেছি কিংবা নিজ লক্ষ্যপূরণে শহিদ হয়ে গেছি।'

www.pathagar.com

এই কথা বলে হাশিম ও মোহন তার সাথিদের কাছ থেকে বিদায় নেয়।

ইতোমধ্যে মহারাজা জয়ধ্বজ সিং তার মন্ত্রী, উজির ও সেনাদের নিয়ে পৌঁছে গেছেন ভদ্রেক গ্রামে। কামিনীদের বাসভবনে মহারাজা অবস্থান করছেন। সেনারা গোটা গ্রামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তারা রাত কাটানোর সঙ্গীর সন্ধানে প্রতিটি বাড়ি তল্লাশি চালাচ্ছে। প্রতিটি ঘর থেকে কুমারী তরুণীদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেনাছাউনিতে।

হাশিম ও মোহন আসাম বাহিনীর ছাউনির পাশ ঘেঁষে কামিনীদের বাসভবনের কাছে চলে আসে চুপিসারে। এখানে মহারাজা সোনালি আসনে বসে সেনাপতি অজয় কুমারের সাথে একান্তে আলাপ করছেন। যুদ্ধের বিস্তারিত কৌশল ও পরিকল্পনা সম্পর্কে কথাবার্তা চলতে থাকে। মহারাজা বললেন– 'আমি চাই, এই দেশ থেকে মুসলমানদের এমনভাবে নির্মূল করে দেয়া হোক, যাতে তাদের পেছনে কান্না করার মতো কোনো লোক না থাকে।'

অজয় কুমার অবনত মস্তকে বললো– 'এমনই হবে।'

মহারাজা বললেন– 'এখন তুমি বিশ্রাম নাও। প্রতাপ! তুমি বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে খুব ভোরে নাদের খানের বসতিতে আক্রমণ করবে। যেভাবেই সম্ভব হয় বিমলা দেবী এবং তার পিতাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে। আমরা গোহাটির দিকে রওনা হবো। শুনেছি বাংলার হাকিম ওদিক দিয়ে আসছে।'

সেনাপতি অজয় কুমার কামিনীদের ঘরের নিচতলায় আসন গেড়েছে। এদিকে একই ভবনের ওপরতলায় অবস্থান করছে রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত। আগেই কামিনীকে একটি কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো। আসাম বাহিনীর লাম্পট্য ও অনাচার সম্পর্কে ভালোই অবগত ছিলেন রাজকুমারী। তাই সে কামিনীকে রাতে নিজের সঙ্গে রাখে, যাতে রাতের বেলা কেউ তাকে উত্ত্যক্ত করতে না পারে।

এদিকে সেনাপতি অজয় কুমার অতিরিক্ত মদপান করে মাতাল হয়ে পড়ে। যে করেই হোক রাতে সে কামিনীকে শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে পেতে চায়! কামিনীকে ধরে নিয়ে আসতে সে বন্দীখানায় দুজন সৈন্য পাঠায়। সৈন্যরা বন্দীখানায় এসে দেখে কামিনী এখানে নেই। প্রহরীকে জিজ্ঞেস করলে সে জানায়– কামিনীকে রাজকুমারী নিয়ে গেছে। সৈন্যরা রাজকুমারীর কাছে

www.pathagar.com

গিয়ে সেনাপতির মনোবাসনার কথা জানালে রাজকুমারী তির্যকভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে সৈন্যদের পাঠিয়ে দেয়। এদিকে ভবনের দেয়ালের খুঁটির এক পাশে ওঁত পেতে থাকে হাশিম ও মোহন।

সেনাপতি তার সৈন্যদের কথা শুনে রাগে-ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে রাজকুমারীর কক্ষে এসে জোরপূর্বক রাজকুমারীর ওপর হামলে পড়ে। এতে রাজকুমারীর জামা ছিঁড়ে যায়। মুহূর্তেই এক ধারালো তরবারি দ্বারা সেনাপতির ওপর চরম আঘাত হানে হাশিম। নিমিষেই সে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাপতির প্রাণবায়ু উড়ে যায়।

রাজকুমারী ও কামিনী হাশিম ও মোহনের এ অতর্কিত হামলায় নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে সমর্থ হয়। উভয়ে হাত জোড় করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে হাশিম ও মোহনের প্রতি। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! এরা পালিয়ে যাবার আগেই আসাম সেনাদের হাতে গ্রেফতার হয় হাশিম ও মোহন।

এদিকে রাতভর ভদ্রেকের ঘরে ঘরে চলতে থাকে সম্ভ্রম হারানোর মাতম। ভোরেই এ সংবাদ পৌঁছে যায় নাদের খানের বসতিতে।

নাদের খান বললেন– 'সরদার! মনে হচ্ছে ভদ্রেকের সব ঘরেই সম্ভ্রম হারানোর হাহাকার বইছে! আসাম সেনারা কাউকেই ছাড় দেয়নি।'

এমন সময় এক অশ্বারোহী তার কাছে পৌঁছে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলো এবং নাদের খানকে লক্ষ করে বললো– 'সরদার! আসাম বাহিনীর পঁচিশ-ত্রিশ হাজার সৈন্য বেশ দর্প সহযোগে এদিকে আসছে। সমপরিমাণ সৈন্য ওপর থেকে চক্কর কেটে অগ্রসর হচ্ছে গোহাটি ও সিলেটের দিকে। রাজা জয়ধ্বজ সিং এখনো বিশাল এক সেনাবহরের সাথে ভদ্রেকে অবস্থান করছেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তিনি অবশিষ্ট থেকে যাওয়া সেনাবাহিনীর আগমনের অপেক্ষা করছেন; যারা আসাম থেকে রওনা করার কথা।'

নাদের খান জিজ্ঞেস করলেন– 'হাশিম ও মোহনের ব্যাপারে কোনো সংবাদ আছে কি?'

গুপ্তচর বললো– 'জি। তারা উভয়ে এ মুহূর্তে মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের কয়েদখানায় বন্দী। ওই দুজনের হাতে আসাম বাহিনীর সেনাপতি অজয় কুমার খুন হয়েছিলো।'

www.pathagar.com

নাদের খানের চেহারাজুড়ে হতাশার ছাপ। শঙ্কা খেলা করছে তার চোখে-মুখে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন– 'কামিনীর কোনো খবর?'

'সে-ও জীবিত আছে, তবে বন্দী। মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের একমাত্র কন্যা রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত খুবই সাহসিকতার সাথে হাশিম, মোহন ও কামিনীর পক্ষাবলম্বন করে যাচ্ছে।'

নাদের খান গুপ্তচরের দিকে তাকালেন বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে। তা দেখে সে মুচকি হেসে বললো– 'সরদার! এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? ভালো-মন্দ লোক সব সমাজেই থাকে। রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের ব্যাপারে শোনা যায়, সে বড়ই সত্যনিষ্ঠ, বিবেকবান ও উত্তম চরিত্রের অধিকারিণী। সে তার পিতার ভূমিকায় যারপরনাই বিতৃষ্ণ ও অসন্তুষ্ট, কিন্তু এ ব্যাপারে সে বড়ই অসহায়।'

নাদের খান আদেল খানকে অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে নিজের যুদ্ধের কৌশলের গভীরতার ব্যাপারে অবহিত করে বললেন– 'আমি চাই, তোমার অশ্বারোহী বাহিনী ডানে-বাঁয়ে প্রতিশোধমূলক চরম আক্রমণ করে শত্রুবাহিনীকে ধ্বংস না করে ছাড়বে না।'

ইসমাইলকে তিরন্দাজ বাহিনীর নেতৃত্ব সোপর্দ করা হয়েছে। রিজওয়ান ও শেখরকে দেয়া হয়েছে পদাতিক বাহিনীর দায়িত্ব।

নাদের খান স্বামী মনোহর লালকে সঙ্গে নিয়ে দেয়ালের ওদিকটায় উঁচু সেতুতে দাঁড়িয়ে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন। বহু দূরের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা আসাম বাহিনীর শুকনো মুখ দেখতে পাচ্ছেন তিনি। এদিকে গ্রামের মহিলারা ঘরের ছাদে তিরন্দাজ বাহিনীর জন্য বর্শা বানিয়ে রেখেছে। তারাও শত্রুবাহিনীর পদধ্বনি শোনার অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে চৌকান্না।

সকিনা ও কুলসুম যুদ্ধসাজে সেজেছে। তারা বাইরে বেরিয়ে আসতেই ভদ্রেক থেকে আসা মেয়েরা তাদের গতিরোধ করে বললো– 'সরদারজাদি! আমাদেরও অস্ত্র দিন। আমরা ওই হিংস্র পশুদের কাছ থেকে আমাদের সতীত্ব ও সম্ভ্রম হারানোর প্রতিশোধ নেবো। আমাদের ঝাঁঝরা হওয়া বুকে দুঃখ-ক্ষোভের যে অনল দাউ দাউ করে জ্বলছে, তা তাদের রক্ত ছাড়া কিছুতেই নেভার নয়।'

www.pathagar.com

সকিনা ভালোবাসামিশ্রিত দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে বললো– 'প্রিয় বোনেরা! তোমরা বিশ্রাম নাও। এ সময়ে বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন তোমাদের। দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। তোমাদের ভাই ও পিতারা তোমাদের নিরাপত্তায় মাঠে সতর্ক অবস্থানে আছেন। আমরা তো কেবল উদ্দীপনাচিত্তে এ পোশাক পরেছি।'

সকিনার আম্মা এগিয়ে এসে বললেন– 'ঠিক আছে! লড়াই শুরু হয়ে যাচ্ছে। আপাতত তোমরা বিশ্রাম নাও। প্রয়োজন হলে তোমাদের সকলকে সুযোগ দেয়া হবে।'

***

জঙ্গলের দিকে শুরু হয়ে গেছে দামামার ধ্বনি। ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি, আল্লাহু আকবার ও ইয়া আলি স্লোগানে কেঁপে কেঁপে উঠছে জমিনের কলজে। পদাতিক বাহিনী বেপরোয়া বেগে এগিয়ে চলছে সম্মুখপানে। নাদের খান সিজদাবনত। তিনি খুবই বিনয়ের সাথে কাকুতি-মিনতির সুরে মহান রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে নিজের কামিয়াবির জন্য কান্নাকাটি করে দোয়া করে চলেছেন।

রাতের শেষ প্রহরে ঘটে যায় বিশাল এক অভ্যুত্থান। লক্ষাধিক নেশাগ্রস্ত ও জুয়াড়ি আসাম সৈন্য মৃত্যুর ঘাটে পতিত হয়। আসাম বাহিনীর সেনাপতি খুন হওয়ার সময় মহারাজা জয়ধ্বজ সিংকে মুসলমানদের এই আক্রমণের খবর দেয়া হলে তিনি হাশিম, মোহন ও কামিনীকে বন্দী করার নির্দেশ দেন এবং নিজে দ্রুত আশ্রয় নেন ছাউনিতে। এখনো সেখান থেকে কান্নার রোল ভেসে আসছে। পাগলা কুকুরের মতো এদিক-ওদিক দৌড়ে পালাচ্ছে আসাম বাহিনী। মুসলমান মুজাহিদরা যথেষ্ট প্রভাবক ও ফলপ্রসূভাবে অভ্যুত্থানের কার্যদক্ষতা দেখিয়ে যাচ্ছে। তারা বিশ বিশ সদস্যের গ্রুপ বানিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে। সকলেই ঢাল-তরবারিতে সজ্জিত। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র ঘোড়া দৌড়াচ্ছে এবং আসাম সেনাবহরের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বীরবিক্রমে। এভাবে গোটা সেনাছাউনিতে পড়ে যাচ্ছে মৃত্যুর রোল।

www.pathagar.com

যখন মহারাজা জয়ধ্বজ সিং ছাউনিতে পৌঁছলেন, তখনো পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের কাজ ভালোমতো আঞ্জাম দিয়ে দূরে বেরিয়ে পড়েছিলো। ভোর পর্যন্ত খুবই টালমাটাল অবস্থায় মহারাজা জয়ধ্বজ সিং তার সেনাছাউনির অব্যবস্থাপনা দূর করতে সক্ষম হন। তিনি বেশ কজন নেতার পরামর্শে নিহত অজয় কুমারের স্থলে তার ছোট ভাই কৃষ্ণকুমারকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন।

মহারাজা ভোরে ভোরে প্রতাপের নেতৃত্বে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার সৈন্যের একটি বহর নাদের খানের বসতির দিকে পাঠানোর প্রাক্কালে প্রতাপকে বললেন– 'আমরা আশাবাদী, তোমরা খুব দ্রুত নাদের খানের বসতির দেয়ালগুলো ধ্বংস করে সম্পূর্ণ বসতি নিজেদের তরবারির তীক্ষ্ণ ফলায় ভেড়া-বকরির মতো মৃত্যুর ঘাটে নিক্ষেপ করবে। তারপরও সতর্কতাস্বরূপ অন্য প্রান্ত থেকে আরেকটি বাহিনী ঘনশ্যাম ঠাকুরের নেতৃত্বে তোমাদের সাহায্যের জন্য পৌঁছে যাবে। আমি চাই, আগত রাতটি যেন নাদের খানের বসতিবাসীর জন্য হয় শেষ রাত। সম্ভব হলে ওই দেবী এবং তার ধর্মত্যাগী পিতাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে। জগন্নাথ দেবতার মহাত্মা পূজারির কামনাও তা-ই।'

প্রতাপ বুকে ডান হাত রেখে বললো– 'রাজাজি! আপনার আস্থা ও বিশ্বাসের চেয়ে অধিক সফলতার সংবাদ শুনবেন। আমরা নাদের খানের বসতিবাসীর জীবনকে শ্মশানভূমির নিস্তব্ধ নির্জনতায় পরিণত করে ছাড়বো।'

মহারাজা জয়ধ্বজ সিং জগন্নাথ মন্দিরের বড় পূজারির দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মহাত্মাজি! আমি চাই, আপনিও এ বহরের সঙ্গে যান এবং নিজ চোখে তাদের মৃত্যুর তামাশা দেখুন– যারা আমাদের পূজারিদের জীবন সাঙ্গ করেছে।' এরপর কী যেন ভাবতে গিয়ে মহারাজা বললেন– 'আমি ওই পূজারির ব্যাপারে বড়ই শঙ্কাবোধ করছি– যাকে আপনি গোয়েন্দাবৃত্তি ও নাদের খানের বসতির হিন্দুদের সহমর্মিতা অর্জনের জন্য পাঠিয়েছিলেন।'

মহাত্মা বললেন– 'আমার বিশ্বাস, ভগবানের কৃপায় আমাদের লোক সফল হয়েছে। আক্রমণের সময় সেখানকার হিন্দু বসতির ভেতর থেকে বিদ্রোহ করে সে আমাদের বুকে এসে ঠাঁই নেবে।'

মহারাজা মুচকি হেসে বললেন– 'যদি এমনই হয়ে থাকে, তবে রাতের অন্ধকারের পরিবর্তে আজকের দিনের আলো থাকতেই নাদের খানের বসতিকে ধূলিসাৎ করে দেয়া দরকার।'

www.pathagar.com

প্রতাপ পশ্চিম দিক দিয়ে নাদের খানের বসতির দিকে আক্রমণের উদ্দেশে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যাত্রা শুরু করলো।

***

দিনের এক প্রহর অতিবাহিত হলে আসাম বাহিনীর দেখা মেলে। রিজওয়ান ও শেখরের পদাতিক বাহিনী ডানে-বাঁয়ে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে সামনের দিকে। দেয়ালের ওপর তৈরি সেতুতে তিরন্দাজরা তাক করে রেখেছে কামান। হেকিম হোসাইনি বেগ ও তার শাগরেদরা বসতির গেটের কাছে স্থাপন করেছে চিকিৎসা সহায়তাকেন্দ্র। আনুমানিক পাঁচ-ছয়শ পানির পাত্রবাহক বড় বড় পাত্রে পানি ভরে নিচ্ছে। কামার ও কারিগরদের ভাটা থেকে ধোঁয়ার সর্পিল কুণ্ডলী উঠে উঠে মিশে যাচ্ছে বাতাসে। গরমের তীব্রতা আর আগুনের তাপের তোয়াক্কা না করে কারিগররা তাদের যন্ত্রের সাহায্যে তরবারি ও ঢাল তৈরির কাজে নিমগ্ন।

বসতির লাজুক শালীন মেয়েরা এবং শিষ্টাচারে ও শালীনতার কোলে বেড়ে ওঠা যুবতী কন্যারা মুজাহিদদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছানোর কাজকে নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছে। তারা ইতোমধ্যে অস্ত্র তৈরির কারিগরদের কাছে এসে পৌঁছেছে। হিন্দু মেয়েরাও এই যুদ্ধে মোটা দাগে অংশ নিয়েছে।

এদিকে বেজে উঠেছে যুদ্ধের দামামা। নারায়ে তাকবিরের গগনবিদারী শব্দে বিশ্ব পালনকর্তার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ধ্বনিতে দিগ্‌বিদিক মুখরিত।

কদম কদম দূরত্বে অগ্রসরমান রিজওয়ান ও শেখর তাদের পদাতিক বাহিনীর সাথে আসাম সেনার সামনে গিয়ে পৌঁছেছে। বসতি থেকে আনুমানিক দুই মাইল দূরে তরবারির সাথে তরবারির আঘাত শুরু হয়ে গেছে। ইয়া আলি ইয়া আলি'র স্লোগান কম্পন ধরিয়ে দিয়েছে শত্রুর পায়ের তলার মাটিতে। আসাম বাহিনী সমন্বিত হয়ে লড়াই করার সুযোগই পাচ্ছে না। প্রতাপ ও অন্য নেতারা বারবার চিৎকার করে সৈনিকদের লড়াই চালিয়ে যেতে উদ্দীপনা জাগিয়ে যাচ্ছে। জগন্নাথ মন্দিরের পূজারি উচ্চস্বরে মন্ত্র জপেই চলেছে। দিনের আলো বাকি থাকা পর্যন্ত যুদ্ধের ফলাফল উভয় দিকে বরাবরই ছিলো।

এরপর মুসলমানরা পূর্ব কৌশলের আলোকে কিছুটা পিছু হটতে শুরু করে। এতে আসাম বাহিনী বিভ্রান্তির শিকার হয়। তারা এটাকে মুসলমানদের

www.pathagar.com

পরাজয় কল্পনা করে নিজেদের সারিতে এলোমেলো হয়ে পড়ে। কিছুটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মুসলমানরা পেছনে এসে আসাম বাহিনীকে তিরন্দাজ বাহিনীর তির নিক্ষেপকেন্দ্রে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। যেমন কৌশল তেমন ফল। বৃষ্টির মতো তির এসে আসামের হায়েনাদের চালনি বানিয়ে ছাড়ছে। তাদের অগ্রসরমান কদম থমকে যায় এবং তারা পেছনে ছুটতে শুরু করে দ্রুতবেগে।

ছোট ছোট বাচ্চা ও মহিলারা তিরন্দাজদের তূনীরে তির ভরে ভরে দিয়ে যাচ্ছে। পানির পাত্র বহনকারীরা খালি পায়ে তীব্র গরম ও ভীষণ উত্তপ্ত জমিনের পরোয়া না করে যুদ্ধের ময়দানে দৌড়ে দৌড়ে মুজাহিদ, গাজি ও আহতদের পানি পান করাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নাদের খান ও স্বামী মনোহর লাল উঁচু একটি সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করছেন।

দিন শেষে ঘনশ্যাম ওপর থেকে নদী পার হয়ে বসতিতে হামলা করে বসলো। মুসলমানরা বসতির নিরাপত্তার জন্য চতুর্দিক থেকেই ছিলো হুঁশিয়ার। তরবারির বিধ্বংসী ঝংকার, তিরের তীব্র ঝাঁজালো বিচ্ছুরণ এবং নারায়ে তাকবিরের গগনবিদারী চিৎকার কেয়ামতের এক কঠিন দৃশ্য সৃষ্টি করে রেখেছে।

মৌসুমটা গরমের। সূর্যটা আগুনের মতো তাপ বর্ষণ করছে। বাতাস বন্ধ। পুরুষের পোশাক পরা মেয়েরা তিরের বর্শা তৈরি করছে। আহত ও শহিদদের উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বসতির দিকে। আহতদের হেকিম হোসাইনি বেগ ও তার শাগরেদদের কাছে সোপর্দ করা হচ্ছে। শহিদদের ঢেকে রাখা হচ্ছে নির্দিষ্ট স্থানে সাদা চাদরে। এসব কাজ মেয়েরাই করে যাচ্ছে। তাদের চক্ষুগুলো অশ্রুতে টলমল কিন্তু চেহারাজুড়ে দীপ্ততার দৃঢ় ছাপ।

ময়দানে আসাম বাহিনীর অসংখ্য লাশ পড়ে আছে। আসাম সেনারা বুনো বাঁদরের মতো বারবার প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করছে। তারা গাছ দিয়ে লম্বা লম্বা সিঁড়ি বানাবার ব্যর্থ কসরত করে যাচ্ছে। সেই সিঁড়ির সাহায্যে প্রাচীর টপকানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু চৌকস মুসলিম তিরন্দাজ বাহিনীর বিচক্ষণ সেনা ও বর্শাবাজরা তাদের সেই আশার গুড়ে বালি ঢেলে দিচ্ছে। কখনো কখনো তো এতো কঠিন ও ব্যাপকহারে তির ছোড়া হয় যে, এতে করে মাটিতে ছায়া পড়ে যেতে দেখা যায়। আবার

www.pathagar.com

কখনো কখনো দেয়ালের কাছে চলে আসা আসাম সেনাদের গায়ে ঢেলে দেয়া হচ্ছিলো ফুটন্ত গরম তেল।

নাদের খান বারবার সূর্যের দিকে তাকাচ্ছেন। সম্ভবত তিনি সূর্য ডোবার অপেক্ষা করছেন। এখনো সূর্যাস্তের রক্তিম আভা রাতের গহিনে হারায়নি। রণাঙ্গন প্রচুর গরম। নাদের খান প্রাচীরঘেঁষা সেতুতে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে ফিরে রহস্যভরা চোখে কী যেন খুঁজছেন। অন্ধকার কিছুটা ঘন হয়ে গেলে সেতুর ভেতরে তিনি অনুভব করলেন এক বিশেষ ধরনের কম্পন।

তিনি স্বামী মনোহর লালকে বললেন– 'স্বামীজি! এখন তাদের আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে। ইসমাইলকে জানিয়ে দিন, আমি যুদ্ধের ময়দানের দিকে যাচ্ছি।'

নাদের খান তার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বর্শা, ঢাল ও তরবারি নিয়ে যুদ্ধমাঠে পৌঁছে গেলেন। আসাম বাহিনী এখনো পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত। তারা বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ করে যাচ্ছে।

রিজওয়ানের কাছে পৌঁছে নাদের খান বললেন– 'এখন শেষ এবং সর্বাত্মক আক্রমণের সময় এসে গেছে।'

ধুলোয় ধূসরিত আকাশের কোথাও কোথাও চিকচিক করছে তারকারাজি। এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে দ্রুতগতিতে ধেয়ে আসা দুইশ অশ্বারোহীর একটি বাহিনী এক হাতে লম্বা লম্বা বর্শা নিয়ে এগিয়ে আসছে। এসেই তারা তীব্র বেগে বর্শা ছুড়ে মারছে আসাম বাহিনীর দিকে। এই আক্রমণ এতোটাই ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্লঙ্ঘনীয় ছিলো যে, এতে করে আসাম সেনাদের মাঝে দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা। মুসলমান বীরবাহিনী বিপুল বিক্রমে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সুযোগে আসাম বাহিনী পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে যাবে, ঠিক ওই মুহূর্তে পেছন দিক থেকে সমপরিমাণ মুসলিম ঘোড়সওয়ার যোদ্ধা তুমুল আক্রমণ করে বসে। এই বাহিনীর আক্রমণের ধারাবাহিকতা চালু রয়েছে খুবই সুশৃঙ্খলভাবে। দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন আদেল খান, যাদের এই সময়ে যুদ্ধের ময়দানে বীর বিক্রমে লড়াই করার জন্য মনোনীত করা হয়েছিলো।

রাতের প্রথমাংশ। এমন সময়েই আসাম বাহিনীর কদম থমকে যায়। প্রাচীরের ওপর প্রজ্জ্বলিত মশাল এবং কুণ্ডলীর আলোতে লোকজন আসাম

www.pathagar.com

বাহিনীর করুণ পরিণতি দেখে চলেছে। ভদ্রেক থেকে আসা মেয়েদের চোখে ঝরছে অশ্রু। এ অশ্রু আনন্দের।

***

একদিকে মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের আনুমানিক ত্রিশ হাজার সৈন্য প্রতাপ ও ঘনশ্যাম ঠাকুরের নেতৃত্বে নাদের খানের বসতিকে জয় করার জন্য ভয়াবহ রক্তাক্ত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে সেদিন দুপুরবেলা নিহত অজয় কুমারের শবদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শ্মশানভূমির দিকে। সেই শোক মিছিলে নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, মন্ত্রিপর্ষদ ও রাজ্যের অন্যান্য কর্তাব্যক্তি ছাড়াও শরিক ছিলেন স্বয়ং মহারাজা জয়ধ্বজ সিং। শবযাত্রার সম্মুখভাগে আসাম ও বাংলার ধর্মীয় পণ্ডিতেরা উচ্চস্বরে বিভিন্ন শ্লোক ও ভজন গেয়ে যাচ্ছেন। শবমিছিলটি ভদ্রেকের বিভিন্ন গলি অতিক্রম করে শ্মশানে পৌঁছায়। ওখানে চন্দন গাছ দিয়ে চিতা তৈরি করা হয়েছে। কজন পণ্ডিত শুরু থেকে ওখানে উপস্থিত। অজয় কুমারের শবদেহ রাজকীয় সম্মানে রাখা হয়েছে চিতাখোলায়। পণ্ডিত ও জগন্নাথ দেবতার পূজারিরা ধর্মীয় শাস্ত্রের বিধিবিধান পালন করা শুরু করে দিয়েছেন।

শবদেহের নিচে রাখা লাকড়িতে আগুন লাগানোর সময় হলে অজয় কুমারের ভাই কৃষ্ণকুমার– যার হাতে এখন আসাম বাহিনীর সেনাপতিত্ব অর্পণ করা হয়েছে– এগিয়ে এসে এক হাত চিতার ওপর উঁচু করে তুলে ধরে বললো– 'ভাই! আমি আপনার আত্মার সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি যে, আমরা খুব দ্রুত আপনার খুনিদের খুন করে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আগুনে সেদ্ধ করে নিজ হাতে কুকুরকে খাওয়াবো।'

মহারাজার ইশারায় চিতার লাকড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। মুহূর্তেই অজয় কুমারের লাশ হারিয়ে যায় আগুনের লেলিহান শিখা আর ধোঁয়ার সর্পিল কুণ্ডলীতে। বাতাসে চন্দনের ঘ্রাণের সাথে ছিলো মানুষের শরীর পোড়ার বিশেষ গন্ধও। উপস্থিত সকলের মাথা অবনত। অন্তর বিষণ্ন। ভদ্রেকের হিন্দুরাও শরিক আছে এই শবমিছিলে। কিন্তু তাদের মন্তব্য ও ধারণা অন্যদের চেয়ে ভিন্ন। তাদের চেহারাজুড়ে খুশির আমেজ– যা তারা লুকানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভদ্রেকবাসীর অন্তরে আসাম বাহিনীর দুর্ব্যবহার গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। তারা তাদের মা-বোনদের ইজ্জত নিয়ে

www.pathagar.com

ছিনিমিনি খেলার দোষে এদের ঘৃণার চোখে দেখছে। কিন্তু রাজার শক্তির সামনে সবাই নিশ্চুপ। হিন্দু পণ্ডিত ও পূজারিরা জ্বলন্ত শবদেহের আশপাশে দ্রুতবেগে চক্কর দিয়ে যাচ্ছে এবং নিজেদের পাত্র থেকে সাদা ধরনের কী যেন ভরে ভরে চিতার ওপর ফেলছে। ধীরে ধীরে কমে আসে আগুনের তীব্রতা। নিমিষেই নিরুদ্দেশ হয়ে যায় অজয় কুমারের লাশ।

***

যখন অজয় কুমারের লাশ কামিনীদের বাসভবন থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, তখন রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখছিলো এই দৃশ্য। তার পিতাজি মহারাজ খালি মাথায় শবদেহের সাথে সাথে যাত্রা করলে বিড়বিড় করে আনমনে চন্দ্রকান্ত বলতে লাগলো– 'তাহলে কি আমাদের ওপর নির্যাতন, বর্বরতা ও সম্ভ্রমহানির ব্যাপারে পিতাজি মহারাজার আক্ষেপ নেই!'

গভীর চিন্তায় ডুবে যায় সে। এরপর হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ে অজয় কুমারের ভাই কৃষ্ণকুমারের দিকে। উভয়ের চোখাচোখি হয়। ভীতি ছড়িয়ে পড়ে তার মনে। সে কাঁপতে থাকে। কৃষ্ণকুমারের ভয়াল চোখে ক্ষোভের আগুন। রাজকুমারীর সারা দেহ আবারও একবার কেঁপে উঠলো। কিন্তু সে সামলে নেয় নিজেকে। ভিন্ন কিছু চিন্তা করতে করতে সে খুবই গাম্ভীর্য ও রাজসিক ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে বেলকনি থেকে নেমে ভবনের নিচে নির্মিত কয়েদখানার দিকে অগ্রসর হয়। কয়েদখানার দরজায় দুজন সশস্ত্র সৈন্য পাহারারত। রাজকুমারীকে দেখে তারা হাঁটু গেড়ে বসে রাজকুমারীর পায়ে চুমু খায়। রাজকুমারী দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলে তারা উঠে দাঁড়ায়।

রাজকুমারী রাজকীয় গাম্ভীর্যের সাথে বললো– 'দরজা খোলো! আমি বন্দীখানা দেখতে চাই।' সৈন্যরা হাতে হাত ধরে সমস্বরে বলে উঠলো– 'রাজকুমারীজি! আমরা অপারগ। আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে কাউকে বন্দীখানার দরজা পর্যন্তও আসতে দেয়া না হয়।'

রাজকুমারী রাগতস্বরে বললো– 'আমার দিকে তাকাও! আমাকে ভালো করে চিনে নাও! আমি রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমিই তোমাদের বন্দীখানার দরজা খোলার নির্দেশ দিচ্ছি!'

www.pathagar.com

একজন সৈন্য রাজকুমারীর পায়ের ওপর মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বললো– 'রাজকুমারী! আমরা ভালো করেই আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি আমাদের মস্তক ছিন্ন করে দিন, কিন্তু তবু আপনার এই নির্দেশ উঠিয়ে নিন। এ ব্যাপারে আমরা খুবই অপারগ।'

রাজকুমারী এবার কোমলতার আশ্রয় নিয়ে বললো– 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কেউ জানতেও পারবে না তা। আগে এটা বলো যে, এই কঠিন দায়িত্ব ও কড়া পাহারার নির্দেশ তোমাদের কে দিয়ে রেখেছে?'

সিপাহিদের একজন বললো– 'সেনাপতি কৃষ্ণকুমার এই নির্দেশ দিয়েছে। আপনি তো ভালো করেই জানেন, সে কতোটা জালেম ও নির্দয়।'

রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত মুক্তার দুটি গহনা গলা থেকে খুলে একটি একটি করে দুই সিপাহির হাতে দিয়ে বললো– 'আমি তোমাদের আরো পুরস্কৃত করবো এবং বিশ্বাস রেখো, এই ব্যাপারটি কেউ জানতেও পারবে না।'

সিপাহির একজন আরেকজনকে লক্ষ করে বললো– 'তুমি একটু বাইরে গিয়ে যাতায়াতকারী লোকদের দিকে খেয়াল রেখো।'

সিপাহি দরজা খুলে দিলে রাজকুমারী বললো– 'তুমি এখানেই দাঁড়াও। আমি খুব দ্রুত এখান থেকে চলে যাবো। আচ্ছা, আগে বলো তো বন্দীখানায় সর্বসাকল্যে কয়জন কয়েদি আছে?'

সিপাহি বললো– 'তিনজন। তাদের মধ্যে দুজন পুরুষ, একজন মেয়ে। শুনেছি, মেয়েটি নাকি এই ভবনের মালিক এবং এই বসতির প্রয়াত সরদারের বোন।'

বন্দীখানার দরজা খোলার কটকট শব্দে হাশিম, মোহন ও কামিনী নড়েচড়ে বসে। তিনজনকে পৃথক পৃথক নির্জন ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখা হয়েছে। রাজকুমারী চন্দ্রকান্তকে দেখে তিনজনই অবাক হয়ে যায়।

রাজকুমারী প্রথমে কামিনীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন আছো, কামিনী?'

কামিনী শান্ত সুরে রাজকুমারীর দিকে তাকিয়ে বললো– 'ঠিক আছি।' 'আপনি কেমন আছেন?' কামিনী জানতে চাইলো।

www.pathagar.com

রাজকুমারী বললো– 'আমি সম্ভবত তোমাদের সকলের চেয়ে দুঃখী ও দুর্দশাগ্রস্ত। এসব কথা রাখো, আগে বলো– এই বসতিতে এমন কেউ কি আছে, যার ওপর তুমি ভরসা রাখতে পারো? যে তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে?'

কামিনী কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো– 'হয়তো এমন কেউ নেই। কেননা, বসতিবাসী আমাদের মুসলমানদের দূত ও সাহায্যকারী মনে করে।'

রাজকুমারী বললো– 'আমার হাতে সময় খুবই কম। বিস্তারিত কথা বলা সম্ভব নয়। যেভাবেই হোক পরিস্থিতি এখন পাল্টে গেছে। আমাদের নির্মম ও নির্দয় সেনারা তোমাদের বসতির প্রতিটি ঘরের সম্ভ্রম নষ্ট করে দিয়েছে। বসতিবাসীর মন এখন ঘৃণায় ভরা। তাদের চোখ খুলে গেছে। সবাই প্রতিশোধের আগুনে পুড়ছে। শুনেছি, তারা খুবই উদ্বেগ নিয়ে মুসলিম বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করছে। গত রাতের সফল অভ্যুত্থান তাদের আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তুমি আমাকে এটা বলো যে, এ সময়ে এমন কে আছে– যার ওপর তুমি ভরসা রাখতে পারো?'

কামিনী কিছুক্ষণ ভেবে বললো– 'কিন্তু আপনি কী করতে চান?'

রাজকুমারী বললো– 'বেহুদা প্রশ্নের সময় এখন নয়। আমি যা জানতে চেয়েছি তার জবাব দাও।'

কামিনী বললো– 'বসতিতে মৌয়াল রাজগোপালের ওপর আমার পিতাজির বহু অনুগ্রহ আছে। আমার ধারণা, সে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে।'

'ঠিক আছে'। রাজকুমারী এটুকু বলে সামনে এগোলো। এরপর সে হাশিমের সেলের সামনে গিয়ে পৌঁছালো। মোটা মোটা শিকলে বাঁধা কম্পিত হাত ধরে বললো– 'আমাদের পরদেশি।'

এরপর সে আর কিছুই বলতে পারছে না। মুক্তাদানার মতো তার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে সেলের শিকলে।

হাশিম অবনত মস্তকে বললো– 'পুণ্যাত্মা রাজকুমারী! আমার নাম হাশিম। আমি গোহাটির কেল্লাদার ফিরোজ খানের ছেলে। আমার অন্য সাথির নাম মোহন। সে আমার চাচা নাদের খানের বসতির বাসিন্দা। আমরা কামিনীকে উদ্ধার করার জন্য এসেছিলাম। পরশু এখান থেকে একজন পূজারি কীভাবে যেন সরদার নাদের খানের বসতিতে ঢুকে পড়ে। ওখানকার হিন্দুদের মাঝে

www.pathagar.com

বিদ্রোহ ছড়াতে প্ররোচনা দেয়ার উদ্দেশ্যে সে ওখানে যায়। কিন্তু হিন্দুরা তাকে ধরে সরদার নাদের খানের সামনে হাজির করে। তার মাধ্যমে জানা যায় যে, বসতিবাসী কামিনীকে গ্রেফতার করে রেখেছে। কেননা তাদের পূর্ণ বিশ্বাস, সে দেবী– যে কিনা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে– তাকে জোর করে তুলে নেয়ার ঘটনা মুসলমানদের কাছে পৌঁছায় এই কামিনী। এটা সম্পূর্ণ সত্য যে, কামিনীও তার মতো উত্তম চরিত্র ও মানবতার সম্মান রক্ষার্থে আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত।'

রাজকুমারী অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করলো– 'কামিনীর সাথে তোমার কোনো ধরনের আবেগের সম্পর্ক আছে কি?'

হাশিম বললো– 'এক মানুষের সাথে আরেক মানুষের যে পবিত্র সম্পর্ক থাকে, তা-ই আমার ও কামিনীর মাঝে আছে। ফুলের সুবাসের মতো পবিত্র, চাঁদের জোছনার মতো কোমল এবং সূর্যের কিরণের মতো উজ্জ্বল সম্পর্ক। রাজকুমারীজি! আপনি আমাদের জন্য আপনার মূল্যবান ও মর্যাদাসম্পন্ন জীবনকে হুমকির মুখে ফেলবেন না। আমরা আমাদের ভাগ্যের ওপর সবর করছি। ভাগ্যে যদি মৃত্যু লেখা থাকে, তবে কোনো দুঃখ-ক্ষোভ নেই। কেননা একজন মুসলমানের জীবনের পরম আরাধ্য হচ্ছে এই শাহাদাত। আমরা আপনার মতো নিষ্পাপ ও মানবতার কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ অন্য মেয়েদের শত্রুকে খুন করে কোনো পাপ করিনি। এখন যদি আপনার পিতা মহারাজ আমাকে ও আমার সঙ্গীকে সেই অন্যায়ের শাস্তিতে খুন করার ফয়সালা দেন, তবে তাতে আমাদের কোনো অভিযোগ থাকবে না।'

'কিন্তু আমি তোমাদের এভাবে অসহায়ভাবে মরতে দেবো না।' রাজকুমারী পুরুষোচিত দৃঢ়তার সাথে বললো– 'আমি জল্লাদের তরবারির সামনে প্রথমে আমার মস্তক সোপর্দ করবো।'

'না, রাজকুমারী! আমি আপনাকে এমন করতে দেবো না।' হাশিম বললো।

এরপর রাজকুমারী অশ্রুসিক্ত চোখ তুলে হাশিমের দিকে তাকিয়ে বললো– 'হাশিম! বাতি থেকেই বাতি জ্বলে। মানবতা রক্ষার জন্য রক্তের বাতি জ্বালাতে হয়। যেভাবে তোমরা আমাদের ইজ্জত-আব্রু রক্ষার জন্য নিজের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে আত্মত্যাগের এক অমলিন দৃষ্টান্ত স্থাপন করছো, এর জবাবে আমিও আমার রক্ত দিয়ে মহানুভবতার এক চিলতে আলোর বিচ্ছুরণ

www.pathagar.com

ঘটিয়ে মানবতার মর্যাদা রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণদের সারিতে নাম লেখাবো। এটাই আমার একান্ত প্রত্যাশা।'

'না, রাজকুমারী! আপনার সৃষ্টিকর্তার শপথ দিয়ে বলছি, আপনি এমন করে ভাববেন না। আপনার জীবিত থাকা চাই। আপনি তো জীবিত থাকার উপযুক্ত।'

'আর তোমরা?' রাজকুমারী জিজ্ঞেস করলো- 'তোমরা কি জীবিত থাকার উপযুক্ত নও? থাক, ছাড়ো এমন আলোচনা। সময় খুবই কম। আজ রাতের কোনো অংশে আমি বন্দীখানার দরজা খোলার চেষ্টা করবো। তুমি কামিনীকে নিয়ে বেরিয়ে যাবে। তোমার ওপর সব সময় আমার আশীর্বাদ থাকবে। যেখানেই তোমরা থাকবে আমার অন্তরের কাছেই থাকবে। আমার প্রত্যাশার জগৎটাকে তোমাদের চলার পথের ধুলোয় ধূসরিত দেখতে পাবে।' এটুকু বলেই রাজকুমারী এগিয়ে গেলো।

এরপর সে মোহনের সামনে পৌঁছে বললো- 'মোহন ভাই, কেমন আছো?'

'খুব খুশি ...' মোহন মুচকি হেসে জবাব দিলো।

রাজকুমারী বললো- 'ধৈর্য ধরে দুর্দশার এই কয়েক ঘণ্টা সহ্য করে নাও। সময় ক্রমপরিবর্তনশীল।'

'চিন্তা করবেন না। আপনি আমাকে তরবারির নিচেও অবিচল দেখতে পাবেন। কেননা আমি চারিত্রিকভাবে দোষী নই।'

রাজকুমারী বাইরে বেরিয়ে গেলো দ্রুতবেগে। যেন এগিয়ে যাচ্ছে সম্মান ও মান-মর্যাদার লালিত্বে ভরপুর কোনো বীর সেনানী। হাশিম দীর্ঘক্ষণ ধরে তার হাঁটার ছাপ অনুভব করে যাচ্ছে নিজ ভাবনার আকাশে। এরপর সে হাত তুলে দোয়া করছে- 'হে রাব্বুল আলামিন! এই নিষ্পাপ রাজকুমারীকে কোনো ধরনের দুর্দশায় পতিত করো না। হে আমার মাওলা! এ তো গহিন অন্ধকারে মিটিমিটি জ্বলতে থাকা জোনাকির মতো। ভাগ্যের নির্মমতায় সেই আলোক পিদিমটি যদি নিভে যায়, তবে তো জগতে মানবতার জয়গান গাওয়ার আর কেউ থাকবে না। তুমি তো দয়ালু। তোমার চেয়ে অধিক দয়াবান এবং অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত কেউই নেই।' হাশিম দীর্ঘ সময় ধরে শিশুদের মতো ডুকরে ডুকরে কাঁদছে।

www.pathagar.com

ভোরের সূর্যোদয়

সেদিন সন্ধ্যায় মহারাজা হাশিম ও মোহনকে তার দরবারে তলব করেন। উন্মুক্ত তরবারি হাতে দুজন সিপাহি উভয়কে দরবারে নিয়ে আসে। মহারাজার একদিকে রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত, অন্যদিকে কৃষ্ণকুমার বসে আছে। অবশিষ্ট মন্ত্রী ও নেতৃবৃন্দ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত। রাজকুমারীর দু'চোখজুড়ে দৃঢ়তার আলোকচ্ছটা দেখতে পায় হাশিম। তাকে আকাশ থেকে উড়ে আসা পরীর মতো দেখাচ্ছে। অন্যদিকে মহারাজা ও কৃষ্ণকুমারের চোখে-মুখে উড়ছে ক্ষোভ ও ঘৃণার ধোঁয়া।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মহারাজা বললেন– 'তোমরা আমাদের সেনাপতিকে কেন খুন করেছো?'

হাশিম দ্বিধাহীন চিত্তে জবাব দেয়– 'কারণ, আপনার সেনাপতি চরিত্র-সম্ভ্রমকে তার নাপাক পায়ে পিষ্ট করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।'

রাজা গর্জন করে বলে উঠলেন– 'এসব কী বকছো তুমি? আর তুমিই-বা কে এমন কর্মকাণ্ড প্রতিবিধান করার? এ অধিকার তোমায় কে দিয়েছে?'

রাজকুমারী শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে বললো– 'পিতাজি মহারাজ! আপনি যদি নিজ চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে নেন এবং প্রকৃত সত্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতে না চান, তাহলে সেখানে সত্যের কোনো ভুল নেই। আমি তাদের জীবন ও মৃত্যুর ফয়সালা করার অধিকার দিয়েছিলাম। তারা আমার নির্দেশে ওই হিংস্র পশুকে মৃত্যুর ঘাটে পতিত করে দিয়েছে। এই হচ্ছে আমার পোশাক– যার তরতাজা দৃষ্টান্ত ওই সেনাপতির বিরুদ্ধে আপনার কাছে ইনসাফের আশা রাখছে।'

www.pathagar.com

রাজকুমারী নিজের ছেঁড়া কাপড়টি শূন্যে ছুড়ে দিলে দরবারে উপস্থিত ভদ্রেকের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাথা অবনত হয়ে যায়।

কৃষ্ণকুমার দ্রুত উঠে বললো– 'মহারাজ! আমাদের ধারণাই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। রাজকুমারীজিই হচ্ছে আমার ভাইয়ের খুনি।'

'নিঃসন্দেহে।' রাজকুমারী বললো– 'আমি আমার ইজ্জত রক্ষার্থে ওই বেইজ্জত ও অপদার্থকে খুন করেছি। আমি পৃথিবীর যেকোনো অত্যাচারী রাজার দরবারে আমার এ বক্তব্যে অটল থাকবো।'

'রাজকুমারী'! রাজা জয়ধ্বজ সিং গর্জন করে উঠলেন। বললেন– 'তুমি আমার স্নেহ-ভালোবাসার অবৈধ সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করছো!'

'না পিতাজি! আমার স্নেহ-ভালোবাসার চেয়ে কোনো গাদ্দারের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড আপনার কাছে অধিক প্রিয় হিসেবে বিবেচিত।'

রাজকুমারীর এ কথায় দরবারজুড়ে বিরাজ করছে পিনপতন নীরবতা।

মহারাজা ক্ষোভে কম্পিত কণ্ঠে বললেন– 'এই পাপী'কে এখনই এবং এখানেই খুন করা হোক! তার লাশ অজয়ের চিতাখোলায় কুকুরের সামনে ফেলে দেয়া হোক।'

জল্লাদ দাঁড়াচ্ছিলো; এমন সময় আচমকা হাশিম তার পাশে দাঁড়ানো এক সিপাহির কোমর থেকে টান দিয়ে তরবারি ছিনিয়ে নিলো এবং বিদ্যুৎ গতিতে কৃষ্ণকুমার সেনাপতির মাথার ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললো– 'আপনার সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নিন, নইলে সেনাপতির মস্তক ছিন্নভিন্ন করে দেবো।' মহারাজা খামোশ এবং দরবার নিস্তব্ধ।

ভদ্রেকের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্য হতে একজন বৃদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে বললো– 'রাজাজি! আমরা এখানে আমাদের অসংখ্য কন্যার লুণ্ঠিত আব্রুর দুঃখগাথা নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু রাজকুমারীর দুঃখজনক ঘটনা শুনে আমরা নিজেদের দুঃখের কথা ভুলে গেছি। আমাদের ধারণা ছিলো– এই অন্যায় ও বাড়াবাড়ির মাত্রা কেবল সিপাহিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু যেখানে মহারাজার কন্যার ইজ্জতও নিরাপদ নয়, সেখানে অন্যদের ইজ্জতের নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবে?'

মহারাজা ক্ষোভে চিৎকার করে বললেন– 'তুমি কে?'

'আমার নাম রাজগোপাল। আমি এ গাঁয়ের মৌয়াল।'

রাজকুমারী অবাক দৃষ্টিতে ওই বৃদ্ধ হিন্দুর দিকে তাকিয়ে ভাবছে, এর সম্পর্কেই কামিনী বলেছিলো যে, সে তার শুভাকাঙ্ক্ষী!

www.pathagar.com

রাজগোপাল বললো– 'মহারাজাজি! এই যুবক আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী। তার কথা মেনে নিন এবং রাজকুমারীর ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নিন। রাজকুমারী নির্দোষ।'

মহারাজা কিছুক্ষণের জন্য মাথা নিচু করে রাখলেন। এমন সময় এক ব্যক্তিকে নিয়ে দরবারে উপস্থিত হলো কিছু সিপাহি। মহারাজাকে কুর্নিশ করার পর সিপাহিদের একজন বললো– 'এ ব্যক্তি হাকিমে বাংলার দূত।'

রাজা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকালেন এবং পরে বললেন– 'বলো, তোমাদের হাকিম কী বলেছেন?'

মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের অগ্নিমূর্তিধারী চেহারা মুখোশপরা দূতের আপাদমস্তক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। এদিকে হাশিমের তরবারি সেনাপতি কৃষ্ণকুমারের মাথার ওপর চিকচিক করছে। সে সজাগ দৃষ্টিতে পরিস্থিতি অবলোকন করে যাচ্ছে। রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের ওপর গভীর বিস্ময়ের ছাপ। তার মোহনীয় নয়নযুগলে ভালোবাসার পোড়াব্যথা ছাড়াও খেলা করছে বিস্ময়ের এক অদ্ভুত ছায়া। খুবই আবেগমিশ্রিত বিস্ময়।

মহারাজা জয়ধ্বজ সিং দূতকে উদ্দেশ করে বললেন– 'বলো, তুমি কোথা হতে এসেছো এবং কী বার্তা নিয়ে?'

দূত কয়েক কদম অগ্রসর হয়ে মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের পা ছুঁয়ে বললো– 'মহারাজ! আমি বড়ই শুভ সমাচার নিয়ে এসেছি। আমার নাম শেখর। আমি নাদের খানের বসতির অধিবাসী।'

হাশিম এ কথা শুনে এতোটাই অবাক হয় যে, নিশ্বাস তার গলায় আটকে যাবার উপক্রম। এটা এমন সময়– যখন হাশিম কৃষ্ণকুমারের ব্যাপারে হয়ে পড়ে অমনোযোগী। পাথরদৃষ্টিতে সে শেখরকে দেখছে। চোখের পলকে এক আসাম সেনা ওপর থেকে একটি রশির জাল এমন সূক্ষ্মভাবে নিচে ফেলে দিলো যে, হাশিম খুব নাজুকভাবে আটকা পড়ে যায় এ জালে। তার হাত থেকে পড়ে যায় তরবারি। কৃষ্ণকুমার দ্রুত তা হাতে নেয়। সে হাশিমের ওপর আক্রমণ করতে যাবার মুহূর্তে মহারাজা তাকে বাধা দিয়ে বললেন– 'কৃষ্ণ! এখনো সময় আসেনি।'

এদিকে মোহনকেও সিপাহিরা রশি দিয়ে বেঁধে নেয়।

মহারাজা জয়ধ্বজ সিং সৈনিকদের লক্ষ করে বললেন– 'উভয়কে কয়েদখানায় বন্দী করে রাখো!'

www.pathagar.com

হাশিম শেখরের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে চিৎকার করে বলছে– 'নিমকহারাম শেখর! বড়ই নিকৃষ্ট কাজ করলে তুমি। তোমার পরিণতি খুব ভয়াবহ। বিদ্বেষের দানা গলায় বেঁধে নিজের ওপরই তুমি অবিচার করলে। তোমার কাছে এমন অকৃতজ্ঞতা ও গাদ্দারির আশা তো কখনো করিনি!'

শেখর দাঁড়িয়ে বললো– 'জনাব! মানুষ ধর্মের খাতিরে যে কদম ওঠায়, সেটা তার মৌলিক অধিকার।'

সিপাহি মোহন ও হাশিমকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো।

মোহন চিৎকার করে বলে ওঠে– 'গাদ্দার! ভগবানের কৃপায় যদি আমি জীবিত থাকি, তবে তোকে আমি নিজ হাতে জবাই করে ছাড়বো!'

'যাও যাও...'। শেখর রাগত স্বরে বললো– 'এখন কাকে ছেড়ে কাকে জবাই করবে? বসতির সকল হিন্দুই তো বিদ্রোহ করে বসেছে!'

মহারাজা জয়ধ্বজ সিং এবং তার দরবারি লোকেরা বেশ খুশি। কিন্তু ভদ্রেক থেকে আসা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের চেহারায় কালো মেঘ।

মহারাজা শেখরকে লক্ষ করে বললেন– 'যুবক! আমরা তোমার শুভ সমাচার শোনার অপেক্ষায় আছি।'

শেখর বলা শুরু করলো– 'ভগবান মহারাজাজির ছায়া আমাদের মাথায় চির অমলিন রাখুন। ভোরে আপনার সেনাবাহিনী যখন নাদের খানের বসতিতে আক্রমণ করে, তখন মুসলমানরা তাদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু দুপুরে পণ্ডিত জয়শ্রী রাম জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের পুরোহিতদের প্রচেষ্টায় বসতির প্রায় দশ হাজার হিন্দুর মাঝে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে সক্ষম হন। ফলে তারা বিদ্রোহ করে বসে। এরপর মুসলমানদের শক্তি ও মনোযোগ দুদিকে ভাগ হয়ে পড়ে। আমাকে বসতিবাসী আপনার কাছে পাঠানোর সময় দেখেছি মুসলমানদের সেনাব্যূহ তছনছ হয়ে পড়েছে। তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কোনো দিক থেকে যদি তাদের জন্য বড় ধরনের সাহায্য না আসে, তাহলে আজ রাতই হবে নাদের খানের বসতিবাসীর জন্য পৃথিবীর বুকে শেষ রাত।'

মহারাজা জয়ধ্বজ সিং খুশি হয়ে বললেন– 'যুবক! তোমার আগমন আমাদের জন্য খুশি ও প্রশান্তির উপলক্ষ। আমি তোমাকে আমার সেনাবাহিনীর যথেষ্ট বড় পদে আসীন করে সম্মানিত করবো।'

www.pathagar.com

শেখর বললো– 'আমার সাথে বসতির আরো প্রায় পঞ্চাশজন যুবকও এসেছে।'

'ওরা কোথায়?' মহারাজা জিজ্ঞেস করলেন।

শেখর বললো– 'তাদেরকে আপনার সিপাহিরা বাইরে বাধা দিয়েছে।'

মহারাজা প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত রামশর্মাকে উদ্দেশ করে বললেন– 'শেখর ও তার সঙ্গীদের খুবই ইজ্জত-সম্মানের সাথে মেহমানদারি করা হোক।'

শেখর আরেকবার মহারাজার কদমবুচি করলে মহারাজা জিজ্ঞেস করলেন– 'আচ্ছা বলো তো দেখি, ওই দুই যুবক কারা– যাদের এখনই বন্দীখানায় পাঠানো হয়েছে?'

শেখর বললো– 'মহারাজ! এ ব্যাপারে অধম কিছু বিশেষ নিবেদন রাখতে চাই।'

'বলো! তোমার সব কথা মেনে নেয়া হবে।' মহারাজা জয়ধ্বজ সিং অভয় দিয়ে বললেন।

শেখর বললো– 'তাদের মধ্যে ফর্সা ধরনের চওড়া বুকবিশিষ্ট যুবকটি মুসলমান। তার নাম হাশিম। সে গোহাটির কেল্লাদার ফিরোজ খানের বড় ছেলে। অপর যুবকের নাম মোহন। সে নাদের খানের বসতির বাসিন্দা। ভগবানের শপথ দিয়ে আপনাকে বলছি– তাদের আপনি হত্যা করবেন না। কেননা তাদের বিনিময়ে আপনি বড় বড় বাণিজ্য করতে পারবেন।'

মহারাজা জয়ধ্বজ সিং চমকে উঠলেন। তিনি তার সিংহাসনে আসীন হয়ে বললেন– 'তুমি ঠিক বললে তো? তাদের ভাগ্যের ফয়সালা তোমার ইচ্ছেমতোই করা হবে।'

'যথা আজ্ঞা।' শেখর ঝুঁকে রাজার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে কুর্নিশ করলো।

মহারাজা উঠতেই দরবার মুলতবি ঘোষণা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী রামদাস শর্মা ও কৃষ্ণকুমার শেখরের সাথে হাত মেলালো এবং যুদ্ধের ব্যাপারে বিভিন্ন তথ্য জানতে চাইলো। রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত পিতার পেছনে পেছনে অন্দরমহলে প্রবেশ করলো। মহারাজা তার মখমলের বিছানায় চোখ বন্ধ করে গভীর ধ্যানে মগ্ন।

রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত পিতার মাথায় আলতো হাত বুলিয়ে বলছে– 'পিতাজি! সৌম্য করুন। আমার কারণে আপনি খুব দুঃখ পেয়েছেন।'

www.pathagar.com

মহারাজা কোনো জবাব দিলেন না। রাজকুমারী আবারও কান্নার সুরে বললো– 'পিতা মহারাজ! আমি কি বাস্তবেই অপরাধী? এমনই যদি হয়ে থাকে, তবে আমি এখনই আপনার সামনে এই খঞ্জরটি আমার বুকে গেঁথে দিয়ে জীবন সাঙ্গ করে দেবো। আপনার পদতলে আমার প্রাণবায়ু উড়ে যাওয়ার সময় আমি খুব শান্তি পাবো।'

মহারাজা চোখ মেলে দেখলেন, রাজকুমারীর হাতে চিকচিক করছে খঞ্জর। চোখ জলে টলমল। ঠোঁট কম্পমান।

মহারাজা কন্যার হাত থেকে খঞ্জরটি কেড়ে নিলেন। আদর করে তাকে বুকে নিয়ে স্নেহভরা হাতটি মাথার ওপর রেখে বললেন– 'মা! আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি জানি না সে সময় কী ঘটে গেছে। আমি ওই যুবকের প্রতি কৃতজ্ঞ। সে যদি দ্রুত এসে অজয়ের ওপর আক্রমণ না করতো, তাহলে ভগবান জানেন কী হয়ে যেতো! এরপর তোমাকে ছেড়ে আমারও জীবন বাঁচানো দায় হয়ে যেতো।'

রাজকুমারী মহারাজার চওড়া বুকে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদকে বলছে– 'পিতা মহারাজ! অন্যায় আমার ওপর হয়েছে। আমার ইজ্জতের ওপর আঘাত এসেছে। আমি আমার দুঃখ সহ্য করতে পারিনি। রাজ্যের কল্যাণের খাতিরে কারো ইজ্জত-আব্রুর ওপর আঘাত এলে চুপ থাকা যায় না। আমি যদি অজয় কুমারকে খুন করার নির্দেশ না দিতাম, তাহলে সে আমাদের সবার ইজ্জত লুটে নিতো।'

মহারাজা জয়ধ্বজ সিং বললেন– 'আমার পরামর্শ হচ্ছে, তুমি ফিরে যাও। ওই যুবক– যে গোহাটির কেল্লাদারের ছেলে– তাকেও এখানে রাখা উচিত নয়।'

রাজকুমারীর মনে খুশির জলতরঙ্গ বেজে ওঠে। সে নিজ থেকেই মনে মনে এই দুর্দশা কাটিয়ে দূরে সরে যেতে চাইছিলো। এমতাবস্থায় এ কথা শুনে তার খুশি আর বাঁধ মানছে না যে, হাশিমকেও তার সাথে পাঠানো হচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে সে ভাবনার গভীরে আনমনে ডুবে গিয়েছিলো।

'তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে?' রাজা জিজ্ঞেস করলে পরে চন্দ্রকান্ত বললো– 'আমি কামিনীর ব্যাপারে ভাবছি।'

www.pathagar.com

'কামিনী!' মহারাজার বিস্ময়সূচক চাহনি। 'তার ব্যাপারে জগন্নাথে পণ্ডিত ও পূজারিদের কাছ থেকে জানতে হবে। সে তাদের আসামি। আমি তাদের নারাজ করতে পারি না।'

রাজকুমারী বললো– 'তারা কামিনীর ব্যাপারে কী চায়?'

মহারাজা বললেন– 'তাদের ধারণা, কামিনী মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে পূজারিদের খুনের ব্যাপারে সমানভাবে শরিক ছিলো।'

'আমি জানতে চাচ্ছি, কামিনীকেও কি আমাদের সাথে আসাম পাঠানো হবে?'

'না। সে এখানেই থাকবে। আমি কেবল মুসলিম বন্দীদেরই আসাম পাঠাতে চাই।'

রাজকুমারী ও মহারাজা উঠে গিয়ে আহারপর্ব সারলেন এবং প্রধানমন্ত্রী রামদাস শর্মাকে ডেকে নিজ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অবহিত করলেন।

মহারাজা বললেন– 'রাজকুমারীকে আজ রাতের শেষ প্রহরে এখান থেকে রওনা করে দেবে। তার সাথে পাঁচশ রথও সীমান্ত পর্যন্ত যাবে।'

'আমি এখনই পাঁচশ সওয়ারি তৈরির নির্দেশ দিচ্ছি।'

রাতের প্রথম প্রহর ফুরিয়ে আসছে। রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত নিজ কক্ষের খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নীল আকাশের বিশালতার মাঝে ছড়িয়ে থাকা তারকারাজির আলোকচ্ছটার মাঝে হারিয়ে গেছে। হঠাৎ একটি তারা ঢলে পড়ে যায়। পেছনে তার ঝরে পড়ে বিচ্ছুরণ। একসময় তা আঁধারে হারায়।

আচমকা রাজকুমারী অনুভব করে পেছনে কারও পায়ের আওয়াজ। পেছনে ফিরে তাকাতেই দেখতে পায় শেখর দাঁড়িয়ে!

'তুমি... তুমি!' রাজকুমারী ধমকের সুরে আরও বললো– 'তোমাকে এখানে অনুমতি ছাড়া আসার আজ্ঞা কে দিলো? বদমাশ! এখনই আমি সিপাহিদের ডাকবো।'

রাজকুমারী তালি বাজাতে যাবে এমন সময় শেখর বললো– 'পরম সম্মানিতা রাজকুমারী! আগে কথা শুনুন। আমি কোনো কুমতলব নিয়ে এখানে আসিনি।'

'তাহলে কেন এসেছো?' রাজকুমারী জিজ্ঞেস করলো।

জবাবে শেখর বললো– 'রাজকুমারী! আমাদের গুপ্তচর খবর দিয়েছে যে, আপনার কোমল হৃদয়ের সহানুভূতিতে হাশিম, মোহন ও কামিনী প্রাণে বেঁচে

www.pathagar.com

গেছে। আমি গাদ্দার বা বিদ্রোহী নই। আপনার পিতাজিরও শত্রু নই। আমি আমাদের লোকজনের সাথে কামিনী, হাশিম ও মোহনকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি। আশা করি, আপনি আমাদের এ ব্যাপারে পুরোপুরি সহায়তা করবেন। আজ রাতেই আমরা এসব কাজ সম্পন্ন করতে চাচ্ছি। কেননা, কাল পর্যন্ত পরিস্থিতি খুব বেশি বিগড়ে যাবে। ওদের তিনজনের জীবনই ভীষণ শঙ্কার মুখে পড়বে।'

'কিন্তু তুমি তো...'

'সেটা জরুরি ছিলো। রাজকুমারীজি! আপনি তো বিচক্ষণ ব্যক্তি। এমন জটিল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে এ ধরনের কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছে। আমার আফসোস হচ্ছে, সাময়িকভাবে আমার বন্ধুরা দুঃখ পেয়েছে।'

রাজকুমারী কী যেন ভাবতে গিয়ে বললো– 'আমি মোহন ও কামিনীকে বের করার কিছু ব্যবস্থা করছি। কিন্তু হাশিমকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে না। কারণ, পিতাজি হাশিমকে রাজধানীতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন। তোমরা হাশিমের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকবে। আমি তার সাথে আসাম যাচ্ছি। ভগবানকে সাক্ষী রেখে আমি অঙ্গীকার করছি– যদি কখনো কোনো পরিস্থিতিতে হাশিমের জীবনে চরম ঝুঁকি নেমে আসে, তবে তার জন্য আমি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করবো।

আজ রাতের তৃতীয় প্রহরে আমরা এখান থেকে রওনা হবো। যখনই আমরা এখান থেকে চলে যাবো, তখনই তুমি বন্দীখানার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কামিনী ও মোহনকে বের করে নেবে। প্রহরীদের সাথে আমি কথা বলে নেবো। সম্ভব হলে ওই প্রহরী বেচারাদেরও তোমাদের সাথে নিয়ে যাবে। এমন যেন না হয় যে, পরবর্তীতে তাদের ঘাড়ে শাস্তির খড়্গ নেমে আসে। তুমি এখন যাও। আমি বন্দীখানার রক্ষীদের সাথে বোঝাপড়া করছি। এখন গিয়ে তোমার লোকদের সুবিধাজনক স্থানে বিন্যস্ত করো। ভগবানের মর্জি হলে সব কাজ সহজ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে।'

শেখর চলে যাওয়ার পর রাজকুমারী চাদর মুড়িয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

বন্দীখানার প্রহরীরা অবনত মস্তকে কুর্নিশ করার পর রাজকুমারী মৃদুস্বরে বললো– 'আজ রাতে আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। অর্ধরাত গত হলে

www.pathagar.com

হাশিমকে যখন এখান থেকে বের করে নেয়া হবে, তখন তোমরা বন্দীখানার দরজা খোলা রাখবে। কিছু লোক কামিনী ও মোহনকে নিয়ে যেতে আসবে, তাদের পুরোপুরি সাহায্য করবে। যদি সুবিধা মনে করো, তবে তাদের সাথে তোমরাও পালিয়ে যাবে। চিন্তা কোরো না। পরে আমি নিজেই পরিস্থিতি সামাল দেবো।'

রাজকুমারী এখান থেকে সোজা হাশিমের কাছে চলে যায়। সে এখনো জেগে আছে। কয়েদখানার এক কোণে ছোট্ট পিদিম জ্বলছে।

রাজকুমারীর আগমন টের পেয়ে চঞ্চলস্বরে সে বললো– 'রাজকুমারী! আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেকে আপনি ধ্বংসের মুখে ফেলবেন না। আপনার যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে ভালোবাসা, দয়া-মায়া ও আত্মচেতনার আলোকশিখাটি নিভে যাবে। খোদার কসম! আপনার জীবন খুবই দামি।'

রাজকুমারী বললো– 'হাশিম! জীবন-মৃত্যু আকাশে থাকা ভগবানের হাতে। আমি ভালো একটি উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার লক্ষ্যে চেষ্টা-তদবির চালিয়ে যাচ্ছি। এ পথে যদি আমার প্রাণবায়ু উড়ে যায়, তবে তাতে আমার কোনো দুঃখবোধ নেই। বরং এতে করে আমি জনম জনম অমর হয়ে থাকার সুযোগ পাবো। এখন ভিন্ন একটি উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এসেছি। শোনো, শেখর বিদ্রোহী নয়। সে অনুগত ও বিশ্বস্ত। কৌশলের আশ্রয় নিয়ে সে তোমাকে এবং কামিনী ও মোহনকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছে। এতে সে অনেকটুকু সফল। আজ রাত তৃতীয় প্রহরে সে তার খেলা শুরু করবে। আমি প্রহরীদের সাথে কথা বলে রেখেছি। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, তুমি তাদের সাথে যেতে পারছো না। কারণ, কিছুক্ষণ পর তোমাকে আমার সাথে আসাম যেতে হবে। আর আসামে যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি জীবিত থাকবো, তোমাকে আমার প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয় করে রাখবো।'

হাশিমের চোখে-মুখে আনন্দের ফোয়ারা ঢেউ খেলছে। ঠোঁটের নিচ দিয়ে মৃদুস্বরে সে বলছে– 'সারা রাত আমি কতো পেরেশান। শেখর আমাকে ক্ষমা করে দিও। কতো অভিশাপ দিয়েছি তোমাকে। রাজকুমারী...!' হাশিমের নয়নযুগল খুশির আধিক্যে চমকে উঠছে। আবেগের ঢেউ কি আর বাঁধ মানে!

রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত অনিন্দ্যসুন্দরী ও উদ্ভিন্নযৌবনা এক যুবতী। নিটোল লম্বাটে চেহারা। প্রশস্ত ললাট, ডাগর নয়ন। সরু নাসিকা। পাপড়ির মতো

www.pathagar.com

সুন্দর, মসৃণ ওষ্ঠাধর। উজ্জ্বল গৌর বর্ণের শরীরে যেন রূপের জোয়ার। দেখলে তার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে স্বর্গের অপ্সরীরা পর্যন্ত তার প্রেমে বিমুগ্ধ হবে।

রাজকুমারীর হাতের ওপর হাত রেখে হাশিম বললো– 'রাজকুমারী! খোদা আপনাকে পূজার উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের রূপে আপনি তো স্বর্গের নিষ্পাপ হুর! কামিনী যদি বেঁচে যায়, তবে আমি নির্ভার হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবো।'

'কামিনীর জন্য কি তোমার এটুকুই ভালোবাসা?'

রাজকুমারী জিজ্ঞেস করলে হাশিম বললো– 'ভালোবাসার বিষয় নয়, এটা তো কর্তব্যের তাগিদ। কামিনী আমাদের সম্মান রক্ষার জন্য কতো দুঃখ সহ্য করেছে...!'

এরপর রাজকুমারী কামিনী ও মোহনকে সবকিছু বাতলে দেয়।

কামিনী কেঁদে কেঁদে বললো– 'রাজকুমারী! হাশিমের দিকে খেয়াল রেখো। সে তো ফুলের মতো। তাকে মরে যেতে দেবে না। সম্ভব হলে মনের ভেতর প্রেমকাননে তাকে সাজিয়ে রেখো। তার ফুলেল সৌরভে তোমার জীবন আরো সুবাসিত হয়ে উঠবে। হয়তো ভগবান তোমাদের উভয়কে পরস্পরের জন্য সৃষ্টি করেছেন।' রাজকুমারীর হৃৎকম্পন আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। সাগরের ঢেউ খেলে যাচ্ছে তার বুকে। পা কাঁপছে। কম্পিত পায়ে সে বেরিয়ে আসে।

কিন্তু কী ভাবতে গিয়ে আবার দ্রুত ভেতরে এসে কামিনীকে বললো– 'এখান থেকে বেরিয়ে মৌয়ালের ঘরে যাবে।'

***

রাতের তৃতীয় প্রহর। হাশিমকে কয়েদখানা থেকে বের করে আনা হয়েছে। অন্দরমহলের দরজায় সে শেখরকে দেখতে পায়। শেখরের চেহারায় মিটিমিটি হাসির রেখা। কিন্তু চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। উভয়ে একে অন্যকে চোখে চোখে বিদায় জানায়।

সম্মুখে দেখা যাচ্ছে রাজকুমারীর সুদৃশ্য রথ। হাশিমের আশপাশে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈনিকেরা দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পর সানাই বেজে উঠলো। রাজা ও রাজকুমারী এগিয়ে আসছেন। রাজকুমারীর পরনে ঝলমলে রেশমি শাড়ি,

www.pathagar.com

মণি-মুক্তাখচিত উজ্জ্বল অলংকার আর সুদৃশ্য রাজমুকুটে সুসজ্জিত। আজ যেন সে স্বর্গের অপ্সরী, যেন সাক্ষাৎ পরী। স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো উজ্জ্বল ঝলমলে তার সুকোমল গণ্ডদেশদ্বয় আজ দারুণ মোহময় হয়ে উঠেছে।

রাজকুমারী এসে একটি রথে আরোহণ করলো। রথগুলো অত্যন্ত চমৎকার ও নিখুঁতভাবে সাজানো। তবে যে রথে রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত আরোহণ করেছে, সেটির সাজসজ্জা অতুলনীয়। প্রতিটি রথের সামনে শক্তিশালী সুদর্শন ঘোড়া বাঁধা। কয়েকজন অস্ত্রসজ্জিত রাজপ্রহরী ঘোড়াসহ রথগুলোর সম্মুখে আর কয়েকজন পশ্চাতে এসে দাঁড়ালো। তাদের পেছনে কৃষ্ণকুমার ও প্রধানমন্ত্রী রামদাস শর্মাও আছেন।

মহারাজা রাজকুমারীকে সওয়ারিতে বসালেন। সাথে সাথে চাবুকের শব্দ আর ঘোড়ার টগবগ ধ্বনিতে রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে এক মুখর পরিবেশ সৃষ্টি হলো। ভাগ্য হাশিমকে এক অজ্ঞাত ও অপরিচিত ঠিকানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সে পরিস্থিতির অনিবার্যতায় নিজ ভবিষ্যতের জন্য উজ্জ্বল নক্ষত্রের সন্ধানে নেমেছে। অন্যদিকে রাজকুমারীও হাশিমের জন্য যেকোনো ত্যাগের মোকাবেলা করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে, যেন উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত থেকে একই গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

রাজকুমারী চন্দ্রকান্তকে বিদায় দেয়ার পর মহারাজা জয়ধ্বজ সিং ঘন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে আনমনে বলছেন– রাজকুমারীকে সঙ্গে এনে সম্ভবত আমি ভুল করেছি...।

তিনি অনেকক্ষণ ধরে দৌড়ে চলা ঘোড়ার টগবগ টগবগ শব্দ শুনে যাচ্ছেন। এরপর দীর্ঘ দূরত্বের মাঝে সেই শব্দেরা হারিয়ে গেলে তিনি তার সাথের লোকজনের কাছে ফিরে আসেন। নিজ বাসভবনের দরজার কাছে পৌঁছে কৃষ্ণকুমারের কাছে জানতে চাইলেন, বিক্রম তার সৈন্য নিয়ে কখন পৌঁছাবে?

কৃষ্ণকুমার বললো– 'খবর পেয়েছি ইতোমধ্যে সে জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের কাছাকাছি চলে এসেছে।'

মহারাজা বললেন– 'তাহলে তো কাল দুপুর নাগাদ পৌঁছে যাবে।'

এরপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মহারাজা বললেন– 'আগামীকাল সে পৌঁছামাত্রই তুমি এখান থেকে রওনা করবে। তুমি এখানকার পাহাড়ে চক্কর দিয়ে সিলেট অভিমুখে এগিয়ে যাবে। আমি ওপর থেকে নাদের খানের বসতি ও গোহাটির কেল্লার ধ্বংসাবশেষ দেখে দেখে মুসলমানদের যুদ্ধবিধ্বস্ত

www.pathagar.com

এলাকা মাড়িয়ে তোমার সাথে এসে মিলিত হবো। এখন তোমরা বিশ্রাম করো।'

মহারাজা, প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি নিজ নিজ ভবনে চলে যান। এর পরই শেখর ও তার সঙ্গীরা দ্রুত শুরু করে দেয় নিজেদের গোপন অভিযান। সবার আগে মোহন ও কামিনীকে আসামীয় সেনার পোশাক পরিয়ে দেয়া হয়। কামিনী সেনা পোশাকে ঢাকা। বন্দীখানা থেকে বের হয়ে দ্রুত তারা নিজেদের উদ্দিষ্ট গন্তব্যের দিখে ধেয়ে চললো।

রাতের এখন তৃতীয় প্রহর। আসাম বাহিনীর অনাচার-দুরাচারে রাত ধীরে ধীরে পার হচ্ছে। কুমারীদের ডাগর ডাগর চোখ রাতের অন্ধকার নিস্তব্ধতায় ভিন্ন কোনো বাহিনীর অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

***

ভদ্রেক গ্রামের মৌয়ালের দরজায় টুকটুক শব্দ। বৃদ্ধ মৌয়াল দরজা খুলে বেরিয়ে এসে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সিপাহি দেখতে পায়। এতে ভয়ানক ভীতির সঞ্চার হয় তার সারা দেহে। হাত জোড় করে সে বলে– 'জালেমরা! ভগবানের খাতিরে এখান থেকে চলে যাও। এ ঘরে এখন কিছুই অবশিষ্ট নেই... কিছুই নেই...। না মান, না সম্মান, না সম্ভ্রম, না ধন, না দৌলত; বরং এই গ্রামের প্রতিটি ঘর তোমাদের অনাচারের পঙ্কিলতায় ভরে আছে...। এই পরিত্যক্ত ঘরগুলোতে কী খুঁজতে এসেছো...?'

বৃদ্ধ মৌয়াল ক্ষোভে-দুঃখে শিশুদের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে। এ দৃশ্য দেখে কামিনী হাত জোড় করে বললো– 'চাচা! আমি কামিনী!'

বৃদ্ধের দম বন্ধ হবার দশা। তৎক্ষণাৎ সে কামিনীর পায়ে এসে পড়ে, 'কামিনী আমাদের ক্ষমা করো। তোমার কথা অমান্য করে আমরা সবাই আজ নিষ্ঠুর পরিণতি ভোগ করছি।'

'আমার হাতে সময় খুবই সামান্য। ভোর হবার আগেই এখান থেকে আমাদের বেরোতে হবে।'

'কিন্তু বেটি! এরা কারা? তুমি যাবে কোথায়?'

'চাচা! সে এক মর্মান্তিক ও লম্বা ঘটনা। ভগবান এই দুর্দশা থেকে আমাদের নিস্তার দিলে সব দুঃখের কথা আপনাকে শোনাবো। আপাতত আমরা নাদের

www.pathagar.com

খান পর্যন্ত পৌঁছাতে চাই। সেখানে আমাদের ইজ্জত-আব্রু, আমাদের সম্ভ্রম ও আমাদের প্রাণ– সবকিছু নিরাপদ।'

'কিন্তু শেখর নামীয় গাদ্দার তো মহারাজাকে বলেছে, নাদের খানের বসতি নাকি ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।'

কামিনী তার এক সঙ্গীর দিকে ইশারা করে বললো– 'চাচা! এই যে শেখর!'

শেখর বললো– 'চাচাজি! নাদের খানের বসতি নিরাপদে আছে। বরং মহারাজার সেনাবাহিনী গাজর আর মুলার মতো কেটে কেটে পড়ছে। আমি বোন কামিনীকে এখান থেকে বের করে নেয়ার জন্য সরদার নাদের খানের নির্দেশে এসব খেলা খেলেছি।'

মৌয়াল বললো– 'তোমরা ভেতরে এসো। বাইরে থাকা ঠিক হচ্ছে না।'

'না, চাচাজি!' কামিনী বললো– 'আপনি কোনোমতে আমাদের মন্দিরের ভেতরের নির্জন কক্ষ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন। আমরা মন্দিরের ভেতরের নির্জন কক্ষ থেকে সুড়ঙ্গের রাস্তা ধরে সহজে বাইরে বেরিয়ে যাবো। বাইরে আমাদের সঙ্গীরা ঘোড়া নিয়ে প্রস্তুত আছে।'

'ঠিক আছে।' মৌয়াল বললো– 'তোমরা ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হও। আমি চার-পাঁচজন যুবককে নিয়ে তোমাদের পেছনে পেছনে আসছি।'

'কিন্তু চাচা এভাবে তো...'

মৌয়াল বললো– 'না বেটি! এ মুহূর্তে এই বসতির সকল যুবক তোমাদের সাহায্যকারী এবং তোমাদের তরে প্রাণোৎসর্গ করতে উদ্গ্রীব। সম্ভবত তুমি শুনেছো যে, আমাদের ওপর দিয়ে কেয়ামতের কী বিভীষিকা নেমে এসেছে! আমাদের কন্যারা...'

'চাচা!' কামিনী কেঁদে কেঁদে বললো– 'চাচা... আমি নিজেই ওই শূলীতে চড়ে আছি... আমরা চললাম।'

কামিনী মোহন ও শেখরকে নিয়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধ মৌয়াল দ্রুতবেগে হারিয়ে যায় অন্ধকারে। একটু পরই অন্য একটি পথ দিয়ে বের হয়ে কামিনী ও তার সঙ্গীদের আগেই মন্দিরের ফটকে পৌঁছে যায় সে। তার সাথে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আরো চার-পাঁচজন তেজি যুবক। কামিনী তার সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে পৌঁছালে আবারও এক বেদনাদায়ক দৃশ্যের অবতারণা হয়। দুঃখে-ক্ষোভে ফেটে পড়া মুখগুলোতে হতাশার ব্যাকুল চাহনি।

www.pathagar.com

কামিনী হাত জোড় করে নমস্কার দিয়ে বললো– 'ভাই সকল! এটা কান্নার সময় নয়।'

মৌয়াল এগিয়ে এসে বললো– 'এসো, আমার পিছে পিছে এসো।' মৌয়াল মন্দিরের পাশে লাগোয়া পুরোহিতের দরজায় কড়া নাড়ছে।

পুরোহিত দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলো– 'মৌয়ালজি! ভালো আছো তো? এই সৈনিকদের কেন নিয়ে এসেছো?'

মৌয়াল বললো– 'এ ব্যাপারে তো সৈনিকেরা ভালো জানে।'

'সিং ভাই, কী খবর?' পণ্ডিত জানতে চাইলে শেখর বললো– 'আমরা শুনেছি, কিছু মুসলমান গুপ্তচর ভেতরের ঘরের গর্তে লুকিয়ে আছে।'

'এটা অসম্ভব।' পণ্ডিত বললো– 'আপনাকে কেউ হয়তো বিভ্রান্ত করেছে। ভেতরের ঘরের গর্ত সম্পর্কে তো আমাদের ছাড়া আর কারো জানা থাকার কথা নয়।'

শেখর বললো– 'পণ্ডিত! আপনি সময় নষ্ট করছেন। আপনার এ কথা যদি মেনে নেয়া হয় তাহলে বলুন, মৌয়ালজি এবং আমি কী করে এ ব্যাপারটি জানলাম? আপনি দ্রুত দরজা খুলে দিন। বাকি বিষয়গুলো আপনার চেয়ে আমরাই ভালো বুঝবো।'

'আমি যদি এমনটি না করি তাহলে?'

শেখর তরবারি হাতের ওপর রেখে বললো– 'কেন আপনি খুলবেন না? এটা আমার নির্দেশ! আমি আমার নির্দেশ পালন করতে বাধ্য করাতে জানি...!'

শেখরের সাথে সাথে অন্যরাও তরবারি তুলে ধরে। পণ্ডিত মশাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাবি বের করে দেয় এবং ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে যায়। এক কোণ থেকে একটি মশাল নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে সামনে এগোয়। মন্দিরের পেছনে একটি সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে সে নিচের দিকে চলে যায়। শেখর, মোহন ও অন্যরা তার পেছনে পেছনে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামে। পণ্ডিত সুড়ঙ্গের মুখ থেকে ঢাকনা তোলে। সেখানে একটি দরজায় ঝুলতে দেখা যায় বিশাল তালা। পণ্ডিত চাবি দিয়ে তালাটি খুলে দেয় এবং বলে– 'এই দেখে নিন...'

মৌয়াল বললো– 'পণ্ডিত মশাই, আপনিও চলুন।'

দুই মশালধারী সর্বপ্রথম সিঁড়ির সাহায্যে নিচে নামে। তারপর কামিনী, শেখর, মোহন এবং মৌয়াল ও তার সঙ্গীরা পণ্ডিতকে ধাক্কা দিয়ে ঘাটের

www.pathagar.com

সিঁড়িতে নামিয়ে দেয়। দশ-বারোটি সিঁড়ির পরই সুড়ঙ্গের দেখা মেলে। এখানে পৌঁছে শেখর বললো– 'মৌয়াল চাচা! আপনি যদি যেতে চান তবে চলুন।'

'বেটা!' মৌয়াল বললো– 'আমরা তোমাদের বাইরে পর্যন্ত পৌঁছে দেবো।'

কামিনী হাত জোড় করে প্রণাম করে বললো– 'চাচা! বড়ই মেহেরবানি। ভগবানের কৃপা হলে আমরা সকলে পুনরায় মিলিত হবো। এই বিধ্বস্ত প্রান্তরে আবারও ফুল ফুটবে...।'

পণ্ডিত আশ্চর্য হয়ে কামিনীর দিকে তাকিয়ে বললো– 'এ তো দেখি কামিনী! আমার সাথে ধোঁকাবাজি হচ্ছে!'

বসতির এক তাগড়া যুবক দ্রুতবেগে খঞ্জর বের করে পণ্ডিতের বুকে চেপে ধরে বললো– 'হ্যাঁ, এ কামিনী! ভালো হয়েছে তুমি তাকে চিনতে পেরেছো...'

ভয়ংকর এক চিৎকারের শব্দ অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। বয়ে যায় রক্তের ফোয়ারা। পণ্ডিত দুই-তিনবার কেঁপে কেঁপে শান্ত হয়ে যায়।

কয়েক কদম এগিয়ে এসে মৌয়াল কামিনীর পা ছুঁয়ে বললো– 'কামিনী! এখন আমাদের ফিরে যাবার আজ্ঞা দাও। ভগবান তোমার সাহায্যকারী হবেন।'

কামিনী মৌয়ালের হাতে চুমু দিয়ে কান্নাস্বরে বললো– 'চাচাজি! আশীর্বাদ ছাড়া আমাদের বসতিবাসীর জন্য আর কী-ই বা দিতে পারি! আমি তো বলছি, আপনারা সকলেই আমার সঙ্গে চলুন।'

মৌয়াল বললো– 'না, বেটি! এখনো আমাদের কৃতকর্মের বহু শাস্তি পাওয়া বাকি আছে। আগামীকাল মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের বাকি বাহিনী এখানে এসে পৌঁছাবে। নবাগতরা নিত্যনতুন অপরাধ ও জুলুমের শাখা খুলবে। কিন্তু এখন এই সুড়ঙ্গ আমাদের মুক্তির পথ খুলে দিয়েছে। গ্রামের মেয়েদের এখান দিয়ে বের করে জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা যাবে। সম্ভব হলে নাদের খানের বসতিতেও পাঠানো যেতে পারে।'

কামিনী অবাক চোখে বৃদ্ধ মৌয়ালের দিকে তাকিয়ে বলে– 'চাচা! এটা খুব ভালো বুদ্ধি। আমরা নিরাপদে বসতিতে পৌঁছাতে পারলে সরদার নাদের খানকে এ সম্পর্কে অবহিত করবো। আশা রাখা যায়– তিনি সম্পূর্ণভাবে সাহায্যে এগিয়ে আসবেন।'

'... আচ্ছা, তোমরা যাও!'

www.pathagar.com

মোহন ও শেখর মশাল নিয়ে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে হাঁটতে থাকে। মৌয়াল এবং তার সাথে আসা আরো চার যুবক অন্ধকারে মিলে যাওয়া পর্যন্ত তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। মশালের আলো অন্ধকারে আড়াল হয়ে গেলে ফিরে আসে তারা। বাইরে বেরিয়ে এসে বৃদ্ধ মৌয়াল তার সাথিদের সাহায্যে সুড়ঙ্গের দরজা বন্ধ করে, তালা লাগিয়ে দেয়। মুখে ঢাকনা দিয়ে তারা মন্দিরে ফিরে আসে।

বৃদ্ধ মৌয়াল বললো– 'ছেলেরা! কামিনীজির বেঁচে থাকা এবং সহি সালামতে এই বসতির বিভীষিকা হতে বেরিয়ে যাওয়া এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, ভগবান আমাদের সহায় হতে চলেছেন। তাই আমাদের উচিত এ মুহূর্তে একটি পুণ্য কাজ করা।'

'খবর আছে, চাচা!' এক যুবক বললো।

মৌয়াল বললো– 'ঠিক আছে, কী করতে চাও?'

যুবক খঞ্জর বের করতে করতে বললো– 'আমরা এই মন্দিরের পাপিষ্ঠ লম্পট পূজারিদের শেষ করে দিতে পারি।'

'শাবাশ! তোমরা ঠিকই বলেছো!'

কিছুক্ষণের মধ্যেই যুবকেরা মন্দিরের প্রায় চারজন পূজারিকে মৃত্যুর ঘাটে ফেলে দেয়। তাদের লাশ একত্র করে মাটি খুঁড়ে তাতে পুঁতে রাখে। মৌয়াল তার যুবক সাথিদের নিয়ে দ্রুতবেগে বেরিয়ে যায় মন্দিরের চৌহদ্দি হতে। ভোর হতে এখনো অনেক সময় বাকি। এরা এক ঐতিহাসিক কাজ সম্পাদন করে নিজ নিজ ঘরে পৌঁছে যায়।

ওদিকে কামিনী, শেখর ও মোহন সুড়ঙ্গের অন্য প্রান্তে পৌঁছে এক ভিন্ন পরিস্থিতির শিকার হয়। এখানেও মোটা গাছের বিশাল দরজা। তাতে বড় এক তালা ঝুলে আছে। কিন্তু চাবি? শেখর ও মোহন কামিনীর হাত থেকে মশাল নিয়ে তরবারি দিয়ে তালা ভাঙতে চাচ্ছে। কামিনী মশালের আলোতে এদিক-ওদিক তাকাতেই হঠাৎ চোখে পড়ে বিশাল এক পাথর।

একই সময়ে শেখর ও মোহনের চোখও পড়ে পাথরের দিকে। মোহন পাথরটি উঠিয়ে তালার ওপর জোরে এমন আঘাত করে যে, প্রথম আঘাতেই তালাটি খুলে যায়। দমাদম খুলে যায় দরজার কপাট। বাহির থেকে তরতাজা বাতাস আসতে থাকে। জীবন যেন আরেকবার স্বাগত জানায় সকলকে। স্নেহের পরশমাখা মাথায় চুমু খাওয়ার মতো অনাবিল প্রশান্তির শ্বাস ফেলে

www.pathagar.com

সবাই। সুড়ঙ্গের মুখ ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিলো। বাইরে বেরিয়ে শেখর এদিক-ওদিক তাকালো। রাত এখনো গভীর। নিস্তব্ধ। সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হওয়ার পর শেখর তার কণ্ঠে এক বিশেষ ধরনের শব্দ বের করলো। জবাবে অন্য প্রান্তেও একই রকম প্রতিধ্বনি ভেসে উঠলো। চারদিকে সুনসান নীরবতা।

নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে শেখর বললো– 'আমাদের সঙ্গীরা এসে গেছে।'

কামিনী উভয় হাত আকাশের দিকে উঁচু করে তুলে ধরে বললো– 'ভগবান! তোমার লাখ লাখ কৃতজ্ঞতা। তুমি পদে পদে আমাদের সাহায্য করছো।'

প্রায় পঞ্চাশজনের একটি অশ্বারোহী কাফেলা খোলা মাঠে সমবেত। এখানে কয়েদখানার ওই দুই প্রহরীও আছে– যারা রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের নির্দেশে শেখরকে সাহায্য করার জন্য কামিনী ও মোহনকে কয়েদখানা হতে পালিয়ে যেতে সুযোগ দিয়েছিলো। শেখর, মোহন ও কামিনী তার সাথিদের কাছে গিয়ে পৌঁছালে সবার চোখে-মুখে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। কামিনীকে ঘোড়া দেয়া হয়। প্রহরীদের একজন একজন করে দুজনের পেছনে বসানো হয়। এদের মধ্যে প্রায় ত্রিশজন মুসলিম ঘোড়সওয়ারও ছিলো।

এক যুবক বললো– 'আমাদের প্রায় পনেরো-বিশ ক্রোশ গহিন অরণ্যে সফর চালু রাখতে হবে। কেননা এদিকে আসাম বাহিনী আছে। দক্ষিণ দিকে নদীর তীর ঘেঁষে এগোলে কোনো রকম ঝুঁকি ছাড়া আমরা বসতির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছাতে পারবো।'

রাতের মুসাফিরদের ছোট্ট এই কাফেলা যখন যাত্রা আরম্ভ করে, তখন পশ্চিম আকাশে উদিত চাঁদ তাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কপালে চুমুর পরশ বুলিয়ে যাচ্ছিলো। রাতের তৃতীয় প্রহর ধীরে ধীরে নিজ প্রকৃতিতে সময়ের চাকার তালে তালে ঘুরছে। অগুনতি নক্ষত্রের দীপ্ত মশাল চমকাচ্ছে আকাশের বিশালতায়। চাঁদনি রাতের আলোকরেখা ঝিকিমিকি করছে বিশাল উঁচু উঁচু গাছের চূড়ায়। জোছনারা অনেকখানি কমিয়ে দেয় রাতের অন্ধকারের গহিন ভয়াবহতা।

জানবাজদের ছোট্ট এই কাফেলা– যার নেতৃত্ব দিচ্ছে শেখর– খুব ধীর গতিতে দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষে এগোচ্ছে তারা। পদে পদে তাদের ডিঙাতে হচ্ছে ঘন ঘন বাঁশঝাড় ও ঝাউবন। কখনো কখনো তো ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তরবারি দিয়ে গাছের মোটা মোটা ডাল কেটে কেটে নিজেদের জন্য পথ তৈরি করে নিতে হচ্ছে তাদের। রাতের এক প্রহরে তারা যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করে তিন-চার ক্রোশ দূরত্ব অতিক্রম করে এসেছে। জঙ্গলটি ছিলো খুবই

www.pathagar.com

ভয়ংকর। ঘনত্বের কারণে চলাচল ছিলো খুবই দুষ্কর। অজস্র রক্তপিপাসু হিংস্র জীবজন্তু ও বিষাক্ত সাপের অভয়ারণ্য এই বন।

তিন-চার ক্রোশ পথ পেরিয়ে আসার পর হঠাৎ বেশ খোলামেলা এবং যথেষ্ট প্রশস্ত পরিষ্কার করা পথ ধরে চলছে কাফেলা। ঘোড়ার রশি টেনে টেনে স্থির চোখগুলো এই পরিবর্তিত পথ পর্যবেক্ষণ করছে। মনে হচ্ছে, বিশাল বড় কোনো বাহিনী এই মহাসড়ক তৈরি করেছে। সকলেই আশ্চর্য। রহস্যের ভাঁজ সবার কপালে।

এক যুবক কিছুটা ঘাবড়াটে ভঙ্গিমায় চুপিসারে বললো– 'শেখর! তুমি কি কিছু বুঝতে পেরেছো?'

শেখর চোখ কপালে ওঠা দৃষ্টিতে তার পাশের সাথির দিকে তাকিয়ে বললো– 'আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না। কিছুই বুঝে আসছে না আমার। কী করা যায়? এ কথা তো স্পষ্ট যে, এই বনে বিশাল কোনো বাহিনী আছে। কিন্তু এই বাহিনী কি শত্রুর না মিত্রের– এটা নিশ্চিত করে বলা তো দুষ্কর!'

মুসলিম যুবক জাফর কিছুটা দৃঢ়তার সাথে বললো– 'ভাই, আমার মনে হচ্ছে বাংলার হাকিম নবাব আলি কুলি খানের বাহিনী পৌঁছে গেছে অথবা ভোর অবধি পৌঁছে যাবে।'

এমন সময় কামিনী সামনের পাহাড়ের দিকে ইশারা দিয়ে বললো– 'আমি পাহাড়ের ওপর অন্ধকারে কিছু নড়তে দেখতে পাচ্ছি।'

সবাই পাহাড়ের ওপর স্থিরচোখে তাকিয়ে আছে। একসময় সকলেই পাহাড়ের ওপর দিয়ে অনেকের নড়াচড়ার ছায়া দেখতে পায়।

শেখর বললো– 'এখন চিন্তা করার সময় নয়। একজন সৈনিককে প্রতি মুহূর্তে যেকোনো ধরনের ভালো-মন্দ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকা চাই। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় অপচয় করে কোনো লাভ নেই। ভালো হবে সফর অব্যাহত রাখা। আমার মনে হচ্ছে, জাফরের ধারণা সঠিক হবে। এটা মুসলিম বাহিনীর তৎপরতা বলেই মনে হচ্ছে।'

শেখর ঘোড়ার দড়ি টান দিয়ে চলতে আরম্ভ করে। পেছনে চলছে গোটা কাফেলা। প্রশস্ত পথের কারণে ঘোড়ার গতিতে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষিপ্রতার সৃষ্টি হয়েছে। এক জায়গায় তারা জ্বলন্ত মশাল দেখে হঠাৎ থামিয়ে দেয় চলার গতি। কিছুক্ষণ তারা দাঁড়াতেই আচমকা পাহাড়ের চূড়া হতে একটি আওয়াজ ভেসে আসে।

www.pathagar.com

'আমরা জানি তোমরা কারা এবং কোথায় তোমরা যাচ্ছো... । নির্ভয়ে তোমরা সফর অব্যাহত রাখো। আল্লাহর দয়া আর অনুগ্রহে তোমাদের নিরাপত্তার জন্য চৌকস প্রহরী জেগে আছে। পরম সম্মানিত নবাব আলি কুলি খান স্বয়ং তোমাদের জন্য বেশ উদ্বিগ্ন ও পেরেশান।'

নিচ থেকে শেখর উচ্চস্বরে বললো– 'অদেখা বন্ধু! অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা!'

এরপর আওয়াজ এলো– 'তোমরা রওনা হয়ে যাও। সামনে গিয়ে এ পাহাড় দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মোড় নেবে। তোমরা পাহাড়ের সাথে সাথে সফর করবে না। পাহাড়ি মোড়ের কয়েক কদম সামনে একটি নদী দেখতে পাবে। তোমরা নদীর কিনারা দিয়ে চলতে থাকবে। এভাবে তোমরা সহজে পুরনো মহাসড়কে পৌঁছাতে পারবে; যা এই বন-বাদাড় দিয়ে যেতে যেতে দারুল হুকুমত পর্যন্ত চলে গেছে। আজই তোমাদের এই বিপৎসঙ্কুল সফরের শেষ মঞ্জিল। নদীর অপর প্রান্তে পশ্চিম দিকেই নাদের খানের বসতি– যেখানে যুদ্ধ চলছে।'

সবাই চলছে। প্রশস্ত ও পরিষ্কার পথ ধরে ঘোড়া দৌড়াচ্ছ তীব্র গতিতে। পাহাড়ের মোড়ে পৌঁছে তারা নিজেদের গন্তব্য পশ্চিম প্রান্তে ফিরিয়ে নেয়। দুই-তিন মাইল দুর্গম দূরত্ব পেরোনোর পর অনুভব করে জঙ্গলের ঘনত্ব অনেকটা কমে এসেছে। উঁচু উঁচু গাছ আর ঘন বনের মাত্রা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। জমিনের কোমল বিছানার দেখা মিলছে। কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে উন্মুক্ত প্রান্তরও। শুকনো বাতাসে মনোহর সুবাস। মনে হয় গাঢ় বনের রাজত্ব যেন ফুরিয়ে আসছে। নদীর কাঁপা কাঁপা ঢেউয়ে তারার বিকিরণ চুমু দিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে জোছনা যেন মনমাতানো সুরে গাইছে নদীর ঢেউয়ের তালে তালে। এভাবে ধীরে ধীরে কমে আসছে দূরত্ব।

একসময় রাতের অন্ধকার বিদায় নিতে চায়। ভোরের আলো তার দক্ষতা দেখাতে ব্যাকুল। ভোরের শিশিরের যৌবন ফিরে আসে। ফুলের কলিরা ঝুমঝুম রঙ পাল্টাতে ব্যস্ত। অন্ধকারের কোলে জন্ম নিতে থাকে আলোক প্রভাত। একসময় দুর্জয় এ কাফেলা মহাসড়কে এসে পৌঁছে যায়; যা সাপের মতো আঁকাবাঁকা হয়ে বনের ভেতর দিয়ে সিলেট ও কুমিল্লা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

এখানে পৌঁছে কাফেলার সবাই ঘোড়ার লাগাম খুলে চড়ে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেয়। ঘোড়াগুলো নাচতে নাচতে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

মুসলমানরা অজু করে ফজরের নামাজের জন্য প্রস্তুতি নেয়। জাফর তার উঁচু ও সুরেলা আওয়াজে আজান শুরু করে দেয়। আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের ধ্বনি সৃষ্টিজুড়ে ছেয়ে যায় মায়াবী মুখরতায়। শেখর, মোহন, কামিনী ও অন্য হিন্দু যুবকেরা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে তাদের পাহারা দিতে থাকে– যারা নামাজ আদায় করছে। আজানের পর জাফরই ইমামতির দায়িত্ব পালন করে। অন্যরা তার পেছনে তিন কাতারে জামাতবন্দী হয়ে নামাজের নিয়ত করে। এখনো তারা প্রথম রাকাতের শুরুর দিকেই আছে, আচমকা চারজন ঘোড়সওয়ার দ্রুত ঘোড়া থেকে নেমে হাত বেঁধে নামাজের জামাতে শরিক হয়। পাশেই নামাজিদের জুতা পড়ে আছে।

শেখর আশ্চর্য হয়ে মোহনকে বললো– 'মোহন! তুমি কি চিনতে পেরেছো এই দীর্ঘদেহী ব্যক্তিত্বশালী লোকটি কে?'

মোহন মূর্তির মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সে কিছুই বললো না। কামিনী আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো– 'শেখর ভাই! তিনি কে?'

শেখর কানে কানে বললো– 'তিনি বাংলার হাকিম বাদশা আলি কুলি খান।'

আসামের সেনারা বিস্ময়ভঙ্গিতে বললো– 'ইনি বাংলার হাকিম!'

'জি হ্যাঁ!' শেখর বললো। 'ইনিই ওই বীরপুরুষ– যার সাথে মোকাবেলা করার সাহস কারও নেই।'

কামিনী নিষ্পলক তার দিকে তাকিয়ে আছে। নামাজ আদায় শেষ হলে সামনের সারিতে নড়াচড়া আরম্ভ হয়। জাফর তার জায়গা হতে সরে এসে বললো– 'জনাব আপনি ...!'

বাদশা আলি কুলি খান খুবই দরদ নিয়ে বললেন– 'বেটা! এখানে আমার চেয়ে তোমাকে ভালো মানিয়েছে। আল্লাহর দরবারে তোমরা সকলেই আমার চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান। এই দুনিয়ায় যার বেশি পদ-পদবি থাকবে, কেয়ামতের দিন তার পাপের পাল্লা ততো ভারী হবে। কেননা অনেক কম পদবিধারীই তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে পারে।'

এতোটুকু বলতেই এতো মান-মর্যাদা ও ঐশ্বর্যের অধিকারী ব্যক্তির দু'চোখ বেয়ে শিশিরের মতো অশ্রুবিন্দু ঝরতে আরম্ভ করে। কথার আওয়াজ গলায় আটকে যেতে থাকে।

www.pathagar.com

দোয়ার সময় হলে বাদশা আলি কুলি খান ইশারা দিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা হিন্দুদের ডেকে বললেন– 'এসো ছেলেরা! তোমরাও দোয়ায় শামিল হও। আমাদের সকলের খোদা তো একজনই। উপাসনায় ভিন্নতা আছে তো কী হয়েছে?'

জাফর খুবই বিনয় ও মিনতির সুরে আকাশ-মাটির সৃষ্টিকর্তার দরবারে দোয়া করা আরম্ভ করেছে। সে বলছে– 'হে জমিন ও আসমান সৃষ্টিকারী! রাতের ক্রোড়ে ভোরের জন্মদাতা! ফুলের মাঝে রঙ ও ঘ্রাণ দানকারী! তুমিই সর্বময় শক্তির মালিক। তুমি তোমার দিগ্‌ভ্রান্ত সৃষ্টিকে তোমার প্রিয়ভাজনের উসিলায় হেদায়াত ও ভালোবাসার পথে চালাও। অন্তরের কালিমাগুলো মুছে তা সৌহার্দ্যের আলোয় ভরে দাও... ।'

বাংলার হাকিম দোয়ার পর দাঁড়িয়ে এক এক করে সবার সাথে খুবই তেজোদীপ্তভাবে হাত মিলিয়ে বললেন– 'বাবারা! তোমাদের এই মহান কীর্তির ব্যাপারে আমি গর্ববোধ করি। তোমাদের প্রতি মুহূর্তের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমি অবগত আছি। ... তোমাদের মধ্যে শেখর কে?'

শেখর সামনে এগিয়ে এসে বাদশা আলি কুলি খানের শেরওয়ানির আঁচলে চুমু খেয়ে অবনত মস্তকে কুর্নিশ করে বললো– 'মহাত্মন! আমাকে শেখর বলা হয়।'

বাদশা তার কাঁধে মহব্বতের হাত বুলিয়ে বললেন– 'বেটা, আমাকে সংক্ষিপ্ত বাক্যে ভদ্রেকে সংঘটিত ঘটনার বর্ণনা দাও তো!'

শেখর বেশ গোছালোভাবে সংক্ষিপ্ত বাক্যে সব ঘটনা শোনালো। বাদশা আবারও আসাম সেনাদের সাথে হাত মেলালেন। উভয় আসাম সেনা অবিশ্বাস্য আবেগের আতিশয্যে নবাব সাহেবের পায়ে লুটিয়ে পড়লো। বাদশা নিজ হাতে তাদের ওঠালেন। তারা কাঁদছিলো এবং হেঁচকি তুলে বলছিলো– 'আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না, আপনিই বাংলার হাকিম! আপনাকে তো অবতারের মতো মনে হচ্ছে।'

বাদশা আলি কুলি খান ছিলেন দীর্ঘ ও সুঠাম দেহী। প্রশস্ত ও উঁচু ছিলো তার ললাটদেশ। আকারে বেশ বড় ছিলো মস্তক। উজ্জ্বল বর্ণের অধিকারী ছিলেন তিনি। চওড়া বুক, আঙুলগুলোও বেশ লম্বা লম্বা। তার লাল-সাদা চেহারায় ছোট ছোট দাড়ি খুব সুন্দর দেখাচ্ছিলো। কালো দাড়ির মাঝে কোনো কোনো সাদা চুল জোছনার মাঝে তারার মতো ঝলমল করছিলো। গলার আওয়াজ

www.pathagar.com

ছিলো ভারী ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। মাঝ বয়সেও তার ভেতর যুবকের মতো চেতনা ও তেজ দীপ্তমান।

বাদশা আলি কুলি খান উভয় আসাম সেনার কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'তোমরা আমাদের এক অপারগ ও মজলুম কন্যাকে রক্ষা ও মুক্তির জন্য আমাদের ছেলেদের সাহায্য করে আমাদের ওপর বেশ অনুগ্রহ করেছো। আমরা অকৃতজ্ঞ নই। তোমরা দেখবে আমরা বাংলা থেকে আসাম পর্যন্ত তোমাদের এই অনুগ্রহের বদলা পদে পদে কীভাবে স্মরণ করে রাখি!'

এরপর তিনি তার গলায় পরা মূল্যবান মুক্তার তৈরি দুটি মালা খুলে নিজ হাতে তাদের গলায় পরিয়ে দিলেন। কামিনী এখনো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে। বাদশা হঠাৎ তার দিকে ফিরে তাকালে কী যেন বলতে যাবে– এমন ভাব দেখতে পেলেন তার চোখে। সে মুচকি হাসছিলো। ঠোঁট কাঁপছিলো। তিনি আরো দু'কদম এগোলেন। কামিনী পাথরের মতো নীরব নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথার ওপর আসামীয় ওড়না ঝুলছিলো।

বাদশা মৃদু শব্দে বললেন– 'মা!'

আবেগের আতিশয্যে কামিনীর সংজ্ঞা হারাবার দশা। চোখের কুঠরিতে সে ঝাপসা দেখছে। এক চক্করে সে বাদশার পায়ে পড়ে গেলে বাদশা এগিয়ে এসে তাকে দৃঢ় বাহুতে আগলে রেখে বললেন– 'মা, তোমার ওপর পতিত নির্মমতার যাতনা আমি কবরেও অনুভব করবো।'

বাংলার হাকিম বাদশা আলি কুলি খান তার ঘোড়ায় সওয়ার হবার সময় এক সফরসঙ্গীকে উদ্দেশ করে বললেন– 'দেলোয়ার খান! এটা উপযুক্ত স্থান। তুমি তাদের থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা এখানেই করো। দ্বিতীয় নির্দেশ দেয়া পর্যন্ত এরা এখানেই অবস্থান করুক।'

বাদশার সওয়ারি রওনার আগে শেখর ও অন্য যুবকেরা এক এক করে বাদশার ডান পার্শ্বদেশে চুমুর পরশ এঁকে দিচ্ছিলো। আসাম সেনাদ্বয়ের পালা এলে অতিরিক্ত আবেগে তারা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলো। বাদশা স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন– 'কী হলো! তোমরা কাঁদছো কেন? এখানে যদি তোমাদের ভয় হয়, তাহলে আমার সঙ্গে চলো!'

এক আসাম সেনা বললো– 'না, সরকার! আমাদের কোনো ধরনের ভয় বা শঙ্কা নেই।'

'তাহলে কাঁদছো কেন?'

www.pathagar.com

বাদশা জানতে চাইলে আসাম সেনা পুনরায় বললো– 'এ তো আনন্দের বহিঃপ্রকাশ– যা অশ্রুর মতো সব নিয়ন্ত্রণের বাঁধ ভেঙে তার উপস্থিতির জানান দিচ্ছে।'

বাদশার ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির রেখা। বললেন– 'এখন থেকে তোমরা পদে পদে এমন অজস্র অবিশ্বাস্য আনন্দের উপলক্ষ দেখতে পাবে।'

সবশেষে কামিনী এগিয়ে গেলে বাদশা ডান হাত বাড়িয়ে তার মাথার ওপর রেখে বললেন– 'তোমার এতো শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের নিরিখে ক'কদম এগিয়ে আসাই যথেষ্ট।'

কামিনী তার কম্পিত হাতে বাদশার হাতে ভক্তি-শ্রদ্ধার চুমুর পরশ বুলিয়ে দেয়। তার হাত ভেজা ভেজা চোখে অনেকক্ষণ ধরে রেখে ডুকরে ডুকরে কেঁদে যাচ্ছে। বাদশার হাত দিয়ে তার চোখজোড়া মুছে চলেছে। কামিনীর অশ্রুর শীতলতা বাদশা অন্তরের গভীরতায় অনুভব করে যাচ্ছেন। পরিবেশ বেশ আবেগঘন। অশ্রুসিক্ত সবার চোখ। স্বয়ং বাদশার মোটা মোটা চোখের ওপর ছায়ার মতো লম্বা লম্বা ঘন পলকের কোণে কুয়াশার মতো অশ্রুকণা ঝরতে দেখা যাচ্ছে।

বাদশা বেশ কিছুক্ষণ গভীর চিন্তামগ্নতায় কামিনীর দিকে তাকালেন। এরপর মনের অজান্তে তার হাত চলে যায় শেরওয়ানির বোতামে। তিনি তা খুলে কামিনীর মাথায় তুলে দিয়ে এক সঙ্গীকে বললেন– 'কাসেম! কামিনীকে আমার তাঁবুতে পৌঁছে দাও।'

শেখর বাদশার ঘোড়ার কাছে এগিয়ে এসে বললো– 'সরকার! এ ব্যাপারে আমরা সবাই আপনার দয়া প্রার্থনা করছি।'

শেখর এবং তার সব সৈনিক হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। বাদশা বিস্ময়সূচক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন– 'এ ব্যাপারে তোমরা কেন দয়ার দরখাস্ত করছো? আমি তোমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি।'

শেখর বললো– 'আমরা সরদার নাদের খানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, কামিনী ছাড়া আমরা জীবিত ফিরে আসবো না... ।'

বাদশার চেহারায় বিস্ময়ের আলোক আভা। মৃদু হাসি ছড়িয়ে তিনি সফরসঙ্গী কাসেম নামীয় সরদারকে নির্দেশ দিয়ে বললেন– 'কাসেম! এখানে কামিনীর

www.pathagar.com

জন্য তার উপযুক্ত করে পৃথক তাঁবু স্থাপন করো। তুমি আমার কথা বুঝছো তো নাকি?' এ কথা বলে বাদশা চলে যান।

বাদশার পারসিক শেরওয়ানিতে কামিনীর মাথা ঢাকা পড়েছে। তার মনের নিষ্পাপ কম্পনে এক ঐশ্বরিক ভক্তি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বাদশা যাওয়ার সময় কাসেমকে আরো একটি নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, আমিরে আউয়াল সাইয়েদ হায়দার সুলতান যেন তার বিশেষ বাহিনী নিয়ে এখানে তাঁবু স্থাপন করে।

মুহূর্তের মধ্যেই তীব্র বেগে আগুয়ান ঘোড়ার টগবগ শব্দে আকাশ প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। একটু পরই বনের গহিনে হারিয়ে যান বাদশা।

www.pathagar.com

সর্বত্র প্রতিরোধ

ওদিকে ভদ্রেকের মৌয়াল গোপাল ও তার সঙ্গী যুবকেরা ভোর হতে হতেই গ্রামের গোটা আবাদি এলাকায় লোকজনের চিন্তা-ভাবনার পট পাল্টিয়ে দিয়েছে। ঘৃণার আগুনে জ্বলতে থাকা মানুষের মনে চাপা ক্ষোভ ও প্রতিশোধের স্পৃহা তীব্র আকার ধারণ করেছে। ঘরে ঘরে আসাম বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। আহত ও সম্ভ্রম হারানো মেয়েরা এ ক্ষেত্রে ছিলো অগ্রগামী। ঘরে ঘরে তির, বল্লম, বর্শা ইত্যাদি ধার দেয়া হয়েছে। এসব কাজ খুবই দ্রুততার সাথে অতি গোপনে ভোরের আগেই সম্পন্ন করা হয়েছে। সাথে সাথে রাজগোপাল গ্রামের চার-পাঁচজন অল্পবয়সী হিন্দুর মাথায় পূজারিদের মতো রাখির প্রলেপ এঁকে সকালের আগেই মন্দিরে পাঠিয়ে দেয়। তারা নিহত পূজারিদের লাশগুলো মন্দিরের পেছনের জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসে। নিয়ম অনুসারে ভোরে কাঁসর ঘণ্টা বাজানো হয়। দৃশ্যত সকলেই ভেবে নিয়েছে চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে সবকিছু চলছে, অথচ ভেতরে ভেতরে একটি বড় ধরনের বিপ্লব ইতোমধ্যে ঘটে গেছে।

আসাম সেনারা পূর্ণ স্বাধীনভাবে মুক্তমনে গ্রামের অলি-গলিতে চক্কর দিয়ে ফিরছে। আগে লোকজন তাদের হাত জোড় করে কুর্নিশ করতো মৃদু হেসে। কিন্তু আজ তাদের ভাবভঙ্গিতে কম্পন ও ভীতিমিশ্রিত চাহনির পরিবর্তে ক্ষোভের আঁচ দেখা যাচ্ছে। বিচক্ষণ ক'জন সিপাহির দৃষ্টি তা এড়াতে পারেনি।

এক জায়গায় তো ভদ্রেকি এক বৃদ্ধকে একজন আসাম সেনা জবরদস্তি করে জানতে চাইলো– 'মহাশয়জি! আজকের সকালের আলো তো অন্য দিনের মতো মনে হচ্ছে না, কারণ কী? সত্যি করে বলুন তো!'

www.pathagar.com

বৃদ্ধ আকাশের সূর্যের দিকে তাকিয়ে বড় অর্থবোধক ভঙ্গিতে মৃদু হেসে উত্তর দিলো– 'সূর্য তো আগেরটাই মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনার মন্তব্য অস্বীকারেরও উপায় নেই। আমার মনে হচ্ছে মৌসুম বদলে গেছে, বৃষ্টি হবে বোধ হয়!'

আসাম সেনা বৃদ্ধের দিকে বর্শা তাক করে বললো– 'তুমি নিজের মনের মৌসুমের ব্যাপারে বলো।'

বৃদ্ধ হকচকিয়ে সিপাহির দিকে তাকাতেই পাঁচ-সাতজন যুবক আশপাশে জড়ো হয়ে গেলো। আসাম সেনা এতে কিছুটা ভীত হয়ে পড়লো। কেননা সবার চোখে-মুখে ঘৃণা আর ক্ষোভের স্পষ্ট ছাপ দীপ্তমান। বৃদ্ধ প্রাণ বাঁচানোর দায়ে বললো– 'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

সিপাহি বললো– 'মানুষের আচার-আচরণে আমি বেশ পরিবর্তন লক্ষ করছি।'

বৃদ্ধ হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজার বিপক্ষে কেউ কি কোনো মতামত পোষণ করতে পারে?'

আসাম সেনা ঘোড়ার দিক পরিবর্তন করতে গিয়ে বললো– 'ঠিক আছে। হতে পারে এটা আমার সন্দেহ। কিন্তু দেখো– মহারাজা মহারাজাই, আর প্রজাদের প্রজার মতোই থাকা বাঞ্ছনীয়। নিজেদের মতাদর্শ ঠিক রেখো। কারও কিঞ্চিৎ আহম্মকি এখানে রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে পারে। রক্তের সেই নদীতে তোমাদের লাশ মাছের মতো সাঁতরাতে সাঁতরাতে মৃত্যুর ভয়ংকর অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে। এটা আমার বিনামূল্যে দেয়া পরামর্শ। এখন তোমরা নিজ নিজ ঘরে চলে যাও; সমাবেশ ঘটানো ঠিক নয়। আর শোনো! সন্ধ্যায় প্রচুর মদ সংগ্রহ করে রাখবে এবং নিজেদের কন্যাদের উত্তমরূপে সাজিয়ে রাখবে। সন্ধ্যা নাগাদ মহারাজাজির নতুন সেনা এসে পৌঁছাবে। নিশ্চয় তারা তখন ক্লান্ত অবসন্ন থাকবে। তোমাদের জানা থাকার কথা যে, পানির পরিবর্তে উন্নত মদ দ্বারা আর কোমল কুমারী কন্যা দ্বারা আমাদের সৈনিকদের ক্লান্তি দূর হয়।'

মধ্যবয়সী এক ভদ্রেকি হিন্দু তির্যক দৃষ্টিতে বললো– 'উন্নত মদ তো তৈরি করা যায় কিন্তু এখন মহারাজার তরতাজা নতুন সৈনিকদের জন্য কুমারী কন্যা কোথা থেকে আসবে?'

আসাম সেনা মুচকি হেসে বললো– 'তোমার কথা আমি বুঝেছি। তোমাদের কোমল কুমারীদের কিছুই বিগড়ে যায়নি... ব্যস, একটু ভালো করে সাজিয়ে

www.pathagar.com

রাখলেই কুমারীর মতো দেখা যাবে। সোনা-রুপা যতো বেশি ধার দেয়া হয় ততো বেশি তা চকচক করতে থাকে, দেখতে ভারি সুন্দর লাগে। আমার কথা বুঝছো তো!' সিপাহি ঘোড়া দৌড়িয়ে এগিয়ে চললো।

ভদ্রেকি যুবক ও বৃদ্ধরা ক্ষোভে-দুঃখে তাদের ঠোঁট দাঁতের নিচে ধরে কামড়াচ্ছে। বৃদ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে বললো– 'অন্ধজগতের এই বাসিন্দাদের জীবনপ্রদীপ নিভে আসার সময় এসেছে।'

এরপর দ্রুত সে কদম উঠিয়ে বললো– 'এসো ভাই! রাজগোপাল মৌয়ালকে বলে আসি যে, আজ রাতে গ্রামে আরেক কেয়ামতের বিভীষিকা ধেয়ে আসছে!'

***

মহারাজা জয়ধ্বজ সিং ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে অজগরের মতো ফুঁসফুঁস করছেন। 'আমি জানতে চাচ্ছি, তোমাদের এতো বড় সেনাবাহিনী ক্ষুদ্র একটি বসতিকে এখনো জয় করতে পারলো না! এই গোটা দেশ কীভাবে তোমরা জয় করবে? ঠাকুর ও তোমাদের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সর্বসাকুল্যে চল্লিশ হাজারের কম নয়। চল্লিশ হাজার সৈন্য দুই দিন ধরে লড়াই করে একটি বসতিকে পরাজিত করতে পারলো না! উল্টো নিজেদের হাজার হাজার সৈন্যের মরা মুখ নিয়ে লজ্জাজনক অবস্থায় পিছু হটে এসেছো! তোমরা তো হিন্দু জাতির ইজ্জত ধুলোয় মিশিয়ে দিলে!'

প্রতাপ হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজ! আমাদের শরীরে যতোগুলো আঘাতের চিহ্ন আছে সবই বুকের ওপর। আপনি যদি আমাদের পিঠে আঘাতের কোনো চিহ্ন দেখতে পান, তাহলে নিজ তরবারি দিয়ে আমাদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে দিন।'

মহারাজা কিছুটা নরম সুরে বললেন– 'প্রতাপ! তোমাদের বীরত্বের ব্যাপারে সব সময় আমার আস্থা আছে। এ মুহূর্তে আমি এটা ভেবে কূল পাই না যে, আমাদের পরাজয়ের মূল হেতু কী?'

দরবারে নিস্তব্ধ পরিবেশ। সবাই নিজ নিজ স্থানে চিন্তারত ও উদ্বিগ্ন। শেষে মহারাজা রামদাস শর্মাকে উদ্দেশ করে বললেন– 'প্রধানমন্ত্রী! এ ব্যাপারে আপনার কী মতামত?'

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে এসে মহারাজার পা ছুঁয়ে কুর্নিশ করে বললেন– 'মহারাজ! মনে হচ্ছে মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে আমরা কোনো ধরনের ভ্রান্তির শিকার।'

প্রতাপ বজ্রকণ্ঠে বললো– 'না! শ্রী প্রধানমন্ত্রীজি, আপনার মন্তব্য সঠিক নয়! শত্রুসংখ্যা আমাদের চেয়ে অধিক নয়। এছাড়া তাদের সৈনিকদের চার চারটি করে হাত নেই!'

'তাহলে ঘটনা কী?' এবার সেনাপতি কৃষ্ণকুমার প্রতাপকে লক্ষ করে বললো। দৃঢ়কণ্ঠে সে বললো– 'মহারাজাজি! আমাদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে।'

'ধোঁকা দেয়া হয়েছে!' মহারাজা তার আসনে নড়েচড়ে বসলেন।

প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি ছাড়া আসামের বড় বড় বেশ ক'জন নেতাকে জিজ্ঞাসু নেত্রে কিছু বলতে দেখা যাচ্ছে। মহারাজা প্রতাপকে উদ্দেশ করে বললেন– 'আমি বিস্তারিতভাবে তোমার কথা শুনতে চাই। কাদের কাছ থেকে আমরা ধোঁকা খেয়েছি কিংবা কারা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!'

প্রতাপের দৃষ্টি মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের আসনের পেছনে বসে থাকা জগন্নাথ মন্দিরের মহাত্মার দিকে নিবদ্ধ। সে বললো– 'শ্রীমান মহাত্মা এবং তার অন্য সঙ্গীরা এ ব্যাপারে দায়ী।'

মহাত্মা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং চিৎকার দিয়ে বললেন– 'অপদার্থ সিপাহি! নিজের মুখে লাগাম টেনে ধরো, নইলে দেবতার ক্রোধ তোমাকে ভস্ম করে ছাড়বে!'

মহারাজা মহাত্মাকে বসার নির্দেশ দিয়ে বললেন– 'মহাত্মাজি! ধৈর্য ধরে বসুন। তাকে তার বক্তব্য শেষ করতে দিন।'

ঠিক এ সময়ে চৌকিদার এসে জানালো, গোহাটি থেকে একজন বার্তাবাহক এসেছে। মহারাজা তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেন। তিনি আসাম বাহিনীর একজন অভিজ্ঞ মধ্যবয়সী নেতা। তিনি এসে মহারাজার পায়ে মাথা রেখে দিলেন। মহারাজা বললেন– 'গোহাটি থেকে কী বার্তা নিয়ে এলে?'

বার্তাবাহক মাথা নুইয়ে বললো– 'গোহাটির সমাচার শুভ নয়, অন্নদাতা!'

মহারাজার পায়ের নিচে আরেকবার কটমট শব্দ হলো। তিনি ক্রোধে ফেটে পড়া কণ্ঠে বললেন– 'সেনাপতিজি! শুনছো তুমি?'

গোহাটি থেকে আগত দূত বললেন– 'অন্নদাতা! আগামীকালের মধ্যেই যদি গোহাটির বিরুদ্ধে লড়তে থাকা সেনাদের সহায়তায় নতুন বাহিনী পাঠানো না হয়, তাহলে সবার মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।'

www.pathagar.com

'কিন্তু... এসব কী করে হয়ে গেলো!' মহারাজা ক্রোধান্বিত হয়ে চিৎকার ছুড়লেন।

আসাম দূত বললেন– 'মহারাজ! এই মহাত্মাজি এবং আরো ক'জন পণ্ডিত পূজারি আমাদের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, যখন যেখানে আসাম বাহিনী পৌঁছাবে, সেখানেই হিন্দু জাতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে আসাম সেনাদের সঙ্গী হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্বত্র আমাদের ধোঁকা দেয়া হয়েছে। হিন্দু জাতির কোনো একজন সদস্যও আমাদের সঙ্গ দেয়নি; বরং আমি তো বলবো– আমাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে হিন্দুরা। আমাদের সম্পর্কে হিন্দুদের মনে এতো ঘৃণা– তা এতো দিন আমরা ভাবতেই পারিনি।'

মহারাজার নির্দেশে প্রতাপ তার কথা আবার শুরু থেকে বললো– 'মহারাজ! আমিও এটাই বলতে চাচ্ছি। আমাদের সাথে এভাবে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। সর্বত্র মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরাই আমাদের অধিক বিরোধিতা করেছে, ধ্বংস ডেকে এনেছে। গতকালের ঘটনা শুনে আমার অন্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। হিন্দু নারীরা রাতের বেলায় পুরুষের পোশাক পরে বের হয়েছে। তারা আমাদের নিহত সৈনিকদের লাশের কাছে গিয়ে বর্শা দিয়ে চোখ উপড়ে ফেলেছে। আর চিৎকার করে সব লাশের গায়ে থুতু ছিটিয়ে সমস্বরে বলেছে– বুনো কুকুরেরা! এবার এসো আমার যৌবনের সাথে খেলা করে নিজ আত্মার পিপাসা নিবারণ করো।'

মহারাজা আসন পরিবর্তন করে বললেন– 'কিন্তু আমার কাছে তো খবর এসেছে– নাদের খানের বসতির সব হিন্দু বিদ্রোহ করে বসতির প্রাচীরের প্রধান ফটক ভেঙে ফেলেছে!'

প্রতাপ বললো– 'তবে তো ধোঁকাবাজরা মহারাজের সাথে মস্ত বড় ধোঁকাবাজি করেছে!'

মহারাজা বললেন– 'কোথায় ওই যুবক... শেখর!'

সেনাপতি একজন সশস্ত্র চৌকিদারকে উদ্দেশ করে বললো– 'যাও, শেখরকে নিয়ে এসো।'

মহারাজা মহাত্মাকে লক্ষ করে বললেন– 'আপনি তো আমাদের বলেছিলেন...'

এখনো মহারাজার কথা শেষ হয়নি, এমন সময় এক সৈনিক দৌড়ে এসে মহারাজার পায়ে পড়ে বললো– 'মহারাজ! শেখর ও তার সঙ্গীরা পালিয়ে গেছে।'

www.pathagar.com

মহারাজা বললেন– 'কিন্তু কেন? এভাবে তাদের আসা এবং পালিয়ে যাওয়ার রহস্য কী?'

ওই সৈনিক হাত জোড় করে বললো– 'সে তার উদ্দেশ্য সাধন করে গেছে, মহারাজ! সে কামিনী এবং অন্য কয়েদিকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে... ।'

মহারাজার হাতে তরবারি চিকচিক করে উঠলো। এক পলকেই আসাম সিপাহির মস্তক শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে রইলো মেঝেতে।

'সে কামিনী আর মোহনকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে আর তোমরা আঙুল চুষছিলে?' মহারাজা আহত বাঘের মতো গর্জন করে যাচ্ছেন।

মহারাজা রক্তে ভেজা তরবারি সামনের টেবিলে রেখে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বললেন– 'বন্দীখানার দারোয়ানদের হাজির করা হোক।'

চৌকিদার একটু থেমে পরে বললো– 'মহারাজ! দারোয়ানও নিখোঁজ... ।'

'কী ব্যাপার! তাদের কি খুন করে ফেলা হয়েছে?'

'জানি না, মহারাজ! তাদের লাশ তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না!' চৌকিদার বললো।

মহারাজা তার সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বললেন– 'কৃষ্ণকুমার! এসব কী হচ্ছে?'

কৃষ্ণকুমার বললো– 'মহারাজ! মনে হচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে মাটির নিচ থেকে কোনো ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে! আর এই ষড়যন্ত্রের ভিত বহু গভীরে প্রোথিত।'

মহারাজা বললেন– 'কথা স্পষ্ট করে বলো! ওই ষড়যন্ত্রের পেছনে কার হাত থাকতে পারে? তোমার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করো!'

কৃষ্ণকুমার বললো– 'আমি অনুভব করতে পেরেছি, গ্রামের লোকজনের দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট মাত্রায় বিগড়ে গেছে আমাদের বিরুদ্ধে।'

মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের হাত আবার তরবারির দিকে এগিয়ে যায়। তরবারিতে হাত রেখে তিনি বললেন– 'এ ব্যাপারটি যদি প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে গ্রামের প্রতিটি ঘরবাড়ি উপড়ে ফেলে দাও! কোনো শিশুকেও জীবিত ছাড়বে না! আমি এ দাম্ভিকদের গোটা বংশের পাতা নির্মূল করে দেয়ার আদেশ দিচ্ছি! দুপুরের আগেই আমাকে তদন্তের ফলাফল জানাও!'

এরপর মহারাজা মৌয়াল গোপালকে উদ্দেশ করে বললেন– 'মৌয়ালজি! যদি আমাদের সেনাপতির মন্তব্য সত্যি বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে আজ রাতের জোছনার আলো দেখার সৌভাগ্য গ্রামবাসীর কপালে জুটবে না!'

www.pathagar.com

মহারাজা দাঁড়াতে গিয়ে বললেন– 'কৃষ্ণকুমার! এ ব্যাপারে আমি অধিক সময়ক্ষেপণ বরদাশত করবো না। তাৎক্ষণিকভাবে গোটা গ্রাম ঘিরে তদন্ত শুরু করে দাও এবং দ্রুত আমাকে সংবাদ জানাও।'

রাজগোপাল দরবার থেকে বেরোলে তার কদম বেশ ভারী অনুভূত হয়। তিনি নিজের এবং গ্রামের প্রতিটি প্রাণীর আশপাশে মৃত্যুর ঘোর অমানিশার ছায়া দেখতে পান। দীর্ঘক্ষণ মাথা নুইয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি দৃঢ় এক প্রতিজ্ঞায় মাথা ওপরের দিকে উঠিয়ে নিজে নিজেই বলে উঠলেন– 'ইজ্জতের মৃত্যু লাঞ্ছনার মৃত্যুর চেয়ে শ্রেয়। মৃত্যুকে যখন আমরা বেছে নিয়েছি, তো ভয়ের কী আছে!'

অশোক সম্ভবত তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলো। সে জিজ্ঞেস করতেই দরবারে সংঘটিত সব ব্যাপার তিনি তাকে শোনালেন। এরপর বললেন– 'এ মুহূর্তেই তুমি সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে মুসলমানদের অবহিত করো। এসব কিছু দুপুরের আগেই হয়ে যেতে হবে। নইলে আজ রাতই হবে গ্রামবাসীর শেষ রাত।'

তার নিকটেই দাঁড়ানো ছিলো একজন যোগী। তার কাঁধে বসে আছে একটি কবুতর। সে বড় উদাস ভঙ্গিতে মৌয়াল ও অশোকের দিকে তাকিয়ে বললো– 'মৌয়ালজি! ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তুমি সুড়ঙ্গের দরজা খুলে দাও। অবশিষ্ট সব কাজ এমনিতেই হয়ে যাবে।'

সাথে সাথে সে খুব দ্রুত কাগজের একটি টুকরোয় কিছু লিখে তা ভাঁজ করে কবুতরের গলায় বেঁধে দিলো এবং কবুতরটি উড়িয়ে দিলো। এরপর সে গোপন সঙ্গীদের বললো– 'তোমরা যুবকদের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দাও। আল্লাহ চাইলে বাদশা আলি কুলি খানের বাহিনী দুপুরের আগেই গ্রামে পৌঁছে যাবে।'

মৌয়াল ও অশোক আশ্চর্য হয়ে যোগীর দিকে তাকালো। এটা দেখে যোগী বললো– 'তোমরা চলে যাও, কেউ দেখে ফেলবে! আমি মুসলিম বাহিনীর প্রথম বহরের একজন গুপ্তচর সৈনিক। চিন্তার কোনো কারণ নেই, মুসলিম বাহিনী এখানে আশপাশেই অবস্থান করছে।'

কজন আসাম সেনার সওয়ারি দেখে রাজগোপাল ও অশোক উভয়ে যোগীর পায়ে পড়ে কাঁদতে থাকে। আসাম সেনারা কাছে এসে ঘোড়া থামায়। তারা গভীর দৃষ্টিতে যোগীকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। যোগী গাঢ় রঙের ধুতি পরে আছে। আকাশি রঙের একটি চাদরে তার শরীর ঢাকা। গায়ের রঙ ধূসর। পায়ে গাছের তৈরি শক্ত খড়ম।

www.pathagar.com

এক আসাম সেনা বললো– 'যোগীজি! কোথা হতে এসেছো?'

যোগী বেপরোয়া ভাব নিয়ে বললো– 'তুমি আমার সাথে এমন কর্কশ ভাষায় কথা বলো না, বৎস! আমি তো বারো বছর সন্ন্যাসব্রত শেষে মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের সৈনিকদের রক্ষা করতে এদিকে এসেছি। আমাকে দেবতা আর অবতার এ নির্দেশ দিয়েছেন। বেটা! যোগীদের সাথে সম্মান দেখিয়ে কথা বলতে হয়। এখন তোমরা যাও, আমি মহারাজাকে রক্ষার জন্য মন্দিরে গিয়ে তপস্যা করে আসি।'

উভয় আসাম সেনা ঘোড়া থেকে নেমে যোগীর পা ছুঁয়ে চুমুর প্রলেপ দিয়ে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলো। সুদর্শন যোগী দক্ষতার সাথে পরিস্থিতি সামাল দিলো। এরপর সে আসাম সেনাদের মাথার ওপর হাত উঁচু করে তুলে ধরে বললো– 'এখন তোমরা চলে যাও! ভগবান তোমাদের রক্ষা করবেন।'

সেনারা উঠে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলে গেলো। অল্প কিছুক্ষণ পরে রাজভবনের দিক হতে সানাই, বেহালা ও ঢোলের আওয়াজ ভেসে আসতে লাগলো। যোগী রাজগোপাল ও অশোককে লক্ষ করে বললো– 'আমার মনে হচ্ছে, এদিকে জগন্নাথ মন্দিরের পূজারিরা আসছে। যেভাবেই হোক, এই খবিশদের গুম করে ফেলো, নইলে মন্দিরের পূজারিদের খুনের ঘটনা ঢেকে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। নিজেদের বেশি থেকে বেশি লোক সমবেত করে মন্দিরের ভেতরে ও বাইরে ছড়িয়ে দাও। এতো অধিক পরিমাণে শোরগোল করতে থাকবে, যেন কেউ কিছু টের না পায় যে ভেতরে কী হতে চলেছে। বাহির থেকে কোনো আসামীয় সেনাকে ভেতরে আসতে দেবে না। সময় খুব কম, যাও!'

রাজগোপাল ও অশোক দ্রুত পায়ে হেঁটে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় একটি গলিতে। এরপর দেখা যায় জগন্নাথ মন্দিরের পূজারিদের মিছিল। মহাদেব হরিচন্দ আগে আগে চলছেন। ছোট ছোট রক্তিম চোখ, মাথা কামানো, মেদবহুল পেট, হাতে ঝান্ডাবাহী লাঠি। এই শয়তান এক আশ্চর্য ফেরাউনি ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে হাতির মতো হেলেদুলে চলছে।

ভদ্রেক গ্রাম ভেতরে ভেতরে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। সবার ভেতরে মৃত্যুর বিভীষিকাময় অপেক্ষা। এক ধমকে হাজার হাজার প্রাণ উড়ে যাওয়ার আশঙ্কা বেড়েই চলেছে ধীরে ধীরে। আসাম বাহিনীর সেনাপতি কৃষ্ণকুমার ও প্রধানমন্ত্রী রামদাস শর্মা শিকারি কুকুরের মতো ভদ্রেকের হিন্দু অধিবাসীদের মনোভাবের তদন্ত করে ফিরছে। অসংখ্য আসাম সেনা বন্দীখানার

www.pathagar.com

দারোয়ানদের লাশের সন্ধানে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে– যারা কামিনী ও মোহনের পাহারায় নিয়োজিত ছিলো। কৃষ্ণকুমার ও রামদাস শর্মার সন্দেহ বেড়েই চলেছে।

এ জায়গায় প্রধানমন্ত্রী বললেন– 'শ্রী কৃষ্ণকুমারজি! মনে হচ্ছে, ওই লোকেরা কামিনী ও মোহনের সাথে আমাদের সৈনিকদেরও উঠিয়ে নিয়ে গেছে।'

'অবস্থাদৃষ্টে তো তা-ই মনে হচ্ছে।'

কৃষ্ণকুমারের প্রত্যুত্তরে প্রধানমন্ত্রী আবার বললেন– 'আমার আরো মনে হচ্ছে, এই নিরিবিলি ঘটনা বড় ধরনের কোনো ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ সংকেত!'

কৃষ্ণকুমার ঘৃণাভরে মাটিতে থুতু ছিটিয়ে বললো– 'আমি ঘূর্ণিঝড়ের দিক পাল্টে দিতে জানি। ওই অপদার্থদের জীবনকাল কেবল আজকের দিনটিই বাকি। রাতেই তাদের রক্তে ঐতিহাসিক হোলি খেলা চলবে!'

প্রতাপকে দশ হাজার অশ্বারোহীর আরো একটি বাহিনী দিয়ে বিদায়কালে জয়ধ্বজ সিং বললেন– 'সঙ্গে পঞ্চাশটি কামানও নিয়ে যাও। বসতির নিরাপত্তাপ্রাচীরটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। বিক্রম পৌছাতেই সেনাপতি কৃষ্ণকুমারকেও তোমার সাহায্যে পাঠানো হবে। আজকের রাতই নাদের খানের বসতিবাসীর জন্য শেষ রাত হওয়া চাই। আমি আগামীকাল বসতির ধ্বংসাবশেষে রক্ত, ধোঁয়া আর লাশের মিছিল ছাড়া আর কিছু দেখতে চাই না। নাদের খান আমাদের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাথাব্যথাকে আমি অধিক সহ্য করতে পারি না।'

প্রতাপ মহারাজার পায়ে চুমু খেয়ে নিজের তরবারির কোষে হাত দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললো– 'মহারাজের আদেশ শিরোধার্য। আপনার প্রত্যাশা পূরণে আমরা জীবন বাজি রেখে লড়ে যাবো।'

বসতির মন্দিরের ভেতরে-বাইরে প্রচুর মানুষের শোরগোল। জগন্নাথ মন্দিরের মহাদেব হরিচন্দ তার সঙ্গীদের সাথে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতেই পূর্ব হতে স্থির করা কৌশল মতে মন্দিরের সব কটি দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। বাইরে লোকজন গলা ফাটিয়ে স্লোগানের পর স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে– 'মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের জয় হোক, মহাত্মার জয় হোক, হিন্দু জাতির জয় হোক...' ইত্যাদি।

এক আসামীয় সেনা রাজগোপালকে জিজ্ঞেস করলো– 'মহাশয়জি! আজ এমন কী নতুন ব্যাপার ঘটলো যে, তোমাদের আবেগ-উচ্ছ্বাস এভাবে উথলে উঠেছে?'

www.pathagar.com

রাজগোপাল ক্ষোভ ঝাড়তে গিয়ে বললেন– 'এভাবে ডুবে মরার চেয়ে আর অধিক কী লজ্জার কথা থাকতে পারে যে, শত্রুরা আসামীয়দের উঠিয়ে নিয়ে গেছে!'

এক আসামীয় সেনা জানতে চাইলো– 'মন্দিরের দরজা কেন বন্ধ করে রাখা হয়েছে?'

রাজগোপাল বললেন– 'ভেতরে জগন্নাথ দেবতার মহাদেব ও তার সঙ্গীরা দেবতাদের চরণতলে বসেছেন, এটা তাদের আদেশ।'

লোকজন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে স্লোগান দিয়েই যাচ্ছে। যোগী মন্দির থেকে কয়েক কদম দূরে একটি বটগাছের নিচে লটকে থাকা একটি শাখা ধরে দাঁড়ানো। তাকে কোনো দেবতার সদৃশ আকৃতিতে চোখ বন্ধ করে জ্ঞান-ধ্যানে ডুবে থাকতে দেখা যাচ্ছে। রাজগোপাল এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে পরে দ্রুত এগিয়ে এসে যোগীকে লক্ষ করে বললেন– 'জগন্নাথের পূজারিদের মন্দিরের অন্দরমহলে বন্দী করে রাখা হয়েছে।'

যোগী চোখ মেলে বললেন– 'এখন দ্রুত সুড়ঙ্গের উভয় প্রান্তের দরজা খুলে দাও।'

আসন গাড়া অবস্থায় যোগীকে এমন দেখাচ্ছে, যেন সে হারানো কোনো বস্তুর সন্ধান করছে। নিজ আসনে ঘুরতে গিয়ে সে বললো– 'এখন তোমরা আমাকে একা থাকতে দাও। আজ্ঞা আসছে...।'

সে বটগাছের নিচ থেকে বেরিয়ে উন্মুক্ত স্থানে বসলো। কিছুক্ষণ পর তার কবুতরটি গোটা গ্রামে একটি চক্কর দিয়ে যোগীর কাঁধে এসে বসলো। যোগী কবুতরটি নিয়ে দ্রুতপায়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ঝাড়ের আড়ালে। রাজগোপালের কানে ভেসে আসছে যোগীর খড়মের ঠকঠক শব্দ। কিছুক্ষণ পর যোগী ওপর দিকের একটি গলিতে চক্কর দিয়ে ফের সেখানে পৌঁছে যায়। এরপর সে বললো– 'রাজগোপালজি! বাংলার হাকিম নবাব আলি কুলি খানের বাহিনী জঙ্গল চিরে ভদ্রেকের দক্ষিণ প্রাচীরের কাছে এসে পৌঁছেছে। আদম খানের মতো অভিজ্ঞ বীর পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের চৌকস বাহিনীর নেতৃত্বে এগিয়ে আসছে। হাকিম সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, সুড়ঙ্গের সাহায্যে আনুমানিক পাঁচ হাজার জানবাজ সেনাকে পাঠানো হোক– যারা গ্রামের নিষ্পাপ লোকজনকে রক্ষা করতে জীবনবাজি রাখবে।'

www.pathagar.com

রাজগোপাল আনন্দের আতিশয্যে বললেন– 'এ সংবাদ গ্রামবাসীকে শুনিয়ে আসি। ইজ্জত বাঁচানোর আরো একটি সুবর্ণ সুযোগ এসে গেছে।'

যোগী ঠোঁটের নিচে মৃদু হাসি চেপে রেখে বললো– 'মৌয়ালজি! আমরা সবাই মিলে সম্ভ্রম লুটেরাদের এই ঘাঁটি ধূলিসাৎ করে দেবো। তাদের কাছ থেকে প্রতিটি আঘাতের পাই পাই হিসাব নেয়া হবে।'

***

আদম খান তার বাহিনীকে জঙ্গল পার করিয়ে বিশেষ বিচক্ষণতায় ও সূক্ষ্ম কৌশলের সাহায্যে আসামীয় সেনাদের বিরাট বহরের ওপর এমন অতর্কিত আক্রমণ করে বসলো যে, সেনাপতি কৃষ্ণকুমার ও অন্য বাহিনীর নেতারা সে আক্রমণের ব্যাপারে কিছুই আঁচ করতেই পারেনি। সুড়ঙ্গ পথে প্রায় পাঁচ হাজার লড়াকু জানবাজকে মন্দিরের পেছনের ঘন বনের ভেতর পাঠানো হয়েছে। এরা সবাই এমন সাহসী যোদ্ধা– যাদের হাতে রয়েছে দোধারী তরবারি, ঢাল ও তির-বর্শায় ঠাসা তাদের কোমরবন্ধ। প্রশস্ত বাহুর অধিকারী এ যোদ্ধারা জমিনের যে প্রান্ত দিয়ে হাঁটতে শুরু করে, সে জমিনের প্রশস্ততা যেন মাথা নুইয়ে দেয় তাদের চরণতলে। এদের কারও তরবারি কোষমুক্ত হলে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিজলিরা আত্মগোপন করে গহিন অন্ধকারে। পাহাড়ের মতো অটল তাদের দৃঢ়তা। এই জানবাজ মুজাহিদদের কপালে সর্বদা লেগে থাকে সফলতার আলোকরেখা– সূর্যের কিরণের চেয়েও অধিক তেজি যার রশ্মি। সবার হাতে লম্বা লম্বা ঢাল। কোমরের সাথে বাঁধা আছে ধারালো তরবারি। সকলেই এক সুগঠিত সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। সবার বাহুতে সবুজ রঙের রুমাল।

এ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন সাইয়েদ হায়দার ইমাম। একজন তেজস্বী বাগ্মী ও চৌকস সৈনিক হিসেবেও হায়দার ইমামের বেশ সুনাম রয়েছে। তার কথার প্রতিধ্বনিতে রয়েছে এক সম্মোহনী জাদু– মুহূর্তেই সকলের চেতনায় যিনি বারুদ ধরিয়ে দেন। তার শীর্ষদেশে রয়েছে সোনালি রঙের মস্তকাবরণ। তিনি তার বাহিনীর সারিগুলোতে চক্কর দিয়ে মৃদুস্বরে অথচ চুম্বকের মতো প্রভাবক বক্তব্য পেশ করে যাচ্ছেন–

'শাহাদাত আমাদের অমৃত সুধা। শাহাদাত আমাদের ওই বিশেষ পরম সম্মানিত বস্তু– যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নিষ্পাপ ফেরেশতারাও ঈর্ষা

www.pathagar.com

করে থাকেন। যাদের অভ্যর্থনার জন্য জান্নাতুল ফেরদাউসের অনিন্দ্যসুন্দরী হুররা অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকে। খোদায়ে জুলজালাল তাঁর পথে শাহাদাতবরণকারীদের সম্পর্কে বলেন– শহিদরা জীবিত; তাদের মৃত বলো না! ... তারা আমার পক্ষ থেকে এমনভাবে রিজিকপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, যেভাবে জীবিতরা রিজিকপ্রাপ্ত হয়। অথচ সে ব্যাপারে তোমরা কিছুই জানো না! কেননা, তোমাদের চিন্তা-চেতনা আর অনুভূতিশক্তি এই রহস্য উন্মোচনে যথেষ্ট অপারগ। শহিদদের মতো ঈর্ষণীয় প্রতিদান আর কে পাওয়ার যোগ্যতা রাখে!'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম এরপর বলতে শুরু করলেন– 'আল্লাহর সিংহরা! আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের জন্য তাদের অপরিসীম আত্মত্যাগের বিনিময়ে চির শ্বাশত আলোর সন্ধান দিয়ে গেছেন। এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, আমরা যেন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সরল সোজা পথটি নিজের রক্তের বিনিময়ে আলোকোজ্জ্বল করে রাখি। বাতি থেকে বাতি জ্বলতে থাকলে কেয়ামত পর্যন্ত এ শ্বাশত আলোর ধারাবাহিক প্রজ্জ্বলন অব্যাহত থাকবে।'

এমন সময়ে গ্রামের বৃদ্ধ মৌয়ালকে দেখা গেলো। হায়দার ইমাম সামনে এগিয়ে এসে সম্মানের সাথে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'কী সমাচার?'

'মহারাজা জয়ধ্বজ সিং গ্রামবাসীকে সমূলে হত্যা করার জন্য সাধারণ ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। এখন আসামীয় সেনারা গ্রামের ভেতর হামলে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম মৃদু হেসে বললেন– 'আমাদের মস্তক খুনির খঞ্জরের অপেক্ষা করছে।'

মৌয়াল জিজ্ঞেস করলেন– 'আমরা জগন্নাথ মন্দিরের শয়তান প্রকৃতির পূজারিদের মন্দিরের অন্দরমহলে বন্দী করে রেখেছি; তাদের ব্যাপারে কী নির্দেশ দিচ্ছেন?'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম অবাক হয়ে মৌয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'এটা তোমরা খুব ভালো কাজ করেছো। তাদের বের করে এখানে নিয়ে এসো। এই খবিশদের এই মুহূর্তেই এখান থেকে বের করে হাকিমের কাছে পৌঁছে দেয়া খুবই জরুরি। এই প্রেতাত্মাদের উপস্থিতিতে যেকোনো সময় আরো মারাত্মক কোনো ক্ষতিসাধন হতে পারে।'

www.pathagar.com

মৌয়াল তার সাথে দুজন মুসলিম সৈনিককে নিয়ে মন্দিরের দিকে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর মোটা মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে বুনো ষাঁড়ের মতো বদ আকৃতির চারজন দুরাচার পূজারিকে সাইয়েদ হায়দার ইমামের সামনে দাঁড় করানো হয়। ওদের ছোট আকারের ভারী চোখগুলো মৃত্যুর ভয়ে থরো থরো করে কাঁপছে। তাদের সন্ত্রস্ত মুখগুলোতে দেখা যাচ্ছে মৃত্যুর বিভীষিকাময় ভীতির ছাপ।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম ঘৃণা ও তিরস্কারের সুরে তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'অগণিত অসংখ্য নিষ্পাপ প্রাণের প্রবাহিত রক্ত ইনসাফ প্রার্থনা করছে। তোমাদের লালসাবৃত্তি যে আগুনে ফুৎকার দিয়েছে, না জানি সেই আগুনে কতো নিষ্পাপ বনি আদম পুড়ে মারা যায়! কী পরিমাণ ঘরের আলোক পিদিম নিভে যায় চিরতরে! কতো অজস্র প্রস্ফুটিত ফুল কলি ফোটাবার আগেই ঝরে পড়ে যায়! কতো না বাগান দগ্ধ হয়েছে, কতো ফুল ঝরে গেছে অকালে! হে পুষ্পের শত্রুরা! হে আলোর আসামিরা! মৃত্যু তো তোমাদের পাপের খুবই নিম্নমানের শাস্তি!'

এরপর হায়দার ইমাম তার দুই সিপাহিকে বললেন– 'এই প্রেতাত্মা বদমাশদের সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে আদম খানের কাছে নিয়ে যাও। আর তাকে এই বার্তা দেবে যে, আসামি ওইসব পাপিষ্ঠ– যাদের লালসার শিকার হওয়া অগণিত কুমারীর সম্ভ্রম হারানোর কথা জগন্নাথ মন্দিরের অন্দরমহলের প্রাচীরগুলো এখনো গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে জানান দিচ্ছে!'

একটু পরই চতুর্দিকে ঘোড়ার টগবগ শব্দে দিগ্‌বিদিক মুখর করে তুললো। সঙ্গে সঙ্গে শোরগোল আর স্লোগানে স্লোগানে চতুর্দিক কেঁপে কেঁপে উঠলো।

ভদ্রেকের যুবক, বৃদ্ধ ও শিশুরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইজ্জতের মৃত্যুকে সাদরে বরণ করে নেয়ার জন্য যুদ্ধমাঠে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ভদ্রেকের আঘাতপ্রাপ্তা মেয়েরাও তাদের পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তরবারি ও তিরের সাহায্যে আসামীয় নরপিশাচদের মোকাবেলা শুরু করে দেয়। সব কটি ঘরের ছাদে তিরন্দাজদের বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম নিজ সঙ্গীদের উদ্দেশে বললেন– 'শক্ত করে হাত দিয়ে ঢালগুলো ধরে রাখো। শাহাদাতের প্রান্তরে ভালোবাসার দ্বারগুলো উন্মুক্ত হতে শুরু করেছে। নিজেদের জন্য শাহাদাতের প্রত্যাশা নিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে চলো। দীন-দুনিয়ার মালিকের দয়া আমাদের দিকে ঝুঁকে আছে। শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিতে আমাদের প্রাণ উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

www.pathagar.com

মন ভরে তৃষ্ণা মেটাও যোদ্ধারা! তৃষ্ণা নিবারণকারীর বদান্যতা অসীম, অফুরন্ত! তিনি প্রার্থনাকারীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেই ছাড়েন, দিয়ে থাকেন হিসাব ছাড়া।'

অতঃপর হঠাৎ করে বাইরের দিকে নারায়ে তাকবির ধ্বনি উচ্চকিত হতে লাগলো। আল্লাহর বড়ত্বের শান ও মর্যাদার সাক্ষীস্বরূপ ঘরের দেয়ালগুলোতে কম্পন দেখা দিলো। এটা মুসলিম বাহিনীর ওই জানবাজের উচ্চকণ্ঠের স্লোগান, যে কখন জানি যোগীর খোলসে ভদ্রেকে ঘাঁটি গেড়ে বসে ছিলো। তার স্লোগানের সাথে সাথেই মন্দিরের বন্ধ দরজা খুলে যায়। পর্বতসম সাহসী বীর সেনানীদের পা পড়তেই ধরিত্রীর বুক থরো থরো করে কেঁপে ওঠে।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও তার পাঁচ হাজার সিপাহি সিংহের মতো পঞ্চাশ পঞ্চাশজনের দলে ভাগ হয়ে গোটা গ্রামের অলি-গলিতে ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তেই আল্লাহর সিংহরা আসামীয় সেনাব্যূহ তছনছ করে ছাড়ে। যেখানে অশ্বারোহী আসামীয় সেনার দেখা মেলে, সেখানেই নির্ঘাত মৃত্যুর মুখে পতিত হতে বাধ্য করে তারা।

ভদ্রেকের নির্মমতার শিকার মেয়েরা চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে— 'মানবতার অকৃত্রিম বন্ধুরা! ভগবানের পবিত্র এই ধরিত্রীকে এসব নরপশুর অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করো! তোমাদের আমাদের লুণ্ঠন হওয়া সম্ভ্রমের শপথ! তাদের সাথে কোনো অবস্থাতেই দয়া-কোমলতা দেখাবে না!'

ঠিক এমন সময়ে বাইরে থেকে আদম খানের হায়দারি স্লোগান উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হলো। মুসলিম বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে এলো গোটা ভদ্রেক গ্রাম। একটি ঘরে সাইয়েদ হায়দার ইমাম কয়েকজন আসামীয় সেনাকে দেখতে পান। তারা একটি মেয়েকে একা পেয়ে তার সাথে বাড়াবাড়ি ধরনের আচরণ করছিলো।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম সিংহের বজ্রতায় বলে উঠলেন— 'মানবতার শত্রুরা! এই নিষ্পাপ মেয়েটির দিকে হাত ওঠানোর সময় তোমাদের এটুকু ভাবনাও আসেনি যে, তার আর্তচিৎকারের প্রতিধ্বনিতে আরশ বহনকারীরাও প্রকম্পিত হয়েছে!'

আসাম সেনারা ভালো করে বুঝেও উঠতে পারেনি যে, তড়িৎ সাজা কীভাবে তাদের ঘায়েল করে ফেলেছে। সাইয়েদ হায়দার ইমামের উভয় হাত নড়ে উঠলো। তরবারির একটি আঘাতই উভয়ের জীবনতরি নিমিষেই ডুবিয়ে

www.pathagar.com

দিলো। নিজেদের খুনের নদীতে সাঁতরাতে সাঁতরাতে তারা অনুভব করলো মৃত্যু কতো ভয়ংকর!

সাইয়েদ হায়দার ইমাম ঝুঁকে বিছানায় পড়ে থাকা চাদর উঠিয়ে মেয়েটির খোলা মাথায় চড়িয়ে দিয়ে বললেন- 'বোন, ক্ষমা করে দিও। তোমার ভাই তোমার ব্যাপারে লজ্জিত। আজ আমাদের উপস্থিতিতে তোমার ওপর অন্যায় করা হয়েছে। আমরা নিজেদেরই তোমার আসামি মনে করছি।'

এটা বলেই সাইয়েদ হায়দার ইমাম দ্রুতপায়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মেয়েটি সামনে এগিয়ে এসে তার পায়ের নিচের মাটি তুলে মাথায় রাখির মতো প্রলেপ দিয়ে পাগলির মতো অট্টহাসিতে চিৎকার করে বলছে- 'অপদস্থ কুকুরের দল! দেখেছিস ইজ্জত রক্ষাকারীদের বাহুতে কী পরিমাণ শক্তি থাকে!' এরপর সে টেনেহিঁচড়ে লাশগুলো গলির মুখে নিক্ষেপ করলো। পরে তরবারি হাতে নিয়ে বীরদর্পে বাইরে বেরিয়ে এলো।

মহারাজা জয়ধ্বজ সিং ভীত হয়ে বাসভবনের একটি কক্ষে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছেন। তার হাজার হাজার সিপাহি মৃত্যুর খোলা মাঠে খোলা আকাশের নিচে মাটি ও রক্তের সাথে মাখামাখি হয়ে শুয়ে আছে। আদম খানের বাহিনী চতুর্দিক হতে আসামীয় সেনাদের ঘিরে রেখেছে।

কৃষ্ণকুমার দৌড়ে এসে মহারাজা জয়ধ্বজ সিংকে লক্ষ করে বললো- 'মহারাজা! জলদি করুন!'

মহারাজা জয়ধ্বজ সিং তার তরবারি উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে বললেন- 'আমিও রণাঙ্গনের মানুষ, তরবারি চালাতে জানি। মৃত্যু তো এতো সহজ নয়! কিন্তু সময় যদি বাধ্য করে, তবে আমি যুদ্ধের মাঠে মরার জন্য হিম্মত রাখি।'

কৃষ্ণকুমার বললেন- 'মহারাজা! এটা আবেগপ্রবণ কথাবার্তার সময় নয়। বিক্রম পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের এখান থেকে পিছু হটতে হবে।

মহারাজা জয়ধ্বজ সিং তরবারি কোষমুক্ত করে বললেন- 'আমি এই গ্রামের প্রতিটি ঘর সমূলে উৎপাটন করতে চাই। এই বিশ্বাসঘাতকদের গোটা বংশ আমি রক্তনদীতে চুবিয়ে মারবো।'

মহারাজা জয়ধ্বজ সিং খুব দ্রুত তার নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে কামিনীদের ভবন থেকে বেরিয়ে গেলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হওয়ার আগেই মহারাজা জয়ধ্বজ সিং তার অবশিষ্ট সেনাদের নিয়ে জগন্নাথ মন্দিরের

www.pathagar.com

দিকে পিছু হটেন। সেখানে বিক্রম তার পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের বহর নিয়ে একত্রিত হবে।

এদিকে আসামীয় বাহিনীর বড় একটি অংশ যুদ্ধের মাঠে নিহত হয়েছে। আদম খান চার-পাঁচ মাইল পর্যন্ত আসামীয় বাহিনীর পিছু ধাওয়া করেছে, এরপর সে ফিরে এসেছে।

***

আকাশ খুব মেঘলা। খানিকটা বাতাসের সাথে বৃষ্টি হচ্ছিলো। গাছের আম আর জামরুল ঝরে পড়ছিলো। তার সাথে সাথে বজ্রপাত হচ্ছিলো অনেক শব্দ করে। বেশ কয়েকবার বজ্রপাত হলো। ভ্যাপসা গরমের তেজ কমে এসেছে। ঠান্ডা বাতাস বইছে। তৃষ্ণার্ত মাটি আজ পরিতৃপ্ত। যেখানে মদের দুর্গন্ধ ছড়াতো, সেখানে এখন আল্লাহর জিকিরের সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে। আদম খান সবার আগে তার বাহিনীর শহিদদের নামাজে জানাজা পড়ালেন। এরপর সব শহিদকে একটি বড় কবরে দাফন করলেন। মুসলিম বাহিনীতে ছিলো যথেষ্ট পরিমাণ হিন্দু সৈনিক। তাদের নিজেদের রেওয়াজ মতে শ্মশানে ভস্মীভূত করে দেয়া হয়। হালকা হালকা গন্ধ ছড়াতে শুরু করে। বাতাসের কোমল ঢেউ তা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়।

ভদ্রেক গ্রামে আজ অভূতপূর্ব খুশির আমেজ। আদম খান গ্রামের বাইরে তাঁবু টাঙিয়েছেন। সাইয়েদ হায়দার ইমাম এবং তার পাঁচ হাজার সিপাহিকে গ্রামের অভ্যন্তরে নিরাপত্তাকাজে নিয়োজিত রাখা হয়েছে। যেখানে গতকাল পর্যন্ত মহারাজা জয়ধ্বজ সিং অবস্থান করছিলেন, বর্তমানে সেখানে সাইয়েদ হায়দার ইমাম অবস্থান করছেন। গভীর রাত পর্যন্ত গ্রামের লোকজন আনন্দ-উল্লাস করছে। সবার ঠোঁটে বিজয়ের হাসি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরপরই তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠছে।

তারা আবেগের আতিশয্যে মুসলিম সিপাহিদের হাতে চুমুর প্রলেপ এঁকে দিয়ে বলছে– 'আমরা বড়ই পাপী। নিজের ওপর আমরা বড় অন্যায় করেছি। আত্মার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। আমরা আমাদের কৃতকর্মের বহু শাস্তি পেয়ে গেছি; বরং আমাদের অন্যায়ের তুলনায় অনেক বেশি শাস্তির মুখোমুখি হয়েছি।'

বাতাস খুব জোরে বইতে শুরু করলো, যেন এখনই ঝড় হবে। বাতাসের কারণে হাসনাহেনা ফুলের তীব্র গন্ধের সুবাস নাকে আসছে। বৃষ্টি শুরু হয়ে

www.pathagar.com

গেলো। বাতাস প্রচুর বইতে শুরু করলো। বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা সবার শরীরে যেন কাঁটার মতো করে আঘাত দিচ্ছে। আজ বৃষ্টিটা দেখে সবার ভিজতে ইচ্ছা করছে। অনেকে পাথরের মতো করে দাঁড়িয়ে আছে বৃষ্টির মধ্যে।

ভবনের ভেতরে-বাইরে মুসলমান মুজাহিদরা সজাগ-চৌকান্না। খানিক আগের গন্ধ-দুর্গন্ধ মুষলধারায় বৃষ্টির সাথে বিদূরিত হয়ে গেছে। তুমুল এই তুফানেও দেশ ও জাতির কর্ণধাররা স্থানে স্থানে পাহারা বসিয়ে রেখেছে। এক স্থানে সাইয়েদ হায়দার ইমাম একজন কিশোরী কন্যাকে দেখলেন, যে একটি গলির মুখে ঢাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম তার মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে বড়ই মায়ার সুরে জিজ্ঞেস করলেন– 'বোন! তোমার সিংহহৃদয় ভাইদের বীরত্বের ব্যাপারে কি তোমার আস্থা নেই? আমাদের কন্যা, জায়া, জননীরা যদি এভাবে তুফানের রাতে নিজেদের ইজ্জত-আব্রুর হেফাজত করতে হয়, তবে তো হাতিয়ার নিয়ে নির্ঘুম রাত কাটানো আমাদের জন্য অর্থহীন। তোমাদের আরামের জন্যই তো আমরা আমাদের বিশ্রাম বিসর্জন দিয়েছি! জেগে আছি! যাও, তোমরা যাও এবং গিয়ে শান্তির নিদ্রায় আরাম করো। স্মরণ রেখো, যতোক্ষণ পর্যন্ত আমরা জীবিত আছি কোনো হতভাগা ততোক্ষণ পর্যন্ত কারো ঘরে প্রবেশের দুঃসাহস দেখাতে পারবে না।'

মেয়েটি মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– 'সরদার! এমন কোনো কথা নয়। এ মুহূর্তে আমার বৃষ্টিতে ভিজতে ভীষণ ভালো লাগছে। যে বোনদের ভাইয়েরা এমন বিভীষিকাময় রাতে জেগে থাকে, সে বোনদের ঘুম আসে না। আমি আপনাদের সবার জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করার জন্য দাঁড়িয়েছি।'

মেয়েটির কথা শুনে সাইয়েদ হায়দার ইমাম বেশ প্রভাবিত হলেন। তিনি তার মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে বললেন– 'শুকরিয়া! শুরু থেকেই আমরা মা, বোন ও কন্যাদের নেক দোয়ার আশ্রয়ে নিরাপদ রয়েছি।'

***

রাতের শেষ প্রহরে বৃষ্টি থেমে যায়। কামিনী তার শানদার রেশমি তাঁবুতে বিশ্রাম নিচ্ছে। তার মনকাননে মুজাহিদদের ঘোড়ার টগবগ শব্দেরা জলতরঙ্গের মতো বেজে উঠছে। চতুর্দিকের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে সে নিজেকে

www.pathagar.com

বেশ নির্ভার ভাবছে। মনের অজান্তেই এক স্বাপ্নিক জগতে পৌঁছে গেছে সে। নবাব আলি কুলি খান তাকে অভাবনীয় সম্মান দিয়েছেন। কোনো সেনাপতির তাঁবুর চেয়ে তার তাঁবু কম মর্যাদাপূর্ণ নয়। তাঁবুর দরজায় সশস্ত্র সিপাহিরা পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর বাইরে কিসের যেন কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। ঘোড়দৌড়ের শব্দও ভেসে আসছে কানে।

কামিনী একজন প্রহরীকে উদ্দেশ করে বললো– 'বাইরে কিসের শোরগোল?'

প্রহরী বললো– 'হাকিমে বাংলার বাহিনী নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করছে। মনে হচ্ছে নাদের খানের বসতিতে আসামীয় বাহিনীর আক্রমণ বেড়ে গেছে।'

কামিনীর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। একসময় তার হৃৎকম্পন অস্বাভাবিকভাবে কাঁপতে থাকে। সে দ্রুত যুদ্ধপোশাক পরলো। ঢাল ও বর্শা নিয়ে সে বেরিয়ে এলো।

প্রহরী কিছুটা ঝুঁকে সালাম করার পর বিস্ময় প্রকাশ করে বললো– 'এভাবে আপনার বাইরে আসা ঠিক হচ্ছে না। বাদশা দেখলে ভীষণ অসন্তুষ্ট হবেন।'

'তুমি চিন্তা কোরো না। তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না।'

বসতি– যা এখান থেকে সর্বোচ্চ দশ মাইল দূরে অবস্থিত। একাকী তারা এক ভয়ংকর বাহিনীর সাথে লড়ে যাচ্ছে। প্রতাপ মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের কাছ থেকে অনেক কামানসহ তাজা বাহিনী নিয়ে এসেই অতর্কিত আক্রমণ করে বসেছে। পঞ্চাশটি বড় বড় কামান দিয়ে ভারী পাথর, শক্ত মাটি ও তামার গোলা বর্ষণ করে যাচ্ছে। কামানের পাশাপাশি আসামের পদাতিক বাহিনী প্রাচীর ভাঙার চেষ্টা করে যাচ্ছে। দুয়েক স্থানে দেয়াল অনেকটাই ভেঙে পড়েছে। নাদের খানের বসতির প্রতিটি সদস্য রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ক্ষণে ক্ষণে যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। মৃত্যুর মিছিলে অকাতরে যোগ দিচ্ছে অসংখ্য বনি আদম। লাশের পর লাশ পড়ছে।

গোহাটি থেকে পরাজয়বরণ করে পালিয়ে যাওয়া আসামীয় সেনারাও এখানে সমবেত হচ্ছিলো। আসামবাহিনী বুনো বাঁদরের মতো প্রাচীর টপকে এগিয়ে আসতে চাচ্ছে। আদেল খান ও রিজওয়ানের বাহিনী বীর বেশে প্রবল বিক্রমে শত্রুর মোকাবেলা করে যাচ্ছে। ইসমাইলের তিরন্দাজ বাহিনী তীব্র বেগে তির নিক্ষেপ করে চলেছে। কেয়ামতের বাজার ভীষণ গরম। জীবন আর মৃত্যুর মাঝে কোনো ব্যবধান আর অবশিষ্ট নেই। প্রাচীরের যেখানে যেখানে ফাটল দেখা যেতে থাকে, সেখানেই অদম্য এ বাহিনী অবিশ্বাস্যভাবে তা পুনর্গঠিত

www.pathagar.com

বা নির্মাণ করে চলেছে। নাদের খান তার রক্তে লিখে চলেছেন মানবতা, বিশ্বাস ও সম্মানের এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস।

চন্দন, শেখর, মোহন এবং তার অন্য সঙ্গীরা ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে আছে। তাদের চোখে রাগ, দুঃখ ও ক্ষোভের আগুন। বাদশা আলি কুলি খানের পদাতিক বাহিনী বেশ দ্রুততার সাথে গাছের তৈরি সেতু বেয়ে নদীর অপর প্রান্তে সমবেত হচ্ছে।

কামিনী শেখরকে বললো– 'শেখর! আমরা দীর্ঘ সময় এখানে অপেক্ষা করে খান বাবার পেরেশানির ব্যথা সহ্য করতে পারি না। বসতিবাসী আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। বিন্দু থেকেই সমুদ্রের সৃষ্টি হয়। এ মুহূর্তে বসতিবাসীর জন্য একেকজন সিপাহির ভীষণ দাম। এদিকে বাদশার নির্দেশ অমান্য করাও একপ্রকার অন্যায়, কিন্তু নিজের মানুষের সাহায্যে অবহেলা করা এর চেয়ে আরো বড় অন্যায়।'

কামিনীর পেছনে পঞ্চাশজন আরোহী ঘোড়া নিয়ে নদীতে নেমে গেছে। ঘোড়াগুলো মাছের মতো সাঁতরে নদী পার হয়ে যায়। অপর প্রান্তে পৌঁছে তারা পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলো, এ মুহূর্তে বাদশার অশ্বারোহী বাহিনীর প্রথম বহরটি সবেমাত্র পার হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে সূর্য অস্ত গেছে পশ্চিমাকাশে। আসামীয় সিপাহি– যারা শেখরের কাফেলায় ছিলো, তখন তারা মোটেই ভীত ছিলো না। তাদের আবেগ-উচ্ছ্বাস অন্যদের তুলনায় বেশি না হলেও কম নয়। কামিনী– যে আসামের পোশাক পরে আছে, তাকে তখন বনের আহত বাঘিনীর মতো দেখাচ্ছিল। ক্রোধে-ক্ষোভে তার বুক কেঁপেই চলেছে। দুই-তিন মাইল ঘন বন পেরোনোর পর এরা খোলা মাঠে চলে এসেছে। দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত তারা যুদ্ধের ভয়াবহতা আঁচ করতে পারছে। মুসলমানদের নারায়ে তাকবিরের জবাবে আসামের অশ্বারোহী বাহিনীর শোরগোল, ঢালের ওপর বিজলির বিচ্ছুরণ, তরবারির ঝনঝন আওয়াজ, আহতদের চিৎকার ও কান্না কেয়ামতের এক ভয়াবহ বিভীষিকায় রূপ নিয়েছে। কামান থেকে উড়ে যাওয়া মস্ত ভারী পাথর দেখে শেখর বললো– 'আসামীয় বাহিনী মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।'

কামিনী বললো– 'সাথিরা! যেভাবেই হোক আমাদের কামানের কাছে গিয়ে পৌঁছাতে হবে।'

www.pathagar.com

আসামীয় সিপাহি– যারা শেখর ও তার সঙ্গীদের সাথে এসেছিলো– তারা বেশ দৃঢ়তার সাথে বললো– 'আশা করি, সাময়িকভাবে হলেও আমরা তাদের ধোঁকা দিয়ে সফল হতে পারবো।'

জাফর বললো– 'এগিয়ে চলো! যা হবার তা-ই হবে। একজন সিপাহির জীবন মৃত্যুর চেয়ে মঙ্গলজনক হয়ে থাকে। পরিণতির চিন্তা কাপুরুষতার লক্ষণ।'

এখন ছোট্ট এই কাফেলাটি যুদ্ধের ময়দানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এরা ওপর থেকে চক্কর দিয়ে ওই ঝুপড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যেখানে কামান ও বড় বড় পাথর রাখা আছে। তাদের পেছন থেকে আসতে শুরু করেছে বাংলার হাকিমের পদাতিক বাহিনী ও তিরন্দাজদের অশ্বারোহী বাহিনী। আকাশের আলো অনেক আগেই হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। চারদিকে বইছে ঠান্ডা বাতাস। এটা ওই সময়– যখন ভদ্রেকে মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের ফৌজকে উদ্যম খান এবং সাইয়েদ হায়দার ইমামের বাহিনী বিতাড়িত করে ছেড়েছে। আর মহারাজা ভদ্রেক থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

এদিকে মহারাজা জয়ধ্বজ সিং ভদ্রেক থেকে পালাচ্ছেন, ওদিকে প্রতাপ ও ঠাকুর নব উদ্যমে বিশাল বহর নিয়ে নাদের খানের বসতিতে হামলা চালাচ্ছে। বসতিবাসীর জন্য নতুন আরেক মসিবতের বিষয় হিসেবে আরেকটি ব্যাপার দেখা দিলো, সেটা হচ্ছে গোহাটিতে মার খেয়ে ছুটে পালানো আসামীয় সেনারাও এদিকে ধেয়ে আসছে এবং প্রতাপের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

হাকিমে বাংলা এ সংবাদ শুনলে তিনি তার সব কটি বাহিনীর কর্মতৎপরতা রহিত করে সকলকে একই সময়ে নাদের খানের বসতি অভিমুখে এগিয়ে আসতে নির্দেশ দেন। নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করে তিনি তার সিপাহিদের এমন কৌশলে বিভক্ত করে দিলেন, যেভাবে তিনি বিভিন্ন সময় করে থাকেন। মাইসারা, মাইমানা, মুকাদ্দামাতুল জাইশ ও আজমুল জাইশ পৃথক পৃথক ছিলো। তাদের পেছনে ছিলেন হাকিমে বাংলা খোদ নিজে। তার সঙ্গে ছিলো উচ্চতর সমর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ তিরন্দাজ অশ্বারোহী বাহিনী। হাকিমে বাংলা নিজে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। কাঁধে সবুজ রুমাল, যার অগ্রভাগে সোনার তৈরি সুদৃশ্য তারকার মাঝে দামি এক হীরক খণ্ড। মাইমানা বাহিনী উচ্চপদস্থ নেতৃবর্গ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো ভারী অস্ত্রে সজ্জিত চৌকস অশ্বারোহী বাহিনী।

www.pathagar.com

এদিকে সাইফুদ্দিন, মিরান শাহ ও আলি বাহাদুরের মতো সমরবিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে ছিলো মাইসারা গ্রুপ। মাইমানা দেলোয়ার খান ও শাহরুখের নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে। হাকিমের নির্দেশ হলে সিপাহি ও নেতৃবৃন্দের মাঝে বেশ জোশ ও উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়। এরপর বাহিনীর প্রতিটি বহরে রণসংগীত বাজতে শুরু করে। বিপুল তেজস্বী ভঙ্গিতে হাকিমে বাংলার বাহিনী অগ্রসর হয়ে রণাঙ্গনে প্রবেশ করে।

মেঘের কারণে রাত ছিলো ঘনঘোর অন্ধকার। সেই মেঘ ধীরে ধীরে বৃষ্টিতে রূপ নিতে থাকে। এদিকে বিজলিও চমকাচ্ছে ঢের। কখনো কখনো এই বিজলিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের অবকাশ এসে যাচ্ছে।

শেখর এবং তার সঙ্গীরা কামান নিয়ন্ত্রণকারীদের সারির কাছে পৌঁছে অতর্কিত আক্রমণ করে বসে। তাদের ক'জন সেনাকে মুহূর্তেই মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দেয়া হয়। এ আক্রমণ এতোটাই ভয়ংকর ও তেজস্বী ছিলো যে, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আসামীয় সেনারা প্রাণ বাঁচাতে কামান ছেড়ে দৌড়ে পালাতে বাধ্য হয়। অথচ শুরুতে আসামীয় বাহিনী এদের নিজেদের লোক ভেবেছিলো। কিন্তু না, এখন তারা বুঝতে পারলো– তাদের মস্ত বড় ধোঁকা দেয়া হয়েছে!

হাকিমে বাংলার চৌকস বাহিনী সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে যুদ্ধের মাঠে। এদিকে মাঠে তখন কেয়ামতের বিভীষিকা। অন্ধকার ও বৃষ্টি সত্ত্বেও যুদ্ধের হাঙ্গামা বেড়েই চলেছে। প্রত্যেক অশ্বারোহী শত্রুপক্ষের অশ্বারোহীর ওপর হামলে পড়ছে। নিক্ষিপ্ত তিরের ফলা, আক্রমণোন্মুখ তরবারির ঝংকার তখন উভয় পক্ষের রক্তনদীতে এক বিস্ময়কর ছন্দে মুখর করে তুলেছে। আহতরাও ঘোড়ার পিঠে চড়ে তরবারি চালনা করছে। সওয়ারিগুলো ততোক্ষণ পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত রাখছে, যতোক্ষণ তাদের প্রাণবায়ু উড়ে গিয়ে এমনিতেই পড়ে না যাচ্ছে। ধীরে ধীরে বাঁ দিকে আসামীয় সেনাদের সংখ্যা হ্রাস পেতে আরম্ভ করেছে।

শেখর, মোহন ও তার অন্য অশ্বারোহী সাথিরা কলজে-কাঁপানো বীরত্ব নিয়ে কামানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। এমন সময়ে কামিনীর নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদের ভাবনার উদয় হয়। কামিনীও পুরুষোচিত বীরত্ব নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তার বাঁ হাতে লম্বা বর্শা আর ডান হাতে আছে ধারালো তরবারি। উভয় অস্ত্র দিয়েই সে প্রবল বিক্রমে আক্রমণ চালাচ্ছে।

www.pathagar.com

বাংলার হাকিম বাদশা আলি কুলি খানের বিশাল বাহিনীর আমরণ লড়াই তো রণাঙ্গনে চলছেই। তিনি বলছেন– 'আমরা জমিনের একটি খণ্ডের জন্য লড়ছি না। এক মহৎ লক্ষ্য সামনে রেখে আমরা মৃত্যুর মঞ্চে দাঁড়িয়েছি। শহিদি মৃত্যুতে আমরা সিক্ত হতে চাই। চিরশ্বাশত ও চিরঞ্জীব শান্তির জন্য আমরা লড়ছি। আখিরাতের মুক্তি ও শান্তিই আমাদের মুখ্য বিষয়– এ ব্যাপারে আমরা শতভাগ বিশ্বাসী। মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার মতো জাতি নই আমরা!...'

শুভ্রকেশধারী সাইফুদ্দিন পূর্ণোদ্যমে লড়ে যাচ্ছেন। তিনি আসাম বাহিনীর সারিগুলো তছনছ করে ওদের বহরের মধ্যভাগে পৌঁছে গেলেন– যেখানে কামিনী ও অন্য একজন ভীষণ আক্রমণের ফাঁদে আটকা পড়েছে। আসাম নেতা প্রতাপের প্রতাপ সাঙ্গ হয়ে গেছে। সাইয়েদ সাইফুদ্দিনের পেছনে পেছনে হাকিমে বাংলা বাদশা আলি কুলি খানও ওখানে পৌঁছে গেছেন।

শেখরকে চিনতে পেরেই তিনি তার কাছে জানতে চাইলেন– 'বেটা! কামিনী কোথায়?'

কামিনী একটি ডালে লুকিয়ে ছিলো। ওখান থেকে সে বললো– 'আমি এখানে, সরকার!'

হাকিম আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন– 'এ জাতিকে কে পরাজিত করতে পারে, যাদের মা, বোন ও কন্যাদের মধ্যে এ ধরনের সতেজপ্রাণ নিরাপত্তা বাহিনী থাকে?'

এরপর আলি কুলি খান সাইফুদ্দিনকে উদ্দেশ করে বললেন– 'যেকোনোভাবে মা কামিনী আর আমাদের গর্বিত সন্তান এ ছেলেটাকে বসতির ভেতর পৌঁছে দাও। এরা বেশ ক্লান্ত, অবসন্ন।'

কামিনী বললো– 'আমি ক্লান্ত নই। আমি তো পৃথিবীর এ-প্রান্ত হতে ও-প্রান্তে আপনার পদচিহ্ন অনুসরণ করে যেতে চাই।'

হাকিম স্নেহমাখা সুরে বললেন– 'এটা আমার নির্দেশ। তুমি জানো না, আল্লাহ না করুন, যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো দুর্দশায় তুমি পতিত হও, তাহলে আমরা কী পরিমাণ দগ্ধ আর অনুতপ্ত হবো!' এরপর হাকিম পালিয়ে আসা আসামীয় সেনাদের ব্যাপারে জানতে চাইলেন।

শেখর বললো– 'তারা উভয়ে সিংহের মতো রণাঙ্গনে লড়াই করছে। ওই দেখুন, কী বেগে আক্রমণ ছুড়ছে!'

www.pathagar.com

বাদশা আলি কুলি খান আবেগের আতিশয্যে উচ্চকণ্ঠে নারায়ে তাকবির দিলেন এবং বিদ্যুদ্বেগে দৌড়ে তাদের সামনে চলে গেলেন।

রাতের তখন দ্বিতীয় প্রহর গত হয়েছে। বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমে এসেছে, কিন্তু মেঘের গর্জন এবং আকাশে বিজলির চমক আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। বিজলির আলোতে কামিনী এখনো বাদশা আলি কুলি খানের গতিবিধি দেখে চলেছে। বিজলির হঠাৎ এক বিচ্ছুরণে কামিনী দেখতে পেলো দুজন আসামীয় সেনা পেছন থেকে আলি কুলি খানকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তৎক্ষণাৎ কামিনী সেখান থেকে দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ায় বসে তিরের গতিতে ওই সেনাদের আক্রমণ করে বসলো। তার বর্শার আঘাতে এক সেনা সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হয়, আরেকজন চিৎকার দিয়ে দৌড়ে পালায়। তাকে ধরার জন্য কামিনীও ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। কিন্তু সে পৌঁছার আগেই কামিনীর সাথে পালিয়ে আসা দুই আসামীয় সেনা ওই ধৃত সেনার জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেয়। বাদশা পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন কামিনী এবং ওই দুই আসাম সেনা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

বাদশা আলি কুলি খান বললেন– 'শুকরিয়া!' এর পরই তিনি শত্রুদের ধাওয়া করতে মনোযোগী হলেন।

ময়দান রক্তে মাখা পানিতে কর্দমাক্ত। দিকে দিকে সারি সারি লাশ সাঁতরে ফিরছে। আসাম বাহিনীর শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে। তাদের বহরে অব্যবস্থাপনা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। তারা পরাজয়বরণ করে পিছু হটতে হটতে বনের দিকে পালাচ্ছে। কিন্তু অপর প্রান্তে দেখা দিতে থাকে আরেক দুর্দশা।

বসতিবাসীর অধিক মনোযোগ চারদিকে ঘেরা সীমানাপ্রাচীরের দিকে। একসময় আসাম বাহিনী উত্তর প্রান্তের প্রাচীরে অতর্কিত আক্রমণ করে বসে। বৃহৎ সিঁড়ির সাহায্যে তারা প্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে যায়। নাদের খান এ ব্যাপারে জানতে পারলে তিনি একজন অশ্বারোহীকে পাঠালেন আদেল খানকে এ সংবাদ পৌঁছাতে। যেভাবেই হোক, চৌকস একটি বাহিনী যেন উত্তর দিকে পাঠানো হয়, এতে করে আসাম বাহিনীর আক্রমণের মাত্রা কিছুটা হলেও কমবে। ইসমাইল ও রিজওয়ান বীর বিক্রমে কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে ভগ্নমনা আসামীয় সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করে যাচ্ছে। উঁচু-নিচু ঘরের ছাদ হতে মহিলারা বৃষ্টির মতো তির নিক্ষেপ করছে। কুলসুম ও সকিনা পুরুষের পোশাক পরে বসতির পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ

www.pathagar.com

মিলিয়ে অসম বীরত্বের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। বসতির সকল অধিবাসীর হাতে হাতে তরবারি। একযোগে সবাই আল্লাহর ওপর ভরসা করে জুলুমের ভয়াল পর্বত উপড়ে ফেলতে উদ্‌গ্রীব। আহমাদ হাসান বারবার উচ্চকণ্ঠে নারায়ে তাকবির স্লোগান দিয়ে যাচ্ছেন।

বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু কালো মেঘমালা রাতের অন্ধকারকে আরো গাঢ় করে রেখেছে। কম-বেশি দুই হাজার আসামীয় সেনা বসতিতে ঢুকে পড়েছে। বাইরে আদেল খানের সহায়ক বাহিনী আসামীয় সেনাদের পিছু হটিয়ে দিয়েছে। খাঁচায় আটকে পড়া ইঁদুরের মতো আসামীয় সেনারা এখন সীমানাপ্রাচীর ঘেঁষে ঘেঁষে ছোট্ট কোনো দরজার সন্ধানে দৌড়াচ্ছে; যেখান দিয়ে তারা পিছু হটতে পারে। কিন্তু বসতিবাসী এখন তাদের জন্য মৃত্যুর দরজা ছাড়া বাকি সব দরজা বন্ধ করে রেখেছে। হয়তো ভাগ্যবিধাতার লিখন এমনই ছিলো। জুলুম যতো দ্রুত ছড়ায়, তার চেয়ে দ্রুতবেগে তার প্রায়শ্চিত্তও ভোগ করতে হয়।

আহমাদ হাসানের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা ও আবেগ ছিলো দেখার মতো। তিনি বৃদ্ধ কিন্তু এ সময়ে তাঁকে তেজি যুবকের চেয়েও অধিক ক্ষিপ্রমাণ দেখাচ্ছে। তার এক হাতে জ্বলন্ত মশাল আর অন্য হাতে তরবারি। উভয়টা একই সময়ে তিনি শত্রুর আক্রমণে ব্যবহার করে চলেছেন। বনের বিক্ষুব্ধ সিংহের মতো গর্জন করতে করতে আসাম সেনাদের ওপর হামলে পড়ছেন তিনি। তিনি বলছেন– 'জীবনে এই প্রথম বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু আমার কাছে অধিক প্রিয় হয়ে উঠেছে। অন্ধকারের বিরুদ্ধে আমি ততোক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করতে থাকবো, যতোক্ষণ আমার শরীরে প্রাণবায়ু অবশিষ্ট থাকবে।'

আহমাদ হাসান বেশ ক'জন আসামীয় সেনাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দেয়ার পর হঠাৎ তার পা পিছলে যায়। একটি গর্তে পড়ে যান তিনি– যা পানিতে ভর্তি ছিলো। ইসমাইলের দৃষ্টি এ দৃশ্য এড়ায়নি। তার পাশেই জ্বলছিলো মশালটি। আহমাদ হাসান নিজেকে সামলে ওঠার এবং ইসমাইল নিকটে আসার আগেই এক আসামীয় সেনার নির্দয় বর্শা তার বুকে বিদ্ধ হয়। আসামীয় সেনা বর্শা নিক্ষেপ করার সাথে সাথে বৃদ্ধ নওমুসলিম সিংহ আহমাদ হাসান তার দেহ থেকে বর্শাটি বের করে নিতে সক্ষম হন। যখনই বর্শার লম্বা ফলা তার দেহ থেকে বের হয় সে মুহূর্তেই মাটির দেহ থেকে তার পবিত্র আত্মাটি চিরদিনের জন্য ঊর্ধ্বাকাশে চলে যায়। শাহাদাতের অমিয় সুধায় সিক্ত হন তিনি।

www.pathagar.com

ইসমাইলের তরবারির একটি আঁচড় গিয়ে পড়ে আসামীয় সেনার কণ্ঠনালিতে। ওমনি সে লুটিয়ে পড়ে। দীর্ঘক্ষণ সে সাপের মতো লাফাতে থাকে। শেষে নিভিয়ে দেয়া হয় তার প্রাণপ্রদীপ। ইসমাইল আহমাদ হাসানের রক্তাক্ত লাশ সবেমাত্র কাঁধে উঠিয়েছে, ওমনিই এক আসামীয় সেনা তার ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে বাঁ কাঁধ আহত করে বসে। আহত হওয়া সত্ত্বেও ইসমাইল তরবারি দিয়ে এমন আঘাত ছুড়ে যে আসামীয় সেনা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ইসমাইল দ্রুতপায়ে একদিকে এগোতে থাকে। সে আসামীয় সেনাদের ঘাঁটি থেকে বের হয়ে দ্রুতপায়ে ওই দিকে এগোতে থাকে, যেখানে শহিদদের জানাজা রাখা হয়েছিলো।

পেছন থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এলো। 'ইসমাইল! কোন সৌভাগ্যবান শহিদের লাশ এটা?'

ইসমাইলের অগ্রসরমান পা থমকে যায়। কারণ, কণ্ঠটি যে কুলসুমের! ইসমাইল মৃদুকণ্ঠে বললো– 'কুলসুম! আল্লাহ তাআলা তোমার পিতাকে শাহাদাতের উঁচু মর্যাদা দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন।'

কিছুক্ষণের জন্য কুলসুম নির্বাক। রক্তের বন্ধনের বিয়োগব্যথা এটা। কিন্তু সে বাঁধভাঙা বেদনাসিক্ত আবেগ ও বিয়োগান্ত কান্না সংবরণ করে পিতার রক্তাক্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো– 'আল্লাহ হাফেজ, বাবা! আপনি কতোই না সৌভাগ্যবান। আল্লাহ আপনাকে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত করে দিয়েছেন।'

আহমাদ হাসানের নিষ্প্রাণ ঠোঁটের কোণে তখন মুচকি হাসির রেখা। তার খোলা চোখে এখনো জ্বলজ্বল করছে দীপ্ত শপথের রোশনি।

কুলসুম এগিয়ে এসে পিতার রক্তাক্ত কপালে চুমু দিয়ে বললো– 'জান্নাতুল ফেরদাউসে আমি গুনাহগারের জন্য দোয়া করতে থেকো, বাবা!' এরপর সে দুই কদম পেছনে সরে যায়।

হঠাৎ সে বেয়ে পড়া রক্তের ছোপ দেখে বললো– 'ইসমাইল! তুমি তো আহত!'

ইসমাইল বললো– 'চিন্তার কোনো কারণ নেই। এটা সাধারণ আঘাত।'

কুলসুম চঞ্চলসুরে বললো– 'আমার কাছ থেকে লুকাচ্ছো কেন? এটা তো সাধারণ কোনো জখম নয়! এখান থেকে অনবরত রক্ত ঝরছে! আমার পিতাকে রাখো। ওনাকে আমার কাঁধে তুলে দাও।'

www.pathagar.com

'না!' ইসমাইল হাঁটতে হাঁটতে বললো– 'আমি এই সৌভাগ্যের ব্যাপারে কাউকে অংশীদার করতে চাই না। আল্লাহ আমাকে এই সৌভাগ্যে ধন্য করেছেন যে, আমি একজন শহিদকে উঠিয়ে তাঁর শেষ বিশ্রামস্থলে নিয়ে যাচ্ছি।' এবার সত্যি সত্যি কুলসুমের দু'চোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

***

রাতের তৃতীয় প্রহর চলছিলো। বাংলার হাকিম বাদশা আলি কুলি খানের ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রবল আক্রমণে বিপুলসংখ্যক আসামীয় সেনা পিছু হটতে বাধ্য হয়। তারা নিজেদের হাজার হাজার সৈনিকের লাশ লড়াইয়ের ময়দানে ফেলে রেখে পালাতে থাকে। বসতিতে আটকে পড়া সেনারাও মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। নাদের খান উঁচু মিনারে বসে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনিও ছিলেন আহত, কিন্তু আসাম বাহিনীর পিছু হটার সংবাদ পেয়ে বেশ খুশি তিনি।

এমন সময় নিচ থেকে কে যেন ডেকে বলছে– 'প্রহরী! দরজা খুলো! আমি শেখর!

শেখরের কণ্ঠ বুঝতে পেরে নাদের খান বুকফাটা আহ্লাদে বললেন– 'তুমি এসে গেছো, শেখর? কামিনী কোথায়?'

শেখর কামিনীকে দেখে বললো– 'তুমি কিছুক্ষণ চুপ থেকো। আনন্দের এ মুহূর্তে আমি খান বাবার সাথে একটু মজা করতে চাই।'

নাদের খান ওপর থেকে চিৎকার দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন– 'শেখর! তুমি বলছো না কেন... কামিনী কোথায়?

শেখর নিচ থেকে বললো– 'খান বাবা! আমরা মোহনকে ছাড়িয়ে এনেছি!'

নাদের খান বললেন– 'বেশ খুশি হলাম কিন্তু আমি তো কামিনীর ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি। তুমি আমার প্রশ্নের জবাব সঠিক করে দিচ্ছো না কেন?'

শেখর বললো– 'আমাদের আফসোস রয়ে গেছে... হাশিমকে আমরা ছাড়িয়ে আনতে পারিনি। কিন্তু সে জীবিত আছে এবং একজন দয়াবানের ছায়াতলে বেশ শান্তিতে আছে।'

নাদের খান তার কথা কেটে বিরক্তির সুরে বললেন– 'আমি কামিনীর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। বলো, তাকে তোমাদের সঙ্গে এনেছো নাকি আনোনি?...'

www.pathagar.com

শেখর মলিনকণ্ঠে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করলো– 'খান বাবা! সৌম্য করুন... আমরা বোন কামিনীকে নিয়ে আসতে সক্ষম হইনি।'

নাদের খান বললেন– 'কামিনীকে না এনে থাকলে দূরে সরে যাও! রাতের অন্ধকারে কোথাও চিরদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যাও! আমি তোমার চেহারা দেখতে চাই না! তোমরা সবাই আমাকে আশাহত করেছো... আমার প্রত্যাশার ওপর পানি ছিটিয়ে দিয়েছো তোমরা... আমার আনন্দ ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছো।'

এমন সময়ে কামিনী নিচ থেকে চিৎকার করে বললো– 'খান বাবা! আমি এসে গেছি! এতোক্ষণ আপনার সাথে মজা করা হয়েছে!'

নাদের খান বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে বললেন– 'তোমরা সবাই ওখানে দাঁড়াও। আমি নিজেই তোমাদের জন্য দরজা খুলবো। আমি বড়ই ভাগ্যবান। মহামহিম আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর আনন্দের বৃষ্টি বর্ষণ করে চলেছেন।'

নাদের খানের কণ্ঠ ধীরে ধীরে বেশ ভারী ও গম্ভীর হয়ে আসছে। তিনি মিনার থেকে নেমে আল্লাহর শোকর আদায় করতে করতে প্রাচীরের দরজা পর্যন্ত এলেন। নিজ হাতে ফটকের ভারী কপাট খুলে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন। কামিনী ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দৌড়ে নাদের খানের বুকে এসে ছোট্ট শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে। নাদের খানের চোখজোড়া পানিতে টলোমলো। অনেকক্ষণ ধরে তারা কান্নার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছিলেন না।

এরপর মোহন এগিয়ে এসে নাদের খানের পা ছুঁয়ে বললো– 'সরদার! আমি মোহন।'

নাদের খান চমকে গিয়ে তার দিকে তাকালেন। তাকে গলায় ধরে বললেন– 'আমরা, তোমরা এবং সবাই নিরাপদ। যদি আমি বয়সে তোমাদের চেয়ে বড় না হতাম, তাহলে তোমাদের সবাইকে পা ছুঁয়ে চুমু এঁকে দিতাম।'

এরপর নাদের খান ওই দুই আসাম সেনার দিকে তাকালেন, যারা এদের সঙ্গে এসেছে।

শেখর বললো– 'সরদার! এরা ওই মহান ব্যক্তিদ্বয়– যাদের সহায়তায় আমরা আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।'

www.pathagar.com

নাদের খান একে একে উভয় সিপাহির হাতে চুমু খেয়ে বললেন– 'আমরা আমাদের সাধ্যের সর্বোচ্চ পন্থায় তোমাদের সম্মান করে যাবো। কিন্তু বিশ্বাস রেখো, কখনোই তোমাদের এই অনুগ্রহের বিনিময় দেয়া আমাদের সম্ভব হবে না। তোমরা আমাদের মনপ্রাণ খরিদ করে নিয়েছো।'

এরপর তিনি সবাইকে ভেতরে ঢুকিয়ে ফটক বন্ধ করে দিলেন। কেননা এখনো আসামের থেকে যাওয়া অল্পস্বল্প সেনারা চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে বসছে। পেছনে ফিরে নাদের খান আবারও সবার চেহারার দিকে তাকালেন। কামিনীসহ সকলেই মোটামুটি আহত।

'তোমরা সকলেই দেখছি মারাত্মক আহত!'

কামিনী বললো– 'খান বাবা! এ আঘাত খুবই সামান্য– যা আমাদের জন্য আজীবন সম্মানের সঞ্চিত স্মারক। এ তো প্রত্যাশার ফুটন্ত ফুল। এগুলো আমাদের চলার পথ দূর দূর পর্যন্ত আলোকোজ্জ্বল ও মসৃণ করে রাখবে। ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের দীপ্ত শপথ নিয়ে আসবে এ আঘাত। এ স্মৃতির আলোকেই আমরা বহু দূর এগিয়ে যাবো।'

কুলসুম দৌড়ে আসছে। চিৎকার করে সে বলছে– 'খান বাবা! আমার পিতা শহিদ হয়ে গেছেন আর ইসমাইল মারাত্মক আহত!'

নাদের খান ইন্নালিল্লাহ পড়ে কুলসুমকে গলায় জড়িয়ে ধরলেন এবং তার মনোযোগ পরিবর্তন করে বললেন– 'কুলসুম! এই তো কামিনী!'

'কুলসুম!' কামিনীর বুকফাটা চিৎকার! উভয় সখী একে অন্যের বুকে বিলীন হয়ে গেলো।

ধরণি আলোয় ভেসে উঠলো।

www.pathagar.com

ইনসাফের তরবারি

আসাম বাহিনী নাদের খানের বসতির সীমানার চৌহদ্দি থেকে পালিয়ে পেছনের জঙ্গলের দিকে চলে গেলো। মুসলিম বাহিনী প্রবল আক্রমণে তাদের ধাওয়া করতে থাকে। অসংখ্য আসামীয় সেনাকে বন্দী করা হয়েছে। কয়েদিদের মোটা দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে বসতির বাইরে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে লাশের ছড়াছড়ি। এখানে-ওখানে মানুষের ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সর্বত্র রক্ত আর রক্ত। যেখানে যেখানে পানি পড়ে থাকতে দেখা যেতো, সেখানে এখন দেখলে মনে হয় রক্তের নদী হয়ে হয়ে আছে। বুনো কুকুর, বাঘ ও অন্যান্য রক্তপায়ী জীবজন্তু ধীরে ধীরে বন থেকে বেরিয়ে যুদ্ধের মাঠে আসতে শুরু করেছে। আকাশ থেকে নেমে আসছে দীর্ঘ গলাবিশিষ্ট শকুনের দল।

মুসলমানরা শহিদদের একত্র করে তাদের জন্য একটি সম্মিলিত কবর খনন করতে আরম্ভ করে। এ যুদ্ধে কম-বেশি বিশ হাজার আসামীয় সেনা নিহত হয়েছে। মুসলিম শহিদদের সংখ্যাও কম নয়। হাকিমে বাংলা তার সৈন্য নিয়ে বহু দূর পর্যন্ত আসামীয় বাহিনীকে ধাওয়া করেছেন। তারা মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ভগ্ন মনোরথে গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেলে হাকিম তার বাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দেন।

আদেল নাদের খানকে বললো– 'বাবা হুজুর! দুপুর পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করা অব্যাহত রাখুন, তাহলে আশা করা যায় এদের অবশিষ্ট সৈন্যরাও নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

www.pathagar.com

বাদশা আলি কুলি খান বললেন– 'তুমি ঠিকই বলছো কিন্তু এ মুহূর্তে আমাদের সিপাহিদের বিশ্রাম নেয়া প্রয়োজন। আহতদের ব্যান্ডেজ ও পট্টি দেয়া দরকার। এছাড়া শত্রুপক্ষের পরবর্তী কৌশল সম্পর্কে অবগত হওয়াও আমাদের জন্য অপরিহার্য। বেটা! এ যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়নি! সবেমাত্র যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থা শুরু হয়েছে। এই যুদ্ধের ভয়াবহ বিভীষিকা আসামের রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তোমরা চিন্তা কোরো না। আমি চিন্তা-ভাবনা করে তবেই পা বাড়াবো।'

শহিদদের বিশাল প্রশস্ত সম্মিলিত কবরে দাফন করা হয়েছে।

হাকিমে বাংলা শত্রুদের ধাওয়া করে ফিরে এসে দেখতে পান লোকজন কবরে মাটি ঢালছে। হাকিম দোয়ার জন্য হাত তুলে বললেন– 'শহিদেরা! তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়ার কী প্রয়োজন! তোমরা তো জীবিত এবং নিজ সৃষ্টিকর্তা পরম করুণাময় মহান প্রতিপালকের পক্ষ হতে রিজিকপ্রাপ্ত। আমরা তোমাদের মাধ্যমে আমাদের কামিয়াবির জন্য দোয়া প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ কারিম! এই শহিদদের উসিলায় আমাদের মতো অযোগ্যদের দুর্দশা তুমি লাঘব করে দাও।'

হাকিম আলি কুলি খান বসতির প্রধান নাদের খান ও স্বামী মনোহর লালের অনুরোধে বসতিতে প্রবেশ করেন।

বসতির নারীরা বাড়ির ছাদে উঠে বিজয়ী হাকিমকে অভ্যর্থনা জানায়। বাদশা আলি কুলি খানের ঘোড়া বড় শান-শওকতের সাথে বসতির অলিগলিতে চক্কর দিয়ে নাদের খানের বাসভবনে এসে পৌঁছায়। সামনে কামিনী, কুলসুম, সকিনা এবং ভদ্রেক থেকে আগত অসংখ্য মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হাকিম নাদের খানকে উদ্দেশ্য করে বললেন– 'এই বাচ্চাদের মধ্যে কুলসুম কে?'

কুলসুম এগিয়ে এসে মাথা নিচু করে রাখে। হাকিম আলি কুলি খান ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে গুরুগম্ভীর মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গিতে কুলসুমের কাছে পৌঁছে বলেন– 'মা! কদমে কদমে আমরা তোমার দুঃখের অংশীদার হয়ে থাকবো।'

'আমার জানা আছে, সরকার!'

এমন সময়ে কামিনীর দৃষ্টি পড়ে হাকিমের মাথার ক্ষতস্থানে। সে নিজের অজান্তে তার ওড়না ছিঁড়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে হাকিমের ক্ষতস্থানে পট্টি

www.pathagar.com

বাঁধতে থাকে। কিন্তু হাকিম দীর্ঘদেহী হওয়ার কারণে ভালোভাবে পট্টিটি বাঁধা যাচ্ছিলো না। সে জড়তা ভেঙে সাহস করে বললো– 'আপনি দয়া করে মাথাটা একটু নিচে নামান, পট্টিটি বেঁধে দিই।'

হাকিম আলি কুলি খান মৃদু হেসে বললেন– 'তুমি মনে করো, তোমার দায়িত্ব আদায় হয়ে গেছে। সিপাহিরা যদি এমন মামুলি ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধতে আরম্ভ করে, তাহলে তো কালের বিভীষিকা থেকে রেহাই মিলবে না! যা-ই হোক, তোমরা এখন নিরাপদ।'

ভদ্রেকের অসংখ্য মেয়েকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন– 'প্রিয় বাচ্চারা! সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমরা শুভ সংবাদ শোনার জন্য অপেক্ষা করো। তোমাদের বিধ্বস্ত জন্মভূমিতে আশার আলো ফুটতে শুরু করেছে।'

ক'জন মেয়ে বললো– 'আমাদের কাছে সংবাদ এসেছে, অসংখ্য আসামীয় সেনাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তোমরা সঠিক শুনেছো। কিন্তু এতে তোমাদের লাভ কী?'

এক মেয়ে ক্রোধে ফেটে পড়ে ঠোঁট চিবিয়ে বললো– 'আমরা ওই হিংস্র নরপিশাচদের কাছ থেকে আমাদের জখমের প্রতিশোধ নিতে চাই!'

'না!' হাকিম বললেন– 'এমন ভাবনা মনেও আনবে না। আমরা কয়েদি, শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাদের ওপর হাত তোলা পাপ মনে করি। সময়ের বাস্তবতা পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে থাকো, ভাগ্যবিধাতা মানবতার শত্রুদের সাথে কেমন আচরণ করেন! তোমরা দেখবে– তোমাদের আসামি, যারা গোটা মানবজাতির শত্রু– কীভাবে তাদের তৈরি ফাঁদগুলোতে নিজেরাই ইঁদুরের মতো নিক্ষিপ্ত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরে।'

এরপর বাংলার হাকিম ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বললেন– 'নাদের খান! তোমার কীর্তি চিরস্মরণীয়। তোমার এই অবদানের কথা ভারত সম্রাটের দরবার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।' এরপর হাকিম এদিক-ওদিক তাকিয়ে জানতে চাইলেন– 'আসামের মেহমানরা কোথায়?'

নাদের খান বললেন– 'আলিজাহ্! তাদের চিন্তা-চেতনার উন্মাদনা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে!'

www.pathagar.com

'মানে কী?' হাকিমে বাংলা জানতে চাইলে নাদের খান বললেন– 'ওরা এখন কর্মচারী ও শ্রমিকদের সাথে ভাঙা প্রাচীর মেরামতের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।'

বাদশা আলি কুলি খানের ঠোঁটের কোণে হাসি ছড়িয়ে আছে। তিনি বললেন– 'তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন রেখো। আমি সন্ধ্যায় আবার আসবো।'

হাকিম ঘোড়ার লাগামে টান দিতেই এক আশ্চর্য ভঙ্গিতে ঘোড়াটি সামনের পা ওপরে তুলে পরে পেছনের পা দুটো ঘুরিয়ে বিশেষ ভাব নিয়ে দৌড়ে যেতে থাকে।

কয়েক হাজার সিপাহির জন্য বসতির পাশে তাঁবু তৈরি করে নদীর তীরে হাকিমে বাংলার জন্য অবস্থানকেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। এখন তিনি ওখানেই তাঁবু গেড়ে আছেন, যেখানে গতকাল সন্ধ্যায় কামিনী, শেখর, মোহন ও অন্যরা তাঁবু টাঙিয়ে অবস্থান করেছিলো। এখান থেকে তিনি উভয় দিককার সার্বিক অবস্থা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারছেন।

দুপুরের দিকে হাকিমের সামনে জগন্নাথ মন্দিরের মহাদেব হরিচন্দসহ অন্য অপদার্থ পূজারিদের অপদস্থ অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। যাদের ভদ্রেকের মৌয়াল জগজীবন দাস এবং অন্য হিন্দুরা মন্দিরে আটকে রেখে সাইয়েদ হায়দার ইমামের কাছে সোপর্দ করেছিলো। তাদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। অনেকক্ষণ ধরে হাকিম তাদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। শেষে হাকিম পৃষ্ঠ পরিবর্তন করে বললেন– 'তোমরা সাম্প্রদায়িকতা আর ঘৃণার যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছো, জানো কি তার শিখা কতোদূর গড়িয়েছে? কতো লাখ বনি আদম পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে সেই আগুনে! জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কতো বাড়িঘর। এ সবই তোমাদের পাপের ফল। তোমাদের পাপের শাস্তি হিসেবে মৃত্যু তো খুবই তুচ্ছ। তোমরা কি একবারের জন্যও ভাবোনি যে, তোমাদের এই পৈশাচিকতা ও বদমাশি সম্পর্কে মহান সৃষ্টিকর্তা বেশ অবগত! তাঁর শাস্তি তো বড়ই ভয়াবহ!'

হরিচন্দ বললো– 'আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমরা বড় ভুল করে ফেলেছি। সত্যমনে আমরা অঙ্গীকার করছি, ভবিষ্যতে আর কখনো আমরা এমন কর্মকাণ্ড করবো না।'

হাকিম ক্রোধে ফেটে পড়ে বললেন– 'আমি আমার কথায় ভুল করে ফেলেছি। কারও বেঁচে থাকা বা না-থাকার ব্যাপারে আমার কোনো পরোয়া নেই। এসব

www.pathagar.com

তো তাকদিরের ব্যাপার। এমন সিদ্ধান্ত আসে সরাসরি আসমান থেকে। আমি রাজত্বের পরোয়া করি না। আমি তো কেবল তোমাদের ওই নাপাক, মানবতাবিরোধী ও ঘৃণিত কাজের কর্মফল দেখার অপেক্ষায় আছি।'

হাকিমে বাংলা আলি কুলি খানের ক্রোধ সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। তার চোখে-মুখে ঘৃণার ধোঁয়া। রাগে-ক্ষোভে তিনি অনবরত কেঁপেই চলেছেন। তরবারি কোষমুক্ত করতে গিয়ে বললেন– 'তোমরা তোমাদের ধর্মের আসামি। তোমরা হিন্দু জাতির ধর্মীয় আবেগ, অনুভূতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো। কুমারীদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে তোমরা কুণ্ঠাবোধ করোনি। আমি নিজ চোখে এমন অসংখ্য জীবিত লাশ দেখেছি, যাদের নিষ্পাপ আত্মাকে তোমরা এই অপবিত্র হাত দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছো!'

পূজারিদের চেহারায় মৃত্যুর হলুদাভ দ্যুতি চমকাচ্ছে। হাকিমের তরবারির ধারালো বিচ্ছুরণ তাদের বাকশক্তি কেড়ে নিয়েছে। খুব কষ্টে নিজ পায়ে দাঁড়ানো। তাদের পেছনে দাঁড়ানো সিপাহিদের তরবারি কোষমুক্ত। এরা হাকিমের ইশারার অপেক্ষায়...।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর হাকিম বললেন– 'সম্ভবত তোমাদের কাছে নিজেদের সাফাই গাওয়ার মতো কোনো সত্য শব্দ আর অবশিষ্ট নেই।'

বাদশা আলি কুলি খান বসে পড়লেন। তার কপাল তরবারির কবজায় ঝুঁকে গেছে। চোখ বেয়ে ঝরছে অশ্রু। ক্রোধে ফেটে পড়ে তিনি অবিরত কাঁদছেন। ইশারায় সিপাহিদের ডেকে বললেন– 'এই কুলাঙ্গারদের নাদের খানের বসতিতে নিক্ষেপ করো। আগামীকাল আমি বসতির হিন্দুদের রায় মোতাবেক তাদের বিচার করবো।'

এমন সময়ে তাঁবুতে এক যুবক প্রবেশ করলে হাকিম চমকে ওঠেন। এসেই সে বললো– 'মহান আল্লাহ তাআলা সত্যের পতাকা উড্ডীন রেখেছেন। মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের বাহিনী হাজার হাজার সিপাহির লাশ ফেলে রেখে পিছু হটেছে। বর্তমানে ভদ্রেকের হিন্দুরা আনন্দ উদ্‌যাপন করছে। ওই গ্রামের মৌয়াল এবং আরো ক'জন সম্মানিত ব্যক্তি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। ভেতরে আসার জন্য হজরতের অনুমতি প্রার্থনা করছেন।'
হাকিমের চেহারাজুড়ে স্বস্তির প্রলেপ। তরবারি রেখে তিনি বললেন– 'অনুমতি দেয়া হলো।'

www.pathagar.com

বার্তাবাহক এই যুবক হচ্ছে সেই যোগী, যে কয়েক দিনের জন্য গুপ্তচরবৃত্তির জন্য মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের ফৌজের ভেতর অবস্থান করেছিলো। সে শিকারি কবুতরের সাহায্যে সংবাদ পাঠাতো হাকিমের কাছে। তার নাম হচ্ছে সুলতান আহমাদ। বড়ই বিচক্ষণ ও বিশ্বাসী সে। সালাম দিয়ে সে পেছনে ফিরে গেলে হাকিম বললেন– 'সুলতান আহমাদ! জটিল জটিল ব্যাপারগুলো তুমি খুবই সহজভাবে সম্পন্ন করে থাকো। মহামহিম রব্বে কারিম তোমার মন-মননে আশ্চর্যজনক যোগ্যতা দিয়ে ধন্য করেছেন।'

সুলতান আহমাদ বাইরে বেরিয়ে গেছে। পর মুহূর্তেই ভদ্রেকের বৃদ্ধ মৌয়াল জগজীবন রামদাস এবং আরো চারজন সম্মানিত ব্যক্তি তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করলেন। হাকিম দাঁড়িয়ে তাদের সম্মানজনকভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। জগজীবন রামদাস এগিয়ে এসে হাকিমের হাতে চুমু খেলেন। পরে মনের অজান্তেই তাঁর পায়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করে দিলেন। অন্য হিন্দুরাও এ দৃশ্য দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারলো না।

বাদশা আলি কুলি খান বৃদ্ধ মৌয়ালকে ওঠাতে গিয়ে বললেন– 'এ তুমি কী করছো, ভাই!'

'আমরা আমাদের অপরাধের স্বীকৃতি দিচ্ছি, সরকার! আমরা বড় পাপী! আমাদের অপরাধ বড় ভয়ানক! আমরা আমাদের স্ত্রী, কন্যা ও বোনদের সতীত্ব খুন করেছি।'

হাকিম জগজীবনকে নিজ পা হতে ওঠালেন। নিজ হাতে তার চোখের পানি মুছে দিয়ে বললেন– 'তোমরা আক্রান্ত। ভোরে তোমাদের আক্রমণ করা হয়েছে। কিন্তু ভাগ্য ভালো সন্ধ্যের পূর্বেই তোমরা ঘরে ফিরে এসেছো। আমার দৃষ্টিতে তোমরা নিষ্পাপ। তোমাদের সবাইকে এই কুলাঙ্গাররা ধর্মের নামে পথভ্রষ্ট করে রেখেছে।'

জগজীবন রাম পেছনে ফিরে দেখলেন, জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের পূজারিরা থরো থরো করে কাঁপছে।

জগজীবন রাম মৃদুস্বরে দাঁড়িয়ে বললেন– 'হ্যাঁ, এই শয়তানরাই আমাদের বোকা বানিয়ে রেখেছে। এরাই মহারাজা জয়ধ্বজ সিংকে আসাম থেকে নিয়ে এসেছে। এরাই ওই হিংস্র নরপিশাচ– যাদের শয়তানি প্ররোচনায় হাজার হাজার ঘরে আজ আলোর পরিবর্তে ঘনঘোর অন্ধকারে ছেয়ে আছে। এদের

www.pathagar.com

কারণেই আজ আমরা নিজের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যাদের সামনে লজ্জিত। এরা এখনো জীবিত! আমরা তো ভেবেছি তাদের মাংস নিয়ে বনের পশুরা টানাহেঁচড়া করছে!'

হাকিম এবার বসে বললেন– 'বাহ্যত এদের দেখতে জীবিতই মনে হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এরা শূলিতে চড়ানো মানুষের মতোই ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি ক্ষণে তারা মৃত্যু কামনা করবে, কিন্তু সম্ভবত মৃত্যুতেও এরা ছাড় পাবে না। শত শত বছর ধরে এদের আত্মা আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরতে থাকবে। এখন তাদের বেঁচে থাকা মৃত্যুর চেয়ে নিকৃষ্ট!'

সিপাহিরা আদবের সঙ্গে বললো– 'এই পূজারিদের কি এখন বসতিতে পৌঁছে দেবো?'

'না।' হাকিম বললেন– 'দুপুরে আমি নিজেই ওখানে যেতে চাই এবং এই খবিশদের আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো।'

সিপাহি এদের টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যেতে চাইলে মহাদেব হরিচন্দ এবং অন্য পূজারিরা গড়াগড়িয়ে বলতে লাগলো– 'আমাদের ক্ষমা করে দিন... আমরা দেশান্তরিত হয়ে যাবো, আমরা হিমালয় পর্বতের দিকে চলে যাবো এবং সেখানেই জীবনভর ভগবানের তপস্যা করে যাবো।' অনেকক্ষণ এরা চিৎকার করতে থাকলো। সিপাহিরা পরে টেনে এদের বাইরে নিয়ে যায়।

এরপর হাকিম দেলোয়ার খানকে উদ্দেশ করে বললেন– 'এদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করো। কিছুক্ষণ এরা বিশ্রাম নিয়ে নিক। পরে আমার সঙ্গে এরাও নাদের খানের বসতির দিকে যাবে। ভদ্রেকের বাচ্চাগুলো তাদের প্রিয়জনদের দেখলে খুশি হবে। তাদের দুঃখ-কষ্টের ভার কিছুটা হলেও লাঘব হবে।'

দিনের শেষভাগে বাংলার হাকিম ভদ্রেক থেকে আসা হিন্দু এবং বন্দী পূজারিদের সঙ্গে নিয়ে নাদের খানের বসতির দিকে রওনা হন। তার সাথে আছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সশস্ত্র সৈনিক। হাকিমের ঘোড়া সবার শীর্ষভাগে। নাদের খান এবং বসতির হিন্দু-মুসলিম অন্য নেতৃবৃন্দ বসতির বাইরে এসে তাকে মোবারকবাদ জানিয়ে খুবই সম্মানের সাথে বাসভবনে নিয়ে এসেছেন। হাকিমের জন্য উঁচু স্থানে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। বাসভবনের প্রশস্ত উঠোনে

www.pathagar.com

ছয়-সাতশ লোক সমবেত আছে। এদের মধ্যে স্বামী মনোহর লালের মতো স্বদেশপ্রেমিক হিন্দু পণ্ডিত ছাড়াও ভদ্রেক থেকে আসা হিন্দু মেয়েরা বসে আছে। আসামের ওই দুই সৈনিককে বিশেষ মর্যাদায় হাকিমের কাছাকাছি বসানো হয়েছে– যাদের সাহায্যে কামিনী ও শেখরকে মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের কয়েদখানা থেকে বের করে আনা সম্ভব হয়েছিলো।

হাকিম মঞ্চে বসে বললেন– 'কুলসুম ও কামিনী কোথায়?'

নাদের খান জবাবে বললেন– 'আলিজাহ্! ওরা সারা রাত জেগে ছিলো। আমি কড়া নির্দেশে ওদের বিশ্রাম নিতে বলেছি। আপনি বললে ওদের এখনই ডেকে নিয়ে আসবো।'

'হ্যাঁ'। হাকিম বললেন– 'সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করে ওদের এখানে নিয়ে আসা হোক। আজকের এই সমাবেশ বিশেষ করে কামিনী, কুলসুম এবং ওইসব বাচ্চার জন্য সাজানো হয়েছে।'

কিছুক্ষণ পরই কামিনী ও কুলসুম বেশ ক'জন সেবিকার সাথে উপস্থিত হলো। ওদের পবিত্র অপ্সরীর মতো লাগছিলো। তারা হাকিমের সবুজ রেশমি শেরওয়ানিতে চুমুর প্রলেপ এঁকে মাথা নুইয়ে সালাম করলো। হাকিম উভয়ের মাথায় স্নেহের পরশ বুলালেন এবং নিজ আসনের ডান দিকে বসতে ইশারা দিলেন।

তাদের হাল-অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। ভদ্রেক থেকে আগত মেয়েদের উদ্দেশ করে বললেন– 'বাচ্চারা! আজ ভোরে আমি তোমাদের সাথে একটি ওয়াদা করেছিলাম। আল্লাহর রহমতে আমাদের-তোমাদের-সকলের জন্য একটি সুসংবাদ আছে। ভদ্রেকের আকাশ থেকে শকুনের দল দূর হয়ে গেছে। কালো মেঘ সরে গিয়ে সেখানে এখন শুভ্রসফেদ আলো ঝিকিমিকি করছে। ওখানকার পরিবেশ এখন শান্ত ও নিরাপদ।'

এক মেয়ে দাঁড়িয়ে বললো– 'আলিজাহ্! ওইসব কাপুরুষ, নপুংসক ও মানবতার শত্রুদের সাথে আমাদের আর কোনো সম্পর্ক নেই। রক্তের সব সম্পর্ক আমরা ছিন্ন করে দিয়েছি। এখানে আমাদের আত্মা পরম শান্তিতে আছে। আমাদের সব রকম সম্পর্ক আর বন্ধন এখন এই বসতিকে ঘিরে। আমরা ভদ্রেকের নির্লজ্জ পুরুষদের মুখ আর দেখতে চাই না।'

হাকিম নম্রসুরে বললেন– 'তোমাদের আবেগের প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে।

www.pathagar.com

কিন্তু মা, একটু চিন্তা করে দেখো– অন্যায় তো তোমাদের সবার সাথে এক সময়েই হয়েছে। তোমরা সকলেই যথেষ্ট শাস্তি ভোগ করেছো। তোমরা কি তোমাদের পুরুষদের মহারাজা জয়ধ্বজ সিংকে সহায়তা করতে নিষেধ করেছিলে? আমার জানামতে, তোমরা এমনটি করোনি। যখন পরিস্থিতি বিগড়ে যাবার ব্যাপারে তোমরা সকলেই সমান অপরাধী। তো... এককভাবে পুরুষদের ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়া ইনসাফের কথা নয়! আমার পরামর্শ হচ্ছে, তোমাদের মনের পঙ্কিলতাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পানি দিয়ে উত্তমরূপে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিজ নিজ আত্মীয়স্বজনদের আগের মতো মনের মাঝে ঠাঁই দাও। রক্তের বন্ধন এভাবে ছিন্ন করা যায় না!'

সব মেয়ে চুপচাপ। হাকিম একজন সিপাহির দিকে ইশারা করলেন। এরপর মৌয়াল রাজগোপাল এবং তার পেছনে পেছনে ভদ্রেক থেকে আসা অন্য হিন্দুরা দরবারে প্রবেশ করলেন। চোখের সামনে এক মর্মস্পর্শী আবেগঘন পরিবেশ। নিজ নিজ স্থানে সকলেই ওদের দিকে চোখে চোখে তাকাচ্ছে। সবার চোখের কোণে মনের অগোচরে মোটা মোটা অশ্রুবিন্দু, যার ভারে একসময় সবাই মাথা নিচু করে রাখে। মৌয়াল রাজগোপাল এগিয়ে এসে নিয়মমাফিক হাকিমের শেরওয়ানিতে চুমু খেয়ে পরে দু'পা পেছনে সরে হাত জোড় করে কুর্নিশ করে নমস্কার বললো। অন্য হিন্দুরাও একে একে শিষ্টাচারের এই নিয়ম পালন করে গেলো। তাদের চোখে তখন চিকচিক করছিলো অশ্রুবিন্দু। বহু কষ্টে তারা চোখের পানি মুছলো।

হাকিম তাদের আবেগের মাত্রা অনুভব করে বললেন– 'রাজগোপাল! এই বাচ্চাদের মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে এসো। এরা বড়ই দুঃখী। বহু অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করেছে তারা। জুলুমের বহতা নদী সাঁতরাতে সাঁতরাতে এদের আত্মা মারাত্মক আহত হয়ে পড়েছে। সব সময় এদের সঙ্গে স্নেহ-মায়ামাখা ব্যবহার করবে।'

রাজগোপাল এগিয়ে গিয়ে প্রথমে কুলসুমের, এরপর কামিনীর পায়ে চুমু খায়। এরপর অন্য মেয়েদের দিকে তাকাতে থাকে। আবারও তার চোখে বইতে থাকে বাঁধভাঙা অশ্রুনদী। আর্তনাদ একসময় রূপ নেয় চিৎকারে। আহাজারি আর কান্নার রোল বয়ে যায় সর্বত্র।

হাকিমের চোখও অশ্রুসিক্ত। তিনি দ্রুত বলে উঠলেন– 'প্রিয় বাচ্চারা! উঠো এবং তাদের বুকে আশ্রয় নাও। বহু দূর দিয়ে এরা পাহাড়-পর্বত, বন-

www.pathagar.com

বাদাড় পেরিয়ে রক্তাক্ত হয়ে তোমাদের কাছে এসেছে। সব মান-অভিমানের পাঠ বন্ধ করো। যেখানে ঘৃণার বসবাস, সেখানে মানবতার সৌন্দর্যের পুষ্প ফোটে না।'

এরপর একে একে সব মেয়ে নুয়ে নুয়ে রাজগোপাল এবং অন্য স্বজনদের পায়ে হাত দিয়ে আশীর্বাদ নেয়। এই মর্মস্পর্শী দৃশ্যপট পাল্টে দিতে হাকিম একজন সৈনিককে নির্দেশ দিলেন আসামিদের উপস্থিত করার জন্য।

কিছুক্ষণ পর দশ-বারোজন সৈনিক জগন্নাথ মন্দিরের পূজারিদের টেনে-হিঁচড়ে দরবারে নিয়ে এলো।

কুলসুমের দৃষ্টি তাদের দিকে এবং পরে মহাদেবের চেহারার দিকে পড়লো। সে নিজের অজান্তে বসা থেকে উঠে মহাদেবের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মহাদেবের মাথা নিচু হয়ে ছিলো। সে সময় তার কোনো খবর নেই। কে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। কুলসুমের অগ্নিশর্মা চোখ তার চেহারা হতে সরছেই না।

একটু সে চিৎকার দিয়ে বললো– 'বুনো কুকুর! চোখ খুলে আমাকে দেখ! চিনে নে... আমি সেই বিমলা দেবী তোর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমাকে নিয়ে চল তোদের জগন্নাথের চরণতলে। আমার সন্ধানে তোরা বেশ দুঃখ পেয়েছিস! লাখ লাখ নিষ্পাপ মানুষের রক্তনদী সাঁতরে সাঁতরে তোরা আমাকে খুঁজে বেড়াতে গিয়ে এখানে পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিস! কোথায় তোদের সাঙ্গোপাঙ্গরা? আয় আমার দিকে হাত বাড়া।'

'ঠিক আছে' কুলসুম বলে চললো– 'ভাগ্যবিধাতা এখন তোদের হাত অবশ করে রেখেছে। এবার তাহলে আমার হাতের তামাশা দেখ!' এটা বলার সাথে সাথেই সে পাশে দাঁড়ানো এক সিপাহির কোমর হতে তরবারি নিয়ে বিজলির গতিতে মহাদেবের মস্তক দেহ হতে ছিন্ন করে দিলো।

পূজারির রক্তের ছিটা এসে পড়তে থাকলো কুলসুমের সাদা জামায়। এতে তার জামা রঙিন হয়ে গেলো। এরপর তার চোখ পড়ে বাকি পূজারিদের দিকে। সে বলতে থাকে– 'তোদের হিংস্র থাবাও পড়েছিলো বিমলা দেবীর নিথর শরীরে।' এই বলে মুহূর্তেই সে তরবারির আঘাতে চারজনকেই কুপোকাত করে দেয়।

www.pathagar.com

এরপর সে মহাদেবের নিষ্প্রাণ দেহে থুতু নিক্ষেপ করে বলে– 'এখন কেয়ামত অবধি তোদের অপবিত্র কীর্তিকাণ্ডের ভয়াল সাজা ভোগ করতে আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে যা।'

সে ফিরে আসে। একবার সে হাকিমের দিকে তাকায়। তার চেহারায় তখন আপন ব্যক্তিত্বের মায়াময় ছাপ ফুটে আছে। কুলসুম ধীর পায়ে এগিয়ে হাকিমের কাছে চলে আসে। তরবারিটি হাকিমের সামনে রেখে তার পা ছুঁয়ে পড়ে থাকে। অবচেতনভাবে সে কাঁদতে থাকে নির্ঝর। সে সুধাতে থাকে– 'একজন মুসলিম নারী কী করে তার সম্ভ্রম হত্যাকারীকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সহ্য করতে পারে! আমি শিষ্টাচার লঙ্ঘন করে বড় অন্যায় করে ফেলেছি। আমাকে শাস্তি দিন!'

হাকিম দাঁড়িয়ে বড় স্নেহের সাথে তাকে ধরে তুললেন। বুকে নিয়ে বললেন– 'মা! তুমি আমার ধারণার বাইরে কিছু করোনি। আমি সেনাবহরের দিকে চললাম।'

এরপর তিনি নাদের খানকে লক্ষ করে জিজ্ঞেস করলেন– 'দেয়াল নির্মাণের কাজ কতো দূর বাকি আছে?'

'দেয়াল তৈরি হয়ে গেছে, আলিজাহ্! আগের চেয়ে আরো দৃঢ়ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে।'

'ঠিক আছে' হাকিম বললেন– 'আসামের কয়েদিরা কোথায়? তাদের ভালো করে খাবার দিও।' হাকিম জোর দিয়ে বললেন। এরপর ডান দিকে বসা আসামীয় সেনাদের উদ্দেশ করে বললেন– 'আমি তো এখনো আমার ওপর অনুগ্রহকারীদের নামটাও জিজ্ঞেস করলাম না!'

একজন দাঁড়িয়ে বললো– "আলিজাহ্! আমার নাম 'শ্যাম', আর ওর নাম 'সুন্দর'।"

'খুব সুন্দর ও প্রিয় নাম।' হাকিম বললেন।

***

ইসমাইলের ক্ষতস্থানে পট্টি লাগানো। কামিনী কাছে এসে বাহুতে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো– 'ইসমাইল, তোমার কী অবস্থা?'

www.pathagar.com

ইসমাইল বললো– 'আম্মা হুজুর! তাকে বলুন, আমার সাথে যেন কোনো কথা না বলে। আমি তার সাথে কথা বলবো না!'

আম্মা খানজাদি মুচকি হাসতে থাকলে কামিনী বললো– 'আম্মা! এই ভীত সিপাহিকে বলে দিন, আমি কথা বলতে আসিনি; রোগী দেখতে এসেছি!'

ইসমাইল বললো– 'আম্মা হুজুর! তাকে বলে দিন, সে যেন ক্ষমা চায় এবং এমন দম্ভ ধরনের কথাটি ফিরিয়ে নেয়। কে বলেছে আমি ভীত সিপাহি? আম্মা হুজুর! সে আপনার ছেলেকে অপমান করেছে! তার কান মলে দিন!'

কামিনী হাসতে হাসতে বললো– 'আম্মা হুজুর, আমার কান তো মলে দিবেন ঠিক আছে, কিন্তু এই পাজি সিপাহিকে জিজ্ঞেস করুন তো, সে আমাকে কেন ধমকাচ্ছে?'

ইসমাইল বললো– 'তাকে জিজ্ঞেস করুন তো, সে এখানে এসেছে প্রায় আট প্রহর অতিবাহিত হয়ে গেছে, এতোক্ষণ সে কেন আমাকে দেখতে এলো না? অথচ বোন তো ভাইদের প্রাণের টুকরো হয়ে থাকে। ভাইয়ের গায়ে একটু কাঁটা বিঁধলে তো বোনের প্রাণ বেরিয়ে যাবার কথা!'

সত্যি সত্যিই এবার কামিনী কেঁদে ফেলেছে।

আম্মা খানজাদি কামিনীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন– 'হাসতে হাসতে আবার কান্নার কী হলো? ইসমাইল! ওঠো, আমার মেয়ের কাছে ক্ষমা চাও। তুমি তার মনে দুঃখ দিয়েছো!'

ইসমাইল কেঁপে কেঁপে উঠে বসলো, 'কামিনী! আল্লাহর ওয়াস্তে চোখের পানি সংবরণ করো, নইলে আমি আমার প্রাণ বিসর্জন দেবো।'

'ইসমাইল! আমার ভাই...!' কামিনী চোখ মুছতে মুছতে বললো।

'বোন কামিনী! আমি সম্পূর্ণ সুস্থ! তোমাকে আমার সামনে দেখে তো আমার ক্ষত একদম ভালো হয়ে গেছে।'

এক সেবক বাইরের দরজায় শব্দ করে বললো– 'সরদার নাদের খান আসছেন!'

নাদের খান ও আদেল খান লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে ইসমাইলের কক্ষে প্রবেশ করলেন।

www.pathagar.com

আদেল খানকে সৈনিক বেশে বেশ সুদর্শন লাগছে। তার সবুজ রেশমে তৈরি শেরওয়ানি কাঁধ বেয়ে নিচ পর্যন্ত চলে গেছে। গলায় মূল্যবান মুক্তার মালা। কক্ষে উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে উভয়কে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো।

নাদের খান কামিনী, কুলসুম ও সকিনাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন– 'আল্লাহ যেন এমন বাগানকে সব সময় সতেজ ও প্রাণবন্ত রাখেন।'

ইসমাইল পিতার পায়ে চুমু খেলো এবং আদেল খানের সাথে মুসাফাহা করলো। আদেল খান ইসমাইলের কাঁধে হাত রেখে বললো– 'এখন শরীরটা কেমন?'

'সম্পূর্ণ সুস্থ। তরবারি ওঠাতে পারি। এই দেখো!' তার আঘাতপ্রাপ্ত হাতটি নাড়াতে নাড়াতে বললো– 'আমার আর ব্যথা লাগছে না।'

নাদের খান ছেলের কপালে চুমু খেয়ে বললেন– 'ইসমাইল! আমরা ফেরার অনুমতি চাচ্ছি।'

নাদের খান উঠে দাঁড়ালেন। আদেল খান দরজার দিকে এক কদম উঠিয়ে আবার এদিকে ফিরে বললো– 'কামিনী আমাদের কাছে হাকিম আলি কুলি খানের পক্ষ হতে তোমার জন্য আমানত।'

কামিনী মাথা তুলে আদেল খানের দিকে তাকালে আদেল খান তার গলায় পরা মুক্তার মালাটি তুলে আম্মা খানজাদির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো– 'আম্মা হুজুর! এটা তার গলায় পরিয়ে দিন।'

আম্মা খানজাদি হাত বাড়িয়ে মালাটি নিলেন এবং বিসমিল্লাহ পড়ে কামিনীর গলায় পরিয়ে বললেন– 'মা! মোবারক হোক!'

কামিনীর মাথা নুয়ে আসে। অবচেতনভাবে তার চক্ষু বেয়ে অশ্রুবিন্দু বিছানায় পড়তে থাকে।

আদেল খান দ্রুতপায়ে বাইরে চলে যায়।

নাদের খান কামিনীর কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'মা কামিনী! তুমি বড়ই সৌভাগ্যবান। তুমি যতো দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করেছো, আল্লাহ তাআলা তোমাকে তার চেয়েও অধিক সুখ দেবেন। আসলে মা! সোনা অলংকার হওয়ার আগ পর্যন্ত বহু সঙিন দুর্গম পথ মাড়িয়ে আসতে হয়!'

www.pathagar.com

কামিনী ঝুঁকে সরদার নাদের খানের পা ছুঁয়ে বললো– 'আপনার চরণতলে আমার ঠাঁই হোক– এটাই আমার কামনা, এটাই আমার সম্মান।'

এরপর নাদের খানও কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ধীরে ধীরে রাত ঘনীভূত হতে থাকে। বসতির চতুর্দিকে গুঞ্জন করে চলেছে মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর ঘোড়ার টগবগ শব্দ। অর্ধরাত পেরিয়ে গেলে আসাম বাহিনী বন থেকে বেরিয়ে এসে অতর্কিত আক্রমণের চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলিম চৌকস ও হুঁশিয়ার সৈনিকেরা ব্যর্থ করে তোলে তাদের এ অপচেষ্টা।

www.pathagar.com

বিষবৃক্ষের ফল

মহারাজা জয়ধ্বজ সিং মাথা নিচু করে ক্ষোভে-ক্রোধে কক্ষের ভেতর পায়চারি করছেন। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ান থরথর করে কাঁপছে। কেননা মহারাজার ক্রোধ কোনো-না-কোনো সৈনিকের রক্তেই প্রশমিত হয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর সেনাপতি কৃষ্ণকুমার, প্রতাপ সিং, বিক্রম ও ঘনশ্যাম ঠাকুর– চারজনই একত্রে মহারাজার কক্ষে প্রবেশ করলো। চারজনই বেশ আত্মপ্রত্যয়ী ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

মহারাজা গভীর দৃষ্টিতে চারজনের দিকে তাকালেন। পরে সিংহাসনে বসে বললেন– 'সেনাপতি কৃষ্ণকুমারজি! কোনো খবর আছে? জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের মহাদেব এবং তার সাথিরা কোথায় হারিয়ে গেলেন?'

কৃষ্ণকুমার শান্তকণ্ঠে জবাব দিলো– 'মহারাজ! ওরা সকলেই মুসলমানদের কবজায় রয়েছে।'

মহারাজা রাগে-ক্রোধে ফেটে পড়া চোখে সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বললেন– 'এ তুমি কেমন ধরনের জবাব দিচ্ছো? তুমি কি এটাকে কোনো মামুলি ঘটনা মনে করেছো?'

কৃষ্ণকুমার বললো– 'আপনি বিশ্ববিখ্যাত একজন সমর বিশেষজ্ঞ। সমরে-সংগ্রামে এ ধরনের ছোট-বড় ঘটনা সামনে এসে থাকেই। কখনো কখনো রাজা-মহারাজাও পরাধীনতার খাঁচায় বন্দী হতে বাধ্য হয়।'

মহারাজা জয়ধ্বজ সিং আবারও ক্রোধান্বিত স্বরে কৃষ্ণকুমারের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়লেন– 'কৃষ্ণকুমার! তোমার হুঁশ ঠিক আছে তো! তোমার কি জানা আছে, তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে আছো এবং কী বলে যাচ্ছো?'

www.pathagar.com

মহারাজা তরবারি মুঠো করে ধরলেন।

এ সময় কৃষ্ণকুমারের মতলবও ভালো ঠেকছিলো না। সে বললো– 'মহারাজ! আপনি খামোখা খ্যাপাটে হয়ে উঠেছেন। জ্বলন্ত আশাগুলো ছাই করে তুলছেন। আর ওই ছাইয়ের নিচে অসংখ্য অগ্নিশিখা উগরে উঠছে। আমরা আমাদের কপালে পরাজয়ের কোনো নিশানা দেখতে চাই না। আমরা সবাই নির্দোষ!'

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর মহারাজা জিজ্ঞেস করলেন– 'তোমার ধারণা মতে এই পরাজয়ের নেপথ্যে দায়ী কে?'

কৃষ্ণকুমার বললো– 'যে নৌকার নিচ দিয়ে তার মাঝি ফুটো করে দিয়েছে, সেটাকে বাঁচানো আর সম্ভব নয়। বলুন তো, ভদ্রেক গ্রামের মন্দিরের সুড়ঙ্গের রহস্য সম্পর্কে কারও কি কোনো ধারণা ছিলো? কামিনী ও মোহনের পালিয়ে যাবার কোনো পরিকল্পনার সংবাদ আমাদের ছিলো কি? এদিকে হাশিম আর মোহন উভয়ে কী করে অপরিচিতের বেশ ধরে রাতে রাতে রাজকুমারীর কাছে চলে আসে? অজয় কুমারের খুনের ঘটনাকে কেন একটি স্বাভাবিক ঘটনা মনে করা হলো? মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের আদরের ভাতিজা এবং আসামীয় বাহিনীর সেনাপতির মর্মান্তিক খুনের ঘটনা যখন একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তো এর পরবর্তী সব কটি ঘটনাই আমাদের কাছে অতি সাধারণ বলেই মনে হচ্ছে।'

মহারাজা এবার কিছুটা নরম সুরে বললেন– 'কৃষ্ণকুমার! এ মুহূর্তে তুমি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছো। যাও, বিশ্রাম নাও। সন্ধ্যায় আবার সাক্ষাৎ হবে।'

কৃষ্ণকুমার কুর্নিশ করে জিজ্ঞেস করলো– 'মহারাজ! আমি আবেগাপ্লুত নই, সত্যি সত্যিই বলছি। সত্য কথা কিছুটা তিক্তই হয়ে থাকে।'

মহারাজা বিক্রমের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'বিক্রম! আমি তো সারা বাংলা বিজয় করার প্রত্যয় নিয়ে আসাম ছেড়ে এসেছি, কিন্তু আফসোস; এ মুহূর্তে ক্ষুদ্র একটি বসতি আমাদের জন্য দুর্লঙ্ঘনীয় পাহাড় হিসেবে দেখা দিয়েছে!'

বিক্রম অবনত মস্তকে প্রণাম করে বললো– 'চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমরা এটাকে প্রাথমিক বাধা হিসেবে ধরে নিতে পারি। আমাদের যদিও কিছুটা ক্ষতি হয়েছে, এটাও ঠিক যে, শত্রুপক্ষেরও তেমন কোনো উপকার হয়নি। ওই বসতিটির বিজয় ছিনিয়ে আনতে আমরা যে পরিমাণ প্রাণ

www.pathagar.com

বিসর্জন দিয়েছি, তারাও বসতি রক্ষার খাতিরে সমপরিমাণ প্রাণ উৎসর্গ করতে বাধ্য হয়েছে।'

বিক্রমের কথা শুনে মহারাজার ক্ষোভ খানিকটা প্রশমিত হয়। চেহারা হতে ক্রোধের ছাপ অনেকটা কমে যায়। কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বললেন– 'ঠিকই বলেছো তুমি। সামনের জন্য কী পরিকল্পনা নিলে?'

বিক্রম বললো– 'শুনেছি, হাকিমে বাংলা স্বয়ং নাদের খানের বসতির অদূরে তাঁবু স্থাপন করেছে। আমরা তাকে ওখানেই জিরিয়ে জিরিয়ে হামলা করতে চাচ্ছি। কয়েক দিন ধরে আমরা ভদ্রেক এবং নাদের খানের বসতির আশপাশে গেরিলাযুদ্ধ অব্যাহত রাখবো। প্রতিদিনই আক্রমণ করবো এবং প্রতিদিনই পিছু হটে বনের গভীরে চলে যাবো। এভাবে একদিকে তো আমাদের ভালো করে প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ মিলবে, অন্যদিকে শত্রুর ব্যূহেও যুদ্ধের উন্মত্ততা বাড়তে থাকবে। যুদ্ধের উন্মাদনা সীমা ছাড়িয়ে গেলে অনেক বড় বড় যুদ্ধবাজও হুঁশ হারিয়ে আবেগ ও জোশের দ্বারা কাজ নিতে থাকে। আবেগের ঝান্ডা নুয়ে পড়লে তখন হুঁশ ফিরে আসে, তখনই তারা পরাজয়ের পথে এগোতে থাকে।'

এ কথা শুনে মহারাজার চোখে-মুখে তৃপ্তির ছায়া বয়ে যায়। তিনি বলেন– 'বিক্রম! আমি তোমার পরিকল্পনাকে যথাযথ রণকৌশল বলে মনে করি।'

কৃষ্ণকুমার বললো– 'চাচা মহারাজ! যদি হস্তীবাহিনীকে ডেকে আনা হয়, তাহলে ভালো হবে।'

মহারাজা বললেন– 'আমি এর ব্যবস্থা করে রেখেছি। কিন্তু আমার পরামর্শ হচ্ছে– হস্তীবাহিনীকে সাগর-নদীর গোপন পথে অতি দ্রুত চট্টগ্রামের দিকে পাঠিয়ে দেয়া ভালো হবে।'

এরপর মহারাজা দাঁড়িয়ে বললেন– 'যাও, এখন তোমরা বিশ্রাম নাও।'

মহারাজা হাততালি দিয়ে একজন দারোয়ানকে ডেকে বললেন– 'প্রধানমন্ত্রী ও মহাত্মাকে ডেকে আনা হোক।'

কৃষ্ণকুমার, বিক্রম ও অন্যান্য বাহিনীর প্রধান রাজকক্ষ হতে বেরিয়ে যায়। ফেরার পথে কৃষ্ণকুমার বিক্রমের কাঁধে হাত রেখে বলে– 'তুমি কি দেখেছো কীভাবে আমি চাচা মহারাজের আহত শিরায় আঙুল দিয়েছি! এরপর কীভাবে

www.pathagar.com

তার ক্ষোভ-ক্রোধ নিমিষেই উবে যায়! এই সকল ধ্বংসযজ্ঞের পেছনে মহারাজার আদরের দুলালী রাজকুমারীর প্রচ্ছন্ন হাত রয়েছে। তার অনুগ্রহেই কামিনী ও মোহন পালাতে সক্ষম হয়েছিলো। এখন পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে যতো ধরনের ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তার সবগুলোই রাজকুমারীর অব্যাহত পৃষ্ঠপোষকতায় সংঘটিত হচ্ছে। না জানি আসামে এখন মুসলিম কয়েদির সাথে সে কী ধরনের খেলা খেলে চলেছে! এটা ভাবতেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে!'

বিক্রম মৃদু হেসে বললো– 'ধৈর্য... ধৈর্য ধরো, সব ঠিক হয়ে যাবে। সময় খুব দ্রুতই তোমার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক হয়ে উঠছে।'

ওদিকে প্রধানমন্ত্রীকে মহারাজা বললেন– 'এই মন্দিরের সকল সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্ত, যোগী ও পূজারিদের বাংলার ওইসব অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়া হোক, যেখানকার নেতা ও গোত্রপ্রধান হিন্দু। তাদের যেন মুসলমানদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা হয়।'

প্রধানমন্ত্রী বললেন– 'মহারাজের এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। সবকিছুই মহারাজের প্রত্যাশা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে।'

'ঠিক আছে।' মহারাজা বললেন– 'এখন তুমি যাও।'

এক মন্ত্রীর কাছে মহারাজা জানতে চাইলেন– 'আচ্ছা মন্ত্রী! এই যে রাজসিক ভোগ-বিলাসের প্রচলন, এখানকার সেনা ও শীর্ষকর্তাদের ভোগ-বিলাস, এটাকে তুমি কীভাবে দেখো? নির্ভয়ে বলতে পারো।'

মন্ত্রী তখন মহারাজাকে বললেন– 'মহারাজ! একেকটা মানুষের জীবন একেক রকম। প্রত্যেকের ন্যায়-অন্যায় নিরূপণ করে তার কর্মফল। আর আপনি যে বিষয়টা বলেছেন, সেটা শুধু আসাম বা ভারতেই নয়; প্রাচ্যেও প্রচলন রয়েছে। আমি মনে করি, একজন রাজকীয় ব্যক্তির জীবনাচরণের সঙ্গে একজন সাধারণ মানুষের জীবনের পার্থক্য থাকবে– এটাই স্বাভাবিক। একজন মহারাজ যখন ক্ষমতার শীর্ষে থাকেন, তখন তিনি তার রাজ্য ও জনগণের জন্য কাজ করেন। এমনকি তাদের জন্য নিজের জীবনকেও বিপন্ন করেন। যুদ্ধযাত্রায় সব সময় নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। এতো দায়িত্ব, অনিশ্চয়তা আর ব্যস্ততার মাঝে একটু-আধটু নারীসঙ্গের ব্যবস্থা থাকে। তার চেয়েও বড় বিষয় এই নারীদের জন্যও সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা

www.pathagar.com

থাকে। দাসী হিসেবে অন্য কোথাও গেলে কিন্তু তাদের ভাগ্য অনেক বেশি খারাপ হতো। সব মিলিয়ে আমি এতে দোষের কিছু দেখি না।'

রাতের প্রথম প্রহর চলছিলো। মহারাজা তাঁর রেশমি বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে বলতে থাকেন– 'মদের ব্যবস্থা করা হোক।'

দারোয়ান মহারাজার পায়ে চুমুর প্রলেপ দিয়ে পরক্ষণেই কক্ষের বাইরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর দুজন সুন্দরী নারী মদের বড় বড় পেয়ালা নিয়ে মহারাজার কক্ষে প্রবেশ করে।

সারা রাত মদ ও নারীতে বিভোর থাকেন মহারাজা। ভোর হতে হতেই তার যৌনসুধা নেতিয়ে পড়ে।

একদিন জগন্নাথ মন্দিরের সারা গ্রামে মহাদেব হরিচন্দ এবং তার সঙ্গীদের খুনের ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে গ্রামবাসী শোকে-ক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিশাল শোক মিছিল নিয়ে তারা মহারাজার দরবারে পৌঁছায়।

মহারাজা তাদের সান্ত্বনা দিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা রাখেন– 'লোকসকল! এই শোকব্যথা কেবল গ্রামবাসীরই নয়; বরং এই শোকব্যথায় আমরা সকলেই আক্রান্ত। আমি জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের দিব্যি দিয়ে বলছি– বাংলার এই আগ্রাসী মুসলমানদের আমরা রক্তবন্যায় ভাসিয়ে ছাড়বো। মুসলমানরা জগন্নাথ দেবতার শক্তি-সামর্থ্য আবার উপলব্ধি করতে বাধ্য হবে। মহাদেব হরিচন্দসহ দেবতা ভগবানের আটজন পূজারি মুসলমানদের হাতে স্বর্গবাসী হয়েছেন। বাংলার বাদশা তার খুন-খারাবির মাত্রায় সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এখন ধরণির কোনো অপশক্তি আমার দুঃখ-ক্ষোভের অগ্নিশিখা নেভাতে পারবে না। আমি নীরব হয়ে আর বসে থাকতে পারি না! কিছুতেই আমি এই অস্বাভাবিক হত্যাকাণ্ড মেনে নিতে পারছি না!'

এই ঘটনার সপ্তাহ খানেক পর একদিন মহারাজা কৃষ্ণকুমার এবং তার বাহিনীর অন্য নেতাদের তলব করেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শর্মা ছাড়া অন্য কোনো নেতা সেদিন উপস্থিত হয়নি।

মহারাজা ক্ষোভে ফেটে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'সেনাপতি কৃষ্ণকুমার, বিক্রম এবং অন্য নেতারা আসেনি কেন?'

প্রধানমন্ত্রী বললেন– 'শুনেছি, রাজধানী হতে খোকন রায়ের হস্তীবাহিনী পৌঁছাতে যাচ্ছে।'

www.pathagar.com

মহারাজা চিৎকার দিলে বলে উঠলেন– 'কিন্তু আমি তো খোকন রায়কে চট্টগ্রামের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম!'

প্রধানমন্ত্রী মহারাজার পা ছুঁয়ে বললেন– 'কৃষ্ণকুমার মহারাজার সেনাবাহিনীর সেনাপতি, এছাড়া সে মহারাজার ভাতিজাও। মনে হয়, মহারাজার আদেশ অমান্যের অধিকার আছে কৃষ্ণকুমারের।'

মহারাজা ক্ষোভমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন– 'কৃষ্ণকুমারকে সেই অধিকার কে দিয়েছে?'

প্রধানমন্ত্রী রামশর্মা নীরবতা পালন করছেন।

মহারাজা গর্জন করে বলে উঠলেন– 'রামশর্মা! আমি তোমাকে উদ্দেশ করে কথা বলছি। তোমার তো ভালো করেই জানা আছে যে, আমার প্রশ্নের জবাবে কখনো নীরব থাকা যায় না! তুমি আমাদের প্রধানমন্ত্রী! জবাব দাও!'

প্রধানমন্ত্রী বললেন– 'মহারাজ! এ ব্যাপারে সেবকের নীরব থাকাই সমীচীন মনে হচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রী আনমনে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন।

এটা দেখে মহারাজা বললেন– 'একাকী।' দারোয়ান বেরিয়ে গেলো।

প্রধানমন্ত্রী বলতে শুরু করেন– 'মহারাজ! কৃষ্ণকুমার বড়ই ধূর্ত ও কুটিল বুদ্ধির যুবক। তার মন-মস্তিষ্ক মন্দ চিন্তায় ভরপুর। মনে হচ্ছে, সে বড় ধরনের কোনো ভয়ংকর খেলা দেখানোর ফন্দি আঁটছে। আমার ধারণা, সে মহারাজের চলার পথে কূপ খনন করে চলেছে। এ মুহূর্তের মহারাজের সেনাবাহিনীর বড় একটি অংশের নেতৃবৃন্দ তার মুষ্টিবদ্ধ। শুনেছি, কৃষ্ণকুমার নিলম কুমারকেও তলব করেছে। ভেতরে ভেতরে হয়তো সে বড় কোনো কূটচাল খেলে যাচ্ছে!'

'রামশর্মা! তুমি চিন্তা কোরো না! আমার বিশ্বাস– আমার ভাতিজা কৃষ্ণকুমার আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।'

প্রধানমন্ত্রী মহারাজার কক্ষ হতে বেরিয়ে তার থাকার ঘরের দিকে কম্পিত পায়ে এগিয়ে গেলেন। তার মাথায় রাজ্যের চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে তার কাঁধে হাত রাখে। জায়গাটা বেশ অন্ধকার। এছাড়া এমন অতর্কিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার কোনো কল্পনাই ছিলো না রামশর্মার মাথায়।

www.pathagar.com

ভয়ে তটস্থ হয়ে তিনি বললেন– 'কে তুমি?'

কৃষ্ণকুমার সাপের মতো ফণা তুলে গোঙিয়ে বলে– 'প্রধানমন্ত্রীজি! আমি কৃষ্ণকুমার! একটি মূল্যবান পরামর্শ দিতে চাই তোমাকে। আগামীতে নিজের সীমা অতিক্রমের অপচেষ্টা চালাবে না!'

প্রধানমন্ত্রীর কলজে ছিঁড়ে যাবার জোগাড়। হৃৎকম্পন ক্রমেই বেড়ে চলেছে তার। তিনি বললেন– 'কী বলতে চাচ্ছো তুমি?'

কৃষ্ণকুমার একদিকে মোড় দিয়ে বললো– 'এক-দুই দিন অপেক্ষা করো। সময়ই তোমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দেবে।'

কৃষ্ণকুমার অন্ধকারে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। কিন্তু তার বিষমাখা বাক্য প্রধানমন্ত্রীর মন-মস্তিষ্ককে মারাত্মক আহত করে। তার কদম আরো বেশি ভারী অনুভূত হতে থাকে। বহু কষ্টে তিনি তার থাকার কক্ষে পৌঁছে বিছানায় গা এলিয়ে দেন।

তার সহধর্মিণী গঙ্গোত্রি রানি তার পা টিপতে টিপতে জানতে চান– 'পতি দেবতা! বেশ ক'দিন ধরে আপনাকে খুব চিন্তিত ও পেরেশান মনে হচ্ছে!'

রামশর্মা তার তাঁবুর ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তুমি ঠিকই ধরতে পেরেছো। আমি খুব পেরেশান। এক রক্তপিপাসু বাঘ আমার পেছনে ধাওয়া করে যাচ্ছে। তার এবং আমার মাঝে দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে। সে আমার এতোটা নিকটে চলে এসেছে যে, আমি তার পায়ের শব্দটুকুও শুনতে পাচ্ছি!'

***

রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত তার আলিশান আমোদ উপকরণে ভরপুর সুসজ্জিত ভবনে বসে বসে আকাশের তারাদের আলোর ঝলকানি দেখে তৃষ্ণার্ত চোখকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কখনো কখনো কোনো কোনো তারা বিশাল উঁচু আকাশ থেকে ভেঙে পড়ে যায় এবং পেছনে দেখলে মনে হয় লম্বা এক আলোর কাঠি। একসময় তারাটি নিস্তব্ধ পাহাড়ের গহিন অন্ধকারে তলিয়ে যায়। এসব দেখতে দেখতে রাজকুমারী তার নিজের জীবন নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে থাকে। বাংলা হতে ফিরে আসার পর থেকেই তার এই ভাবনা। দিনের বেশির ভাগ সময় তো হাশিমের কাছে জেলখানাতেই কাটে, কিন্তু রাতের বেলায় গভীর চিন্তায় ডুবে থাকে সে। অজানা এক শঙ্কা সব সময়

www.pathagar.com

তাড়া করে ফেরে তাকে। সন্দেহ আর অবিশ্বাসের জগতেই যেন তার অহর্নিশ বিচরণ। অশ্রু বিসর্জন দিতে দিতে অনিন্দ্যসুন্দর চোখ দুটির আশপাশে কালো দাগ হয়ে যায়। অতর্কিত কী এক সংকট তাকে দোধারী চাকুর মতো তার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসকে কুচি কুচি করে কেটেই চলেছে অবিরত।

পুনম– রাজকুমারীর সেবিকা এবং বান্ধবীও। সে রাজকুমারীকে দেখে দেখে ভেতরে ভেতরেই ভেঙে বিচূর্ণ হচ্ছে। ধীরে ধীরে রাজকুমারী দুনিয়ার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, আরাম ও চাহিদাকে জলাঞ্জলি দিতে চলেছে।

পুনম অশ্রুসজল নয়নে রাজকুমারীর দিকে তাকিয়ে আছে। 'রাজকুমারী! তোমার কী হয়ে গেলো? ভগবানের দিব্যি, নিজেকে তুমি সংবরণ করো! কেন তুমি বিগড়ে যাচ্ছো? ভাঙা মনের পাষণ্ডতা তোমার সবকিছু কেন লুট করে নিচ্ছে? এভাবে তো তুমি নিজের সাথে সাথে সুদর্শন কয়েদিকেও ধ্বংস করে দেবে। যে শুধু তোমার ভালোবাসার টানে বেঁচে আছে!'

'পুনম!' রাজকুমারী হাঁটুতে মাথা রেখে ভাঙা গলায় বললো– 'তুমি কি জানো! আমাকে তার ভালোবাসা, তারই চিন্তা এবং তারই ভাবনা এ অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে! অজানা এক শঙ্কা আমার মনের অতল গভীরে বিদ্ধ হয়ে আছে। শয়নে-স্বপনে আমি ভয়ংকর এক স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমি দেখছি, ওই কালো পাহাড়ের চূড়া হতে ভয়াল এর রক্তখেকো রাক্ষস উড়ে আসে, এসেই সে হাশিমকে তার থাবায় নিয়ে বিষাক্ত নখের আঁচড়ে আঁকড়ে ধরে বহু দূর নিয়ে যায়। আমি তার পেছনে পেছনে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে যাই, কিন্তু বিশাল উঁচু পাহাড়ের ঘন ঝোপঝাড়ের আঘাতে আমি মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পড়ি। একসময় নিস্তেজ ও অসাড় হয়ে বসে থাকতে বাধ্য হই এবং নিজেকে নিজে ধ্বংস করতে থাকি। আমি যখন ভদ্রেক থেকে রওনা করেছিলাম, তখন বেশ খুশিই ছিলাম। আমার মনে হচ্ছিলো, আমি আমার ভালোবাসার মানুষকে পেয়ে গেছি। ... কিন্তু ... পুনম! এখন তুমি বলো, আমি কী করবো? মনে হচ্ছে, ভালোবাসার গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছা আমার জন্য বেশ দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে। আমি আমার জীবনের পরোয়া করি না। এখন তো আমাকে হাশিমের চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছে।

... পুনম! আমি বড় ভুল করে ফেলেছি। আমি যদি এমন স্বেচ্ছাচারী না হতাম, যদি বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগাতাম, তাহলে হাশিম আজ তার স্বাধীন আকাশে উড়ে বেড়াতে পারতো!'

www.pathagar.com

এরপর সে পুনমের কাঁধে মাথা রেখে কান্নার সুরে বললো– 'তোমাকে ভগবানের দিব্যি দিয়ে বলছি, যদি কোনো ব্যবস্থা করতে পারো, তবে করো! দেখতেই তো পাচ্ছো, সময়ের কাঁটা কীভাবে গড়িয়ে যাচ্ছে!'

পুনম রাজকুমারীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো– 'রাজকুমারী! আমার জান! সাহস নিয়ে এগিয়ে যাও! ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি সামাল দেয়া ছাড়া উপায় নেই। মহারাজার সামনে রাজকুমারীকে নত হতে হবে। চাঁদের মতো কন্যাকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন। তিনি নিশ্চয় তোমার মনের আশা পূরণ করবেন।'

'তুমি ভোলা মনে সুধারণা নিয়ে বসে আছো, পুনম!'

রাজকুমারী দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো– 'পিতা মহারাজ বর্তমানে তার ভাতিজা কৃষ্ণকুমারের দয়া-দাক্ষিণ্যের ভিখারি। আমার মন তো এটাও বলছে যে, পিতা মহারাজের রাজমুকুট ও সিংহাসন– সবকিছুই এখন হুমকির মুখে। কৃষ্ণকুমার তার ভাই অজয় কুমারের চেয়েও মারাত্মক ভয়ংকর নরপিশাচ। সুযোগ পেলেই সে মহারাজকে ছোবল মারতে কুণ্ঠিত হবে না!'

পুনমের চেহারায় গভীর উদ্বেগের ছাপ। দীর্ঘক্ষণ সে নীরব থাকে। শেষে সে বললো– 'মন মানছে না। মহারাজের ওপর হাত তোলা চাট্টিখানি কথা নয়, তুমি যা মনে করছো।'

কিছুক্ষণ থেমে রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত বললো– 'পুনম! যেভাবেই সম্ভব এখান থেকে হাশিমকে বের করে নেয়া দরকার। তার জীবন আমার কাছে গভীর সংকটের মুখে মনে হচ্ছে।'

'ঠিক আছে।' পুনম বললো– 'চেষ্টা করে দেখা যাক।'

পরের দিন রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত জেলখানায় প্রবেশ করে। জেলখানার সকল দারোয়ানকে সে নিজের সমব্যথী বানিয়ে রেখেছে। প্রতিদিন সে তাদের বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকন দিতো। এছাড়াও পূর্ব হতেই রাজকুমারীর বদান্যতা ও উদারচিত্তে দান-দক্ষিণার অভ্যাস গোটা আসামবাসীকে বেশ প্রভাবিত করে রেখেছিলো।

এক দারোয়ান হাশিমকে সংবাদ দিলো– 'সুদর্শনা রাজকুমারী আসছেন!'

হাশিম নির্জন অন্ধকার বন্দীখানার দরজায় এসে দাঁড়ায়। সে অনুভব করতে থাকে, রাজকুমারীর পা কাঁপছে। অনেক কষ্টে সে জেলখানার বারান্দায়

www.pathagar.com

পায়চারি করে যাচ্ছে। রাজকুমারীর এমন বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে হাশিমের অন্ত রাত্মা দুমড়ে-মুচড়ে ওঠে। দমবন্ধ হওয়ার অবস্থা অনুভব হয় তার। তার পায়ের নিচের মাটিও সরে যাচ্ছে মতো মনে হচ্ছে। উভয় হাত দিয়ে সে জেলখানার মোট মোটা শেকল খামচে ধরে।

'রাজকুমারী!' হাশিম চিৎকার করে বললো– 'তুমি যদি সাহস হারিয়ে ফেলো, তাহলে তো সত্যের আলো অন্ধকারের সামনে নিঃস্ব হয়ে নিভে যাবে!'

রাজকুমারী হাশিমের হাতের ওপর তার কম্পিত হাত রেখে বললো– 'হাশিম! আমি তোমার আসামি। আমাকে ক্ষমা করে দাও। ভালোবাসার পাগলামি আমাকে স্বেচ্ছাচারী করে তুলেছে। আমার জানা ছিলো না আমার এই স্বেচ্ছাচারী আচরণ তোমাকে এমন বিপদগ্রস্ত করে তুলবে। আসলে ভালোবাসা আমাকে পাগল করে রেখেছিলো...!'

হাশিম বিস্ময়ের চোখে বললো– 'তো, শেষে কী হয়েছে?'

রাজকুমারী তার আঁচল দ্বারা ভেজা নয়নযুগল মুছে বললো– 'হাশিম! বেশ ক'দিন ধরে আমি খুব ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে যাচ্ছি। আমি ভীষণ ভীত হয়ে পড়েছি!'

হাশিম রাজকুমারীর রেশমি কোমল হাতে হাত রেখে বললো– 'রাজকুমারী! জীবন স্বপ্ন আর কল্পনার নাম নয়। অধিক চিন্তা মানুষকে দুর্বল করে দেয়। আল্লাহর ওয়াস্তে এসব দুশ্চিন্তা ছেড়ে দাও। যা হবার তা-ই হবে। যখন তুফানের শক্তি বেড়ে যায়, তখন নাবিকেরা তরির হাল খোদার ওপর ছেড়ে দেয়।'

রাজকুমারী বললো– 'হাশিম! তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও।'

হাশিম ভালোবাসামিশ্রিত ক্ষোভ নিয়ে বললো– 'রাজকুমারী! আগামীতে কখনো এমন কথা চিন্তাও করবে না। আমি অকৃতজ্ঞ নই। এখান থেকে এভাবে চলে যাওয়াকে আমি পাপজ্ঞান করি।'

'তোমাকে আমার ভালোবাসার দিব্যি দিয়ে বলছি– এখান থেকে চলে যাও!' রাজকুমারী হাত জোড় করে বললো।

হাশিম তার জবাবে বললো– 'রাজকুমারী! না, আমার ভালোবাসার দিব্যি দিয়ে আগামীতে কখনো আমার আত্মমর্যাদার পরীক্ষা নেবে না!'

www.pathagar.com

'হাশিম! আমাকে বলো, এখন আমি কী করবো? আমি খুবই উদ্বেগের মধ্যে আছি।'

'রাজকুমারী! আমার দিকে তাকাও! আমার চোখের ভেতর গভীর দৃষ্টি দিয়ে আমার অস্তিত্বের নিগূঢ় রহস্য পড়তে ও বুঝতে চেষ্টা করো। আমি বেঁচে থাকবো রাজকুমারী! কারণ, আমাকে মেরে ফেলা রাজা-মহারাজার কাজ নয়!... আমি তো মরে গিয়েও বেঁচে থাকবো। যেদিন ভালোবাসা মরে যাবে, সেদিনই কেয়ামত সংঘটিত হবে। সেই দিনটি হবে এই ধরণির শেষ দিন। রাজকুমারী! এ-জাতীয় কথা তোমার মুখে মানায় না। তুমি যাও, গিয়ে বিশ্রাম নাও, বিশ্রাম নেয়া তোমার খুব দরকার। আমার জন্য মোটেও ভাববে না। আমি এখানে বেশ ভালো আছি। তোমার কাছে থেকে তোমার ভালোবাসার সুবাস অনুভব করাই আমার জন্য অনেক কিছু। আমরা পরস্পর একে অপরের জন্য বেঁচে থাকবো। তুমি তো সত্যনিষ্ঠ ও অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি। তোমার যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে অনেক বাস্তবতার আলো নিভে যাবে। গোটা পৃথিবীই তো একসময় অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিলো।'

www.pathagar.com

নয়া তুফান

রাজা প্রেমচন্দ্র যে কেল্লার হাকিম ছিলেন, সেটা প্রাকৃতিক ও অবকাঠামোগত বিবেচনায় সুবে বাংলার সর্বাধিক সুরম্য কেল্লা। সবুজাভ পাহাড়ের চূড়ায় এর অবস্থান। ডান দিকে ছোট্ট একটি নদী। নদীতে মাঝিমাল্লারা সুর ধরে গান গাইতো। বাঁ দিকে ঘন বন। সপ্তাহে দু-তিনবার বৃষ্টি হতো। এতে করে প্রকৃতিতে ধারণ করতো এক অনিন্দ্য রূপ। কেল্লার সামনে বিশাল এক মাঠ। এখানে চলতো সেনা প্রশিক্ষণ। মাঠের পরই দিগন্তবিস্তৃত ফসলের জমি। এই ফসলি জমি পেরিয়েই মহাসড়ক। সড়কটি এতোটাই প্রশস্ত যে, আটটি ঘোড়া সমানভাবে অনায়াসেই দৌড়াতে পারতো। সড়কের উভয় পাশে দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বিশাল বিশাল ফলের গাছ, যার প্রতিটি শাখা আরেকটি গাছের শাখার সাথে জড়ানো। দিনের বেলা এ পথ থাকতো ছায়াদার আর রাতের বেলা গহিন অন্ধকার। এই সড়কটির সাথেই মিলেছে ওই পথ– যেটা ভদ্রেকের ঘন বন পেরিয়ে দারুল হুকুমতের সীমান্তবর্তী এলাকায় গিয়ে পৌঁছেছে। ইদানীং নবাব আলি কুলি খান এই মহাসড়কের প্রান্ত ঘেঁষেই তার বাহিনী নিয়ে অবস্থান করছেন।

যুবক প্রেমচন্দ্র চেহারা ও চরিত্রে ছিলেন অতুলনীয়। দারুণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনি। যাবতীয় চরমপন্থা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে বহুদূর অবস্থান করতেন। প্রশস্ত কপাল, কোঁকড়ানো লম্বা চুলের পাশাপাশি দীর্ঘ কালো ভ্রু তার চেহারায় এনে দিয়েছে এক মোহনীয় ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের ছাপ। সদা হাস্যমুখী প্রেমচন্দ্র ছিলেন প্রজাদের ওপর খুবই অনুগ্রহশীল। নিজ এলাকার সকল ফরিয়াদির চাওয়া-পাওয়ার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন

www.pathagar.com

এবং আমলে নিতেন। ইনসাফ ও ন্যায়ের ব্যাপারে আপস করতেন না। এ ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র অবহেলা বা বিলম্ব সহ্য করতেন না। তিনি হিন্দু অবশ্যই ছিলেন, কিন্তু তার চিন্তাধারা যেকোনো প্রকার প্রান্তিকতা থেকে ছিলো যোজন যোজন দূরে।

বাংলার বাদশা নবাব আলি কুলি খানের প্রিয়ভাজন ছিলেন প্রেমচন্দ্র। নবাব সাহেব তাকে সন্তানের মতো জানতেন এবং স্নেহ করতেন। প্রেমচন্দ্রও ছিলেন বাদশার বিশ্বস্ত সিপাহি। প্রেমচন্দ্রের স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরী ও প্রজ্ঞাবতী। চাঁদের জোছনাকেও হার মানাতো তার কোমল শরীরের রূপ। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে ছিলো প্রেমের অটুট বন্ধন। অনুপম ভালোবাসা ও সম্প্রীতি।

বাংলার বাদশা নবাব আলি কুলি খানের সংবাদ পেয়ে প্রেমচন্দ্র তার বাহিনীর দায়িত্বশীলদের নিয়ে বসেন এবং দ্রুত প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দেন। তিনি আজম খান, রণধীর, কুমার সন্তোষ ও কামরান হায়দারকে উদ্দেশ করে বললেন– 'আমি আগামীকালই এখান থেকে রওনা হতে চাই। নবাব সাহেবের চিঠির প্রতিটি শব্দে এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে, শত্রুপক্ষের যন্ত্রণা আমাদের নবাব সাহেবকে ভীষণ ক্ষুব্ধ ও দগ্ধ করে চলেছে। তাই এ মুহূর্তে এক একটি ক্ষণ বিলম্ব করা আমাদের জন্য যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

আজম খান দাঁড়িয়ে বললো– 'আপনি চিন্তা করবেন না। ইনশাআল্লাহ সন্ধ্যার মধ্যে গোটা বাহিনী প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যাবে। আপনি চাইলে আমরা আজ রাতেই রওনা করতে পারি।'

'খুব ভালো। খুব ভালো।' প্রেমচন্দ্র উচ্ছ্বাসমাখা সহমত পোষণ করে বললেন– 'আমরা তাহলে রাতেই রওনা হয়ে যাই। পূর্ণিমার রাত। ভোর নাগাদ আমরা বহু দূর অতিক্রম করতে পারবো। তাঁবু তৈরি ও সৈনিকদের সামানা বহন করার জন্য প্রায় পাঁচশ গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে করে প্রতিটিতে দশজন সৈনিকের মালপত্র রাখা যায়। প্রত্যেক সিপাহি দোধারী ঢাল পরে নেবে। রণধীর! তোমার কী অভিমত? আজ সন্ধ্যার মধ্যেই সবকিছুর ব্যবস্থা করা যাবে তো?'

রণধীর বললো– 'একজন সিপাহির প্রস্তুতি নিতে কতোক্ষণ সময় লাগতে পারে? প্রতিটি মুহূর্তই তো আমাদের একটি পা ঘোড়ার পিঠে লাগানো থাকে। আপনি নির্দেশ দিলে এখন এই মুহূর্তেই প্রস্তুত হয়ে রওনা হতে তৈরি আছি

www.pathagar.com

আমরা।' এরপর কামরান হায়দার ও কুমার সন্তোষও একই ধরনের সিপাহিসুলভ অভিব্যক্তি প্রকাশ করলো।

রাজা প্রেমচন্দ্র দাঁড়িয়ে বললেন– 'তোমরা মাঠে গিয়ে রওনার জন্য প্রস্তুতি নাও। আমি কেল্লার ভেতর প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে আসি।'

সূর্যাস্ত হলে রাজাকে অবহিত করা হয় যে, সবাই সবকিছু ব্যবস্থা করে রেখেছে, রাতেই রওনা হবার নাকারা বাজানো হবে।

রাজা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন– 'ঠিক আছে, আমি তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসছি।' এরপর তিনি কেল্লার দরজায় পৌঁছাতেই কার যেন পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি একজন দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন– 'কে এসেছে?'

দারোয়ান বললো– 'জগন্নাথ মন্দিরের পূজারিরা এসেছেন এবং এখনই তারা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান।'

'জগন্নাথ পূজারি' শব্দটা শুনেই প্রেমচন্দ্রের মন-মস্তিষ্কে একধরনের দ্বিধা দেখা দিলো।

প্রেমচন্দ্র বললেন– 'আচ্ছা, ভালোই তো!' ঘাড় ফিরিয়েই তিনি বললেন– 'তাদের যথাযথ সম্মানের সাথে এখানে উপস্থিত করা হোক।'

প্রেমচন্দ্র তার মসনদে যথেষ্ট সম্মানের সাথে আসীন। দারোয়ান চিকচিক করা তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে। দরজা খুলতেই চার-পাঁচজন বিশ্রী কদাকার ভয়ংকর চেহারার পূজারি বিড়বিড়িয়ে কক্ষে প্রবেশ করলো। প্রেমচন্দ্র দাঁড়িয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। পূজারিদের মধ্য হতে একজন মহাপূজারি এগিয়ে এসে প্রেমচন্দ্রের হাতে চুমু খেয়ে বললো– 'আমরা বড় আনন্দিত, আপনি বসে পড়ুন।'

প্রেমচন্দ্র বসে বললেন– 'আপনারাও বসে পড়ুন।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরব পরিবেশ কাটে। প্রেমচন্দ্র ভাবছেন, কীভাবে কথা শুরু করা যায়। কিন্তু একজন পূজারি তার এই ভাবনা সহজ করে দেয়।

সে বললো– 'আমরা মাঠে হাজার হাজার সেনাবহরকে প্রস্তুতি নিতে দেখেছি। অনেকগুলো গরুর গাড়িও মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে, রাজা কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন?'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরতে পেরেছেন।' প্রেমচন্দ্র কিছুটা ক্ষোভের সুরেই বললেন– 'কমবখত আসামের রাজাকে তার মৃত্যু বাংলায় ডেকে এনেছে। মনে হয় তার হতভাগা মস্তকটি আমাদের দ্বারাই দ্বিখণ্ডিত হতে যাচ্ছে।'

পূজারিরা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর একজন পূজারি বললো– 'রাজাজি! আপনার জাতির শুভাকাঙ্ক্ষীকে খুন করবেন? আমাদের বুঝে আসছে না, হিন্দু জাতির রাজা-মহারাজাদের কী হয়ে গেলো! জানি না মুসলিম সংখ্যাগুরুরা এদের ওপর কী জাদুমন্ত্র করে রেখেছে! তারা নিজেদের ধর্মের ওপর বয়ে যাওয়ার রক্তের নদীর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।'

প্রেমচন্দ্র তার কথা কেটে বললেন– 'কোথায় অন্যায়ভাবে হিন্দুদের রক্তবন্যা বয়ে চলেছে? একটু ব্যাখ্যা দিয়ে বলুন তো!'

'রাম! রাম!' বড় পূজারি কানে হাত রেখে বললো– 'এই অজ্ঞতা এমনটি অনুভবশূন্যতা শীঘ্রই হিন্দু জাতিকে ধ্বংসের অন্ধকারে নিক্ষেপ করবে।'

প্রেমচন্দ্র বললেন– 'পূজারিবৃন্দ! আমি এমন ধরনের বানোয়াট কথা পছন্দ করি না। আপনারা যে উদ্দেশ্যে এসেছেন, সে উদ্দেশ্যের কথা অল্প শব্দে বলে ফেলুন... আমার হাতে সময় খুবই কম।'

বড় পূজারি মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের চিঠিটি প্রেমচন্দ্রের দিকে এগিয়ে দেয়। একজন প্রহরী চিঠিটি নিয়ে রাজা প্রেমের সামনের টেবিলে রাখে। প্রেমচন্দ্র খুবই আগ্রহসহকারে চিঠিটি পড়তে থাকেন। তার চেহারা বিচিত্র রঙ ধারণ করে। বিচক্ষণতা তাকে নতুন এক দিগন্তে পৌঁছে দেয়।

তিনি নরম সুরে বললেন– 'আমি মহারাজার আগ্রহের ব্যাপারে ভেবে দেখবো।'

মহাপূজারি আশাবাদী হয়ে বললো– 'আশা করি, রাজার সিদ্ধান্ত হিন্দু জাতির সহায়তাকল্পে শুভবার্তা বয়ে আনবে।'

'চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি খান্দানি হিন্দু। আমি আমার জাতির সম্মান রক্ষা করতে চাই। সুতরাং, আমার সিদ্ধান্ত হিন্দু জাতির পক্ষে হওয়াই স্বাভাবিক।'

তার কথায় আশ্বস্ত হয়ে পূজারিরা কক্ষ হতে বেরিয়ে যায়। এমন সময়ে রাজা প্রেমচন্দ্র এক দারোয়ানকে লক্ষ করে বললেন– 'সেনার সকল নেতাকে ডেকে আনা হোক।'

www.pathagar.com

দারোয়ান চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর আজম খান, কামরান হায়দার, কুমার সন্তোষসহ অন্য নেতারা রাজার কক্ষে পৌঁছে যায়। রাজার স্ত্রী চন্দ্ররানীও পৌঁছে যান। রাজা প্রেমচন্দ্র চন্দ্ররানী ও অন্য নেতাদের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের পূজারিরা মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের একটি চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান পয়গাম নিয়ে এসেছে।'

চন্দ্ররানী বিচলিত ভঙ্গিতে প্রেমচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মহারাজা কী পয়গাম পাঠিয়েছেন?'

প্রেমচন্দ্র সশব্দে অট্টহাসি দিয়ে বললেন– 'তিনি আমাদের সহায়তা কামনা করছেন!'

এরপর রাজা তার সেনা নেতাদের পূজারিদের মাধ্যমে পাঠানো মহারাজার অনুরোধের বিস্তারিত ভাষ্য উল্লেখ করার পর বললেন– 'মহারাজার অনুরোধের সুর বড়ই চিত্তাকর্ষক। আমার মতে তা লুফে নেয়া উচিত।'

চন্দ্ররানী আশ্চর্য ও ক্ষোভের ভঙ্গিতে প্রেমচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মনে হয় তোমার মাথা ঠিক নেই! জানো কি, তুমি কী বলে যাচ্ছো? তুমি সেই হাকিমের অকৃতজ্ঞ হতে চাচ্ছো, যে তোমাকে নিজ সন্তানের মতো জানে?'

প্রেমচন্দ্র চন্দ্ররানীর হাতটি তার হাতে নিয়ে বললেন– 'হাকিমের ব্যাপারে তুমি বড়ই আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছো। তার আগে আমার পরিকল্পনার গভীরতা নিয়ে একটু ভাবতে চেষ্টা করো!'

এরপর প্রেমচন্দ্র উপস্থিত নেতাদের তার পরিকল্পনার ব্যাপারে অবহিত করতে গিয়ে বললেন– 'এভাবে আমরা মহারাজা জয়ধ্বজ সিংকে বোকা বানিয়ে খুবই সহজভাবে তাকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে সক্ষম হতে পারি।'

চন্দ্ররানী মুচকি হেসে বললেন– 'প্রেমচন্দ্র! তুমি অতিরিক্ত চালাক মানুষ। আমি তোমার বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির ব্যাপারে গর্ব করি। তোমার পরিকল্পনা সব দিক দিয়েই উত্তম মনে হচ্ছে।'

প্রেমচন্দ্র বললেন– 'ধন্যবাদ। এখন পরবর্তী মিশনের ব্যাপারে শুনে রাখো, আমি কিছুক্ষণ পর জগন্নাথের পূজারিদের তলব করে আমার সদিচ্ছা ও সহযোগিতার কথা জানাবো। তখন চন্দ্ররানী আমার কক্ষে এসে আমার সাথে ঝগড়া আরম্ভ করে দেবে...।'

www.pathagar.com

অর্ধরাতের কিছুক্ষণ আগে রাজা প্রেমচন্দ্র পূজারিদের তার শয়নকক্ষে ডাকলেন। তারা এলে রাজা বললেন– 'আমি গোলামির ভারী জিঞ্জির ফেলে দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। হিন্দুধর্ম ও হিন্দু জাতির রক্ষাকল্পে আমি মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের সহায়তা করতে প্রস্তুত। এ মুহূর্তে আমি বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করলাম। আমি বিদ্রোহী!'

ঠিক এ মুহূর্তে দরজার চৌকাঠে চড়চড় শব্দে দ্রুত পায়ে চন্দ্ররানী কক্ষে প্রবেশ করলেন।

চন্দ্ররানী জিজ্ঞেস করলেন– 'কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরবে?'

রাজা প্রেমচন্দ্র বললেন– 'তুমি জানো, মুসলিম নেতারা বহু বছর ধরে হিন্দু জাতিকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে! এ মুহূর্তে মহারাজা জয়ধ্বজ সিং হিন্দু জাতির মুক্তির জন্য স্বাধীনতাযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা মহারাজাকে একাকী ছাড়তে পারি না। তার সহায়তায় আমি অবশ্যই এগিয়ে যাবো। এই পূজারিরা আমার অন্তর্চক্ষু খুলে দিয়েছে। গোলামির জিঞ্জির আমরা ছুড়ে ফেলতে চাই। কালই আমাদের বাহিনী জয়ধ্বজ সিংয়ের দিকে রওনা হবে।'

চন্দ্ররানী ক্ষোভে কেঁপে উঠে সফল অভিনেত্রীর সুরে বললেন– 'তুমি অকৃতজ্ঞতার পাপে লিপ্ত আছো। তোমার ভেতর আর কোনো মঙ্গল নেই। হাকিমে বাংলাকে আমরা পিতার মতো মান্য করি। যে আমাদের পিতার সাথে অকৃতজ্ঞ আচরণ করে, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

রাজা প্রেমচন্দ্র ক্ষোভের সুরে বললেন– 'তুমি আমার অর্ধাঙ্গিনী। তোমার-আমার সম্পর্ক কোনো চিকন সুতার মতো নয় যে, সহজেই তা ছিঁড়ে যাবে।'

চন্দ্ররানী দাঁড়িয়ে বললেন– 'তুমি গাদ্দার ও অকৃতজ্ঞ লোক! এখন তোমার সাথে আমার আর কোনো প্রকার সম্পর্ক থাকতে পারে না। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার শত্রু হিসেবে মোকাবেলা করবো।'

চন্দ্ররানী পূজারিদের ধিক্কার দিয়ে বললেন– 'তোমরা নিমকহারাম। শান্তির শত্রু তোমরা। আমি তোমাদের জীবিত ছাড়বো না। তোমরা তো মৃত্যু আর আগুনের পূজারি!'

রাজা প্রেমচন্দ্র দাঁড়িয়ে বললেন– 'কোথায় যেতে চাচ্ছো তুমি?'

চন্দ্ররানী বললেন– 'আমি এখনই সেনাদের নিয়ে হাকিম পিতার কাছে চলে যাবো। আমার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবার স্পর্ধা দেখাবে না!'

www.pathagar.com

রাজা প্রেমচন্দ্র ক্রোধে ফেটে পড়ে বললেন– 'তুমি যেতে চাচ্ছো, চলে যাও। এতে আমার কোনো পরোয়া নেই। ভগবানের কৃপায় আমার মনে যে শুভবোধ জাগ্রত হয়েছে, এ পথ ছেড়ে আমি তোমার পেছনে পড়তে পারি না।'

চন্দ্ররানী কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলে একজন পূজারি বললো– 'চন্দ্ররানীকে ভুলে যাও, মন খারাপ করবে না। এমন অকৃতজ্ঞ আর চামার শ্রেণির নারী তোমার উপযুক্ত হতে পারে না। আমার মনে হয়, ভেতরে ভেতরে সে মুসলমান হয়ে গেছে!'

প্রেমচন্দ্র বললেন– 'থাক এসব কথা। এখন যা হবার তা-ই হবে। এখন সবকিছু ভুলে আমি নিজ ধর্মের সেবা করতে চাই। ভগবান সহায় হলে চন্দ্রের প্রতিটি কটু বাক্যের পাই পাই করে হিসাব নিয়ে ছাড়বো। সে হুজুর নবাব সাহেবের বড়ই কৃপাধন্য। এ কারণে সে বড় বড় কথা আওড়াচ্ছে।'

বড় পূজারি বললো– 'রাজা! তোমার মুখ থেকে হিন্দু জাতির দুশমন বাংলার হাকিমের জন্য 'হুজুর' শব্দটি মানাচ্ছে না।'

'তুমি ঠিকই বলেছো।' প্রেমচন্দ্র বললেন– 'আমার মন থেকে এতো সহজেই যে তার নাম মুছছে না! ভেবে দেখেছো কি ধর্মের খাতিরে এ আমার কী পরিমাণ ত্যাগ?'

সন্ধ্যা হতেই প্রেমচন্দ্রের বাহিনী নদীর কিনারা ঘেঁষে যাত্রা আরম্ভ করে। ওদিকে আজম খান প্রায় দশ হাজার মুসলমানের সেনাবহর নিয়ে সামনে এগিয়ে চলেছে। প্রেমচন্দ্রের বহরে ছিলো প্রায় পনেরো-বিশ হাজার মুসলমান। এরা এমন মুসলিম যুবক– যাদের দাড়ি ছিলো না। এদের মধ্যে কামরান হায়দারও রয়েছে। যাকে অশ্বচালনার ক্ষেত্রে গুরু হিসেবে মান্য করা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে সে উভয় হাত দিয়ে তরবারি দ্বারা এতো দ্রুত শত্রুব্যূহকে তছনছ করে ছাড়ে যে, নিমিষেই শত্রুপক্ষ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

প্রেমচন্দ্র তার নিকটে এসে বললেন– 'কামরান! আজ থেকে তোমার নাম হবে 'কিরণ'। ব্যাপারটি তোমার সিপাহিদের জানিয়ে রাখবে।'

'খুব ভালো।' কামরান হায়দার বললো– 'নিশ্চিন্ত থাকুন। আসাম বাহিনীকে ভালো করেই বোকা বানানো যাবে!'

তৃতীয় দিনের মাথায় এ বাহিনী গোহাটি গিয়ে পৌছায়।

www.pathagar.com

প্রেমচন্দ্র পূজারিদের বললেন– 'তোমরা কিছু সময় বিশ্রাম নাও, আমি গোহাটির কেল্লাদার ফিরোজ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসছি।'

'কিন্তু কেন? এর আবার কী প্রয়োজন?'

'আছে, প্রয়োজন আছে।' প্রেমচন্দ্র বললেন– 'ফিরোজের বাহিনীতে প্রায় ত্রিশ হাজার হিন্দু সেনা আছে। তাদের অনেকেই আমার খুব আস্থাভাজন। সম্ভব হলে আমি তাদের সাথে কথা বলবো। এতে করে তারা আমার সাথে যোগ দিতে পারে।'

পূজারিরা খুশি হয়ে বললো– 'ভগবান রাজাকে জনম জনম সুখে রাখুন।'

প্রেমচন্দ্র কামরানকে উদ্দেশ করে বললেন– 'কিরণ! তুমি দশজন অশ্বারোহী নিয়ে আমাকে সঙ্গ দাও। দ্রুত আমরা ফিরতে চাই।'

গোহাটি ও নাদের খানের বসতি অতিক্রম করে প্রেমচন্দ্রের বাহিনী দিনের শেষান্তে জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের নিকটে গিয়ে পৌঁছায়। পূজারিরা অগ্রসর হয়ে কৃষ্ণকুমার ও মহারাজা জয়ধ্বজ সিংকে তাদের আগমনের ব্যাপারে অবহিত করলে মহারাজা এতে ভীষণ খুশি হন এবং নিজে খোদ এসে প্রেমচন্দ্রকে অভ্যর্থনা জানান।

খুব আহ্লাদের সাথে তিনি প্রেমচন্দ্রের সাথে কোলাকুলি করেন, তার কপালে চুমুর প্রলেপ এঁকে দিয়ে বলেন– 'যুবক! তোমার আগমনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। মনে হচ্ছে, আমরা গোটা বাংলা জয় করে ফেলেছি।'

প্রেমচন্দ্র মহারাজার ডান হাত তার হাতে নিয়ে বললেন– 'এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের বিদ্রোহে হাকিমে বাংলার কোমর ভেঙে গেছে।'

মহারাজা খুবই মূল্যবান একটি মুক্তার মালা প্রেমচন্দ্রের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন– 'আজ থেকে তুমি আমার সন্তান।'

প্রেমচন্দ্র অবাক দৃষ্টিতে মহারাজার দিকে তাকালেন। মহারাজার চেহারায় মন্দ চাহনির পরিবর্তে সত্য ভালোবাসার ছাপ দেখা যাচ্ছে। সুন্দর একটি জায়গায় প্রেমচন্দ্রের জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। জগন্নাথ মন্দিরের খুব কাছেই তার তাঁবু। কৃষ্ণকুমার প্রেমচন্দ্রকে তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। রাত হলে সে বলে– 'রাজাজি! আপনি বড়ই সৌভাগ্যবান। আমাদের রাজা আপনাকে সন্তানের মর্যাদা দিয়েছেন।'

প্রেমচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন– 'আমরা তার প্রতি অনুগত।'

www.pathagar.com

কৃষ্ণকুমার বললো– 'আপনি বিশ্রাম নিন। রাতে আবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।'

রাতে তারারা আকাশে ঝিকিমিকি করতে থাকে। মন্দিরের পূজারিরা প্রেমচন্দ্রের তাঁবুতে আসে। তাদের পেছনে পেছনে তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করে দুজন অনিন্দ্যসুন্দরী ললনা। উভয় ললনাকে সাজানো হয়েছে রাজকুমারীর পোশাকে। তাদের গলায় মনোহর মুক্তার মালা। শ্বেতশুভ্র অঙ্গের পরতে পরতে তাদের যৌবনের সম্মোহনী তাপ।

পূজারিরা ললনাদের উদ্দেশ করে বললো– 'রাজাজির কদমে চুমু খাও। রাতভর তার সেবাযত্ন করে তাকে সন্তুষ্ট রাখবে।'

প্রেমচন্দ্র বিস্মিত ভঙ্গিতে একবার পূজারির দিকে তাকান, আরেকবার রূপসী সুন্দরী ললনাদের দিকে। এমন সময়ে আরেকজন পূজারি তাঁবুতে প্রবেশ করে। তার হাতে ছিলো মদের পেয়ালা। সে এগুলো তাঁবুর এক কোণে রেখে এসে বলে– 'রাজাজি! এটা এমন শরাব– যা আপনি কখনো পান করেননি। বিশেষ দেব-দেবীদের জন্য এগুলো বিশেষভাবে তৈরি করা হয়।'

প্রেমচন্দ্র বললেন– 'ঠিক আছে, তোমরা যেতে পারো।'

যেতে যেতে এক পূজারি বললো– 'আপনার বাহিনীর জন্য শান্তি, তৃপ্তি ও শারীরিক তৃষ্ণা মেটানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মেয়েস্বল্পতার কারণে আপনার বিশ বিশজন সিপাহির জন্য একজন করে মেয়ে জোগাড় করা গেছে। কাল-পরশুর মধ্যেই এই স্বল্পতা দূর করা হবে।'

প্রেমচন্দ্র তির্যক দৃষ্টিতে পূজারিদের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'কোনো অসুবিধা নেই, তোমরা যেতে পারো।'

পূজারিরা তাঁবু হতে বেরিয়ে গেলো।

প্রেমচন্দ্র দীর্ঘক্ষণ ধরে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন। মেয়ে দুটো আশ্চর্য ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখজুড়ে বিস্ময়ের ছাপ।

অনেকক্ষণ পর এক মেয়ে মদের পেয়ালা হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে বললো– 'সুন্দর রাজাজি! এদিকে একটু দৃষ্টি দিন!'

প্রেমচন্দ্র উঠে বসেন। এরপর স্নেহভরা দৃষ্টিতে মেয়ে দুটোর দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তোমরা দাঁড়িয়ে আছো কেন? বসে যাও!'

www.pathagar.com

'আমরা তো বসার জন্য আসিনি, অন্নদাতা!'

প্রেমচন্দ্র বললেন– 'আমার জানা আছে, কিন্তু এটা আমার নির্দেশ। বসো!'

মেয়েরা রেশমের গালিচায় বসে পড়লো।

প্রেমচন্দ্র বললেন– 'মদের পাত্রটি ফেলে দাও।'

এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন– 'তোমরা কোথা হতে এসেছো?'

'আমরা জগন্নাথ দেবতার দাসী... ।'

'আমি বলতে চাচ্ছি, তোমাদের বাড়ি কোথায়?'

প্রেমচন্দ্র জানতে চাইলে একজন দাসী বললো– 'আমি মাথুরার অধিবাসী। এখানে পূজারিদের সেবার জন্য অবস্থান করছি।'

'আর তুমি?'

'আমি অযোধ্যার অধিবাসী।'

'তুমিও পূজারিদের সেবা করে থাকো?'

'জি, সরকার!'

'তোমরা কোন ধরনের সেবা করে থাকো?'

উভয়ে লজ্জায় মাথা নিচু করে রাখে।

প্রেমচন্দ্র শীতল কণ্ঠে বললেন– 'তোমাদের কি এ ব্যাপারে কোনো অনুভূতি আছে যে, তোমরা জঘন্য পাপ কাজ করে যাচ্ছো?'

মেয়ে দুটো একই সময়ে প্রেমচন্দ্রের দিকে তাকালো। উভয়ের চোখে অশ্রু সাঁতার কাটছে।

একজন বিগলিত সুরে বললো– 'অনুভূতি তো আছে, কিন্তু ধর্মে তো এগুলো বৈধ।'

প্রেমচন্দ্র জানতে চাইলেন– 'তোমাদের কে বললো– এসব পাপাচার ধর্মে বৈধ?'

এক মেয়ে জবাব দিলো– 'পূজারি আমাদের বলেছেন।'

প্রেমচন্দ্র বললেন– 'মাতা, পিতা, ভাইবোন আছে কি তোমাদের?'

'আছে।' এক মেয়ে বললো– 'কিন্তু এখন তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।'

প্রেমচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন– 'কেন?'

'সম্ভবত আমরা দেবী বনে গেছি, তাই!'

'তোমাদের মন কি এটা চায় যে, তোমাদের পিতা হয়ে কেউ কেউ তোমাদের আদর করুক, ভাই হয়ে কেউ তোমাদের সম্মান বাড়াক!'

www.pathagar.com

মেয়ে দুটো ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। বেশ কিছুক্ষণ নীরব, নিস্তব্ধ হয়ে ওঠে পরিবেশ।

প্রেমচন্দ্র বললেন– 'পূজারিরা তোমাদের আমার কাছে কেন এনেছে?'

'যখন মহারাজা জয়ধ্বজ সিং এখানে এসেছেন, তখন থেকে মন্দিরের সেবাদাসী ও গ্রামের অন্য সুন্দরী মেয়েদের প্রতি রাতে তাদের শয্যাসঙ্গী হতে হয়েছে।'

রাজা বললেন– 'এতে কি তোমরা খুশি?'

মেয়েরা অবাক হয়ে বললো– 'নারাজ হবেন না, রাজাজি! কোনো মেয়ে তার স্বামী দেবতা ছাড়া অন্য কারও শয্যাসঙ্গী হতে চায় না কখনো। হলেও সেটা হয় জোরপূর্বক, স্বেচ্ছায় নয়। আমরা তো দৃষ্টিনন্দন ফুলের মতো, যতোক্ষণ তাজা ততোক্ষণ ভ্রমরের মুহুর্মুহু আনাগোনা, গুঞ্জরন। যৌবনে ভাটা পড়লেই ছুড়ে ফেলা হয় আমাদের।'

এ কথা শুনে প্রেমচন্দ্রের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। তিনি দাঁড়িয়ে মেয়েদের বুকে নিয়ে বললেন– 'আমি তোমাদের ভাই। যতোক্ষণ আমি আছি, ততোক্ষণ কোনো নরপশু তোমাদের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকাতে পারবে না।'

মেয়েরা কান্নায় চিৎকার করে বলে ওঠে– 'আপনি আমাদের ভাই!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তোমাদের ভাই। আমি তোমাদের মর্যাদা রক্ষা করবো। তোমরা নিশ্চিন্তে এখানে শুয়ে পড়ো। আমি অন্যদিকে যাচ্ছি।'

'না, ভাই!' মেয়েরা প্রেমচন্দ্রের হাত ধরে বললো– 'আমরা আপনার ছায়াতলে শোবো।'

'আচ্ছা, তাহলে শুয়ে পড়ো! আমি জেগে আছি।'

এক মেয়ে বললো– 'ভাইয়া! আপনি শুয়ে পড়ুন, আমরা জেগে থাকবো। যেভাবে ক্লান্ত অবসন্ন ভাইকে তার বোন স্নেহ-মমতায় ঘুম পাড়ায়, আমরা ওভাবেই মহব্বতের সাথে মিষ্টিমধুর গীত গাইতে গাইতে আপনাকে ঘুম পাড়াবো। আপনাকে শান্তির ঘুমে দেখে আমরা বেশ তৃপ্তি পাবো।'

প্রেমচন্দ্র শুয়ে পড়লেন। এক মেয়ে তার মাথার চুলে আঙুল ঘোরানো শুরু করেছে। আরেকজন তার সুরেলা কণ্ঠে 'আয় ঘুম আয়' জাতীয় গীত গেয়ে চলেছে। তিনজনের চোখ বেয়েই নীরবে বর্ষিত হচ্ছে শ্রাবণধারা।

www.pathagar.com

প্রেমচন্দ্র ঠোঁটের নিচে বিড়বিড় করে বললেন– 'ভগবান! তোমার নাম নিয়ে ওই পাষণ্ডরা কতোদিন ধরে এই নিষ্পাপদের হৃদয় রক্তাক্ত করে চলেছে!' এরপর হঠাৎ কী মনে করে প্রেমচন্দ্র বিড়বিড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন– 'নিষ্পাপ বোনেরা! তোমরা বিশ্রাম নাও, আমিও আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছেন, ভাইয়া! আমাদের ভীষণ ভয় হচ্ছে।'

প্রেমচন্দ্র বললেন– 'কিসের ভয়!'

এক মেয়ে বললো– 'মনে হচ্ছে, আপনি এই ধরিত্রীর কেউ নন। আকাশ থেকে কোনো দেবতা অবতাররূপে আপনাকে পাঠিয়েছেন। ভয় হচ্ছে, আমরা আপনাকে হারিয়ে ফেলি কি না!'

প্রেমচন্দ্র উভয় মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'আমি তোমাদের বোন বানিয়েছি। আমি সর্বত্র সর্বাবস্থায় আমার বোনের ইজ্জত, সম্মান রক্ষা করার প্রাণান্ত চেষ্টা করে থাকি। তোমরা নির্ভয়ে শুয়ে পড়ো। এখন জগতের কোনো শক্তি আমাদের একজনকে অন্যজন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।'

'কিন্তু এ মুহূর্তে আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

এক মেয়ে জানতে চাইলে রাজা প্রেমচন্দ্র বললেন– 'আমি আমাদের বাহিনীর দিকে যাচ্ছি। ওখানে ওই পাপিষ্ঠরা তোমাদের মতো অসংখ্য বালিকা পাঠিয়েছে। আমি চাই, কোনো মেয়ের সাথেই যেন আপত্তিজনক আচরণ করা না হয়।'

'ও'... উভয় মেয়ে একই সাথে বলে উঠলো– 'যান, দেরি করবেন না!'

'না, এমন চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমাদের সৈনিকেরা এতো নিকৃষ্ট ও হীন চরিত্রের অধিকারী নয়; তার পরও তারা তো মানুষ। হতে পারে ... কোনো ভুল তারা করে ফেলতে পারে।'

প্রেমচন্দ্র বাইরে বেরিয়ে গেলে উভয় মেয়ে একে অন্যের গলা জড়িয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। তাদের কান্নার শব্দ প্রহরীদের কান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছালে তারা দৌড়ে তাঁবুর অভ্যন্তরে চলে আসে।

এক প্রহরী মৃদুস্বরে বললো– 'তোমরা এভাবে কাঁদছো কেন?'

মেয়ে দুটো অবাক হয়ে প্রহরীদের দিকে তাকালো এবং সাথে সাথে কান্না বন্ধ করে দিলো।

www.pathagar.com

প্রহরী বললো- 'বলো না, কেন কাঁদছিলে?'

এক মেয়ে বললো- 'কিছুই হয়নি, আমরা আনন্দের আতিশয্যে কাঁদছিলাম।'

'কিন্তু কেন?' প্রহরী বললো।

'সম্ভবত আজই প্রথম নিজ ইচ্ছে আর মর্জিমতো কান্নার এবং হাসার সুযোগ পেয়েছি।'

প্রহরী বললো- 'ঠিক আছে। মন ভরে কেঁদে নাও। ভগবানের মর্জি হলে তোমরা জীবনভর সদা প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো হাসতে পারবে।'

মেয়েরা তার দিকে তাকিয়ে বললো- 'তোমাদের রাজা আকাশ থেকে নেমে আসা দেবতা, না!'

প্রহরী মুচকি হেসে বাইরে বেরিয়ে গেলো।

প্রেমচন্দ্র সন্তোষ ও কামরান হায়দারকে ডেকে বললেন- 'প্রিয় বন্ধুরা! যেসব মেয়েকে সৈনিকদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হয়েছে, ভাইয়ের মতো তাদের ইজ্জত-আব্রুর হেফাজত করবে। কোনো মেয়েকে ফিরে যেতে দেবে না। বুঝছো তো তোমরা? আমি বলতে চাচ্ছি, ভাই-বোনের সম্পর্ক যেন অটুট থাকে। এখন যাদের আমরা বোন হিসেবে মেনে নিয়েছি, কাল তারা কোনো হিংস্র নরপিশাচের নখর থাবায় ক্ষতবিক্ষত হতে পারে না।'

প্রেমচন্দ্র ভারী ভারী পায়ে কান্নাভেজা চোখ ও ব্যথাভরা বুকে তাঁবুর দিয়ে এগিয়ে আসতে থাকেন। তার ডানে-বাঁয়ে এবং পেছনে সশস্ত্র সিপাহি। প্রেমচন্দ্র রণধীর ও কামরান হায়দারকে বিদায় জানানোর সময় বললেন- 'মেয়েদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবে।'

কামরান হায়দার বললো- 'রাজাজি! আপনার সিপাহিদের ওপর আস্থা ও ভরসা রাখুন।'

প্রেমচন্দ্র বললেন- 'বারবার আমার এ কথা উল্লেখ করা কোনো কুধারণা পোষণ করা নয়; বরং তোমরা তো জানো, আমরা সবাই মানুষ। মানুষের মাঝে বহু ধরনের মানবিক দুর্বলতা থাকে। অনেকেই এতে আক্রান্ত হয়ে যেতে পারে- এ কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

'চিন্তা করবেন না, জনাব! আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখবো।'

প্রেমচন্দ্র নিজ তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। মেয়েরা এখনো কেঁদে চলেছে।

www.pathagar.com

'এটা কী?'

'কিছু না, ভাইয়া!' উভয় মেয়ে সমস্বরে দাঁড়িয়ে রাজা প্রেমচন্দ্রকে অভ্যর্থনা জানালো।

প্রেমচন্দ্র মায়াভরা কণ্ঠে বললেন– 'আমি তোমাদের এভাবে কান্না করার মানে বুঝতে অক্ষম।'

তিনি উভয়কে তার বাহুতে আগলে ধরলেন। মেয়েরা তার বুকে মাথা রেখে দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা গভীর নিদ্রায় হারিয়ে গেলো। কোনো মুসাফির যেমন দীর্ঘ সফর শেষে ক্লান্তির নিদ্রায় বিভোর আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনই এরা বহু দিন পর এমন প্রশান্তির নিদ্রায় গা এলিয়ে দেয়।

***

রাতের প্রথম প্রহর চলছে। আসাম বাহিনীর সেনাপতি কৃষ্ণকুমার এখনো জেগে আছে। তাঁবুর বাইরে লম্বা লম্বা বর্শাধারী সৈনিকেরা পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। তার তাঁবুটি ছিলো বিশাল আকারের, বেশ প্রশস্তও। রঙিন মখমলের মাদুর বিছানো। সোনা দিয়ে মোড়ানো তার রাজকীয় আসন। সুগন্ধি আগরের ধোঁয়া সর্বত্র। কৃষ্ণকুমার আজ রাতে খুবই সতর্কতা বজায় রেখে চলেছে। অভ্যাসের বিপরীতে আজ সে খুব কম পরিমাণ মদ পান করেছে। এ মুহূর্তে তার আলিঙ্গনে রয়েছে তিনজন অর্ধনগ্ন নর্তকী। তিনজনই মদ্যপ। নেশায় টালমাটাল। শরীর থেকে এদের একে একে সব পোশাক খসে যেতে থাকে। একজন খয়েরি রঙের মদ পান করেই চলেছে সোনার পেয়ালায়। আরেকজন বেহালা বাজিয়ে চলেছে মৃদু তালে। আর তালে তালে গেয়ে চলেছে যৌন উদ্দীপনামূলক অশ্লীল গান। তৃতীয়জন– যে সবার চেয়ে সুন্দরী– সে কৃষ্ণকুমারের কোলে বসে আছে। তার গোলাপি রঙের শরীর হতে টপটপ করে ঝরছে যৌনসুধা। নেশাসক্ত চোখ বেয়ে ঝরছে তার যৌন লালসার আভা। উদ্ধত বুকজোড়া ধকধক করে সে সেনাপতিকে প্রবলভাবে যৌনতায় তাড়িত করে তুলছে। যৌবনের শিখাগুলো সামলে রাখা যেন তার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। তার ভেঙে পড়া দেহে যৌনপিপাসা ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে। কৃষ্ণকুমার কখনো তার ওষ্ঠাধর নিয়ে খেলছে, আবার কখনো অবাধ্য হাতটি চলে যাচ্ছে সুশ্রী নর্তকীর বুকে। এর চেয়ে আগ বাড়ানো সে সমীচীন মনে করছে না। মন-মস্তিষ্কে তার এক অন্য মিশনের চিন্তা।

www.pathagar.com

হঠাৎ এক সশস্ত্র সৈনিক তাঁবুতে প্রবেশ করলো। কৃষ্ণ প্রত্যাশার চাহনিতে তার দিকে তাকালে সৈনিক বললো– 'সেনাপতি কৃষ্ণকুমারজি! নমস্কার!'

'নমস্কার!' কৃষ্ণকুমার বললো। এরপর সে জানতে চাইলো– 'কী সংবাদ নিয়ে এসেছো?'

'বড়ই শুভ সংবাদ, অন্নদাতা!'

কৃষ্ণকুমার ঝেড়েঝুড়ে বসে পড়লো। কোলে বসে থাকা নর্তকীসহ অন্য মেয়েদের বললো– 'কিছুক্ষণের জন্য তোমরা আমাকে একাকী থাকতে দাও।' মেয়েগুলো বাইরে চলে গেলো।

কৃষ্ণকুমার সৈনিককে জিজ্ঞেস করলো– 'শোনাও, কী সংবাদ!'

সৈনিক বললো– 'নিলম কুমার আজ ভোর নাগাদ এখানে এসে পৌঁছে যাবেন।'

কৃষ্ণকুমার বললো– 'তার সঙ্গে কী পরিমাণ সৈন্য আছে?'

সৈনিক বললো– 'আনুমানিক বিশ হাজার তো হবেই।'

'ঠিক আছে।' কৃষ্ণকুমার বললো– 'বলরাজকে ডাকো।'

কিছুক্ষণ পর বলির মতো বিশাল আকৃতির ভয়াল চেহারাবিশিষ্ট এক ব্যক্তি কৃষ্ণকুমারের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'কী নির্দেশ, অন্নদাতা?'

কৃষ্ণকুমার মৃদুস্বরে বললো– 'বলরাজ! আমি তোমার মনোবাসনা পূরণ করে দেবো।'

বলরাজ নুয়ে পড়ে সেনাপতির পায়ে চুমু খেতে খেতে বললো– 'আপনি নির্দেশ দিন, সরকার! আপনার দয়ায় আমি আগেও অনেক কিছু পেয়েছি।'

কৃষ্ণকুমার মৃদু শব্দে বললো– 'আজ রাতে যখনই প্রধানমন্ত্রীর ছেলে নিলম তার বহর নিয়ে এখানে প্রবেশ করবে, তখনই তুমি প্রধানমন্ত্রী এবং তার পত্নী– উভয়কে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দেবে। এ কাজ তোমাকে খুবই সতর্কতার সাথে করতে হবে। এখনই তুমি তোমার আস্থাভাজন সৈনিক দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর তাঁবু ঘিরে রাখো। নিলম কুমার ভোর নাগাদ এখানে পৌঁছে যাবে।'

'ভাববেন না, সরকার!' বলরাজ মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– 'বলরাজ তার পেছনে পায়ের ছাপ রেখে যেতে অভ্যস্ত নয়!'

www.pathagar.com

কৃষ্ণকুমার বললো– 'আচ্ছা, এখন তুমি চলে যাও। আর এখনই প্রধানমন্ত্রীর তাঁবু নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নাও। যখনই অশ্বারোহী ও সেনাবহরের বাদ্যবাদকদের শব্দ শুনতে পাবে, তখনই তোমার কাজ আরম্ভ করে দেবে।'

পাষণ্ড বলরাজ কৃষ্ণকুমারের খায়েশ পূরণে তারই মতো আরো চারজন সৈনিককে তার সঙ্গী করে নেয়। অতঃপর এই পাঁচজন মিলে সোজা প্রধানমন্ত্রীর অবস্থানস্থলে পৌঁছে যায়।

বলরাজ প্রহরীদের বললো– 'এখন তোমরা বিশ্রামে যাও। ভোর পর্যন্ত আমরা প্রধানমন্ত্রীজির পাহারা দেবো।'

'কিন্তু... প্রধানমন্ত্রীজি তো আমাদের ভোর পর্যন্ত পাহারা দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন!'

বলরাজ দম্ভসুরে বললো– 'আমরা সেনাপতিজির নির্দেশে এসেছি। তোমাদের জানা থাকার কথা যে, সেনাদের ওপর কেবল সেনাপতির কর্তৃত্বই চলে।'

'ঠিক আছে' বলে ওরা চলে গেলো।

বলরাজ তার সঙ্গীদের প্রধানমন্ত্রীর তাঁবুর চারপাশে দাঁড় করিয়ে দেয়। চারজনকেই সে তার পরিকল্পনার ব্যাপারে বিস্তারিত ধারণা দিয়ে রাখে।

প্রধানমন্ত্রী রাম দাশের ঘুম আসছে না। ভীষণ দুশ্চিন্তা ঘিরে রেখেছে তাকে। উদ্বিগ্নতায় ছেয়ে আছে তার দেহমন। বারবার তিনি বিছানার এদিক-ওদিক ফিরে চলেছেন। কখনো কখনো বিছানা থেকে উঠে তাঁবুর এখানে-ওখানে ঘুরছেন আনমনে। তার পত্নী গঙ্গোত্রি দেবী– যিনি মহারাজার বোন– তিনি নিজ স্বামীকে এমন উদ্বিগ্নতা আর অস্থিরতা দেখে উঠে বসলেন। স্বামীর হাত ধরে বললেন– 'পতি দেবতা! কী ব্যাপার? আপনি ঘুমাচ্ছেন না কেন?'

রামশর্মা তার পত্নীর হাত ধরে বললেন– 'গঙ্গোত্রি দেবী! আমার মন ভীষণ বিচলিত। মনে হচ্ছে, আজকের রাতটি বেজায় ভারী আর ভয়াল! সময় বয়ে যাচ্ছে... শোনো! আমার যদি কিছু হয়ে যায়, তবে আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে কৃষ্ণকুমার।'

'কৃষ্ণকুমার!' গঙ্গোত্রি দেবী বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করলেন– 'কিন্তু এ ব্যাপারে আপনি মহারাজাকে অবহিত করেননি কেন?'

রামশর্মা বললেন– 'তোমার ভাই দূরদর্শী নন, তিনি মানুষের ভেদ বোঝেন না। আমি তাকে সবকিছু বলেছিলাম কিন্তু তিনি এখনো পর্যন্ত আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। যেখানে কৃষ্ণকুমার মহারাজাকে খুন করে রাজসিংহাসন দখল করতে মরিয়া!'

www.pathagar.com

গঙ্গোত্রি দেবী বললেন– 'ভাইয়ার জীবন ভীতির মুখে!'

রামশর্মা বললেন– 'তিনি চতুর্মুখী বিপদের সম্মুখীন।

ইশ্ ... মহারাজা যদি আমার কথা বিশ্বাস করতেন! ভালো, ভগবান যেন মঙ্গল করেন।

'শোনো! নিলম কুমার আসছে। আমার পর এই পাষাণ হিংস্র নরপিশাচ তাকে শিকার করতে চাইবে। যেভাবেই সম্ভব, তাকে নিয়ে এখান থেকে বহু দূর চলে যাবে। তার জীবনও ভীষণ বিপদের মুখোমুখি। কে জানে, ওই হায়েনা কোন কুমতলবে তাকে এখানে নিয়ে আসছে!'

গঙ্গোত্রি দেবী কাঁদছেন। তার কান্না দেখে রামশর্মা বললেন– 'ধৈর্য দ্বারা সবকিছুর মোকাবেলা করবে।'

গঙ্গোত্রি দেবী বললেন– 'পতি মহারাজ! ভগবান না করুন, যদি আপনার কিছু হয়ে যায়, তাহলে আমি বাঁচবো না।'

'আমি আত্মাহুতি দিয়ে জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেবো। ...আপনি শুয়ে পড়ুন। সকালে আমি নিজে মহারাজার সাথে এসব ব্যাপারে আলোচনা করবো।'

'সকাল...!' রামশর্মা বিড়বিড় করে বললেন– 'কে জানে আজকের রাতের শেষে সকালের আলো দেখা কার ভাগ্যে জোটে!'

কোথাও কোথাও হতে নেশাগ্রস্ত আসাম সেনাদের অট্টহাসি এবং কুমারী মেয়েদের চিৎকারধ্বনিতে নিস্তব্ধ রাতের আকাশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দূর থেকে সানাই এবং অশ্বারোহীদের টগবগ শব্দ কানে ভেসে আসে। ... এটা নিলম কুমারের বাহিনীর সানাইয়ের ধ্বনি। ক্ষণে ক্ষণে এই ধ্বনি কাছে আসতে থাকে।

তাঁবুর পেছন দিককার পর্দা তুলে বলরাজ রামশর্মার তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করে।

প্রধানমন্ত্রী রামশর্মা ও তার পত্নী গঙ্গোত্রি দেবী ভয়ে তার দিকে তাকালেন।

প্রধানমন্ত্রী বললেন– 'কে তুমি? অনুমতি ছাড়া তাঁবুর ভেতর কেন প্রবেশ করেছো?'

বলরাজ চাপা হাসিতে বললো– 'প্রধানমন্ত্রীজি! সেবক তো আনন্দের বার্তা নিয়ে এসেছি। আর আপনি মুখ ভার করে আছেন?'

www.pathagar.com

'কী বার্তা?'

'আপনার একমাত্র পুত্র নিলম কুমার এসে পৌঁছেছে। এই সানাই আর বেহালার সুর নিলমের বহর হতে আসছে।'

রামশর্মা ক্ষোভমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন– 'আমি শুনছি, তুমি যাও!'

রামশর্মা আবারও বললেন– 'তুমি চলে যাও!'

বলরাজ অতর্কিত তার খঞ্জরটি বের করে তীব্রভাবে আঘাত করে বসে রামশর্মার বুকে। বাঁ হাত দিয়ে সে প্রধানমন্ত্রীর মুখ বন্ধ করে রেখেছে। গঙ্গোত্রি দেবী তরবারির দিকে হাত বাড়াচ্ছিলেন। বলরাজ রামশর্মাকে ছেড়ে গঙ্গোত্রীকে আক্রমণ করলো। প্রধানমন্ত্রীর লাশ শীতল হয়ে আসে। বলরাজ গঙ্গোত্রীকে ফেলে দিয়ে তার গলায় খঞ্জর দিয়ে আঘাত করে। এতে রক্তের ফোয়ারা খুনির জামায় পড়তে থাকে। তিনি মৃত্যুযন্ত্রণায় গোঙাচ্ছেন আর পাষাণ খুনি তার শাড়ি দিয়ে খঞ্জরের রক্ত পরিষ্কার করে যাচ্ছে।

নিলম কুমার প্রায় বিশ হাজার সৈনিকের বিশাল বহর নিয়ে পৌঁছেছে। তার সাথে অনেকগুলো গরুর গাড়ি, যেগুলোতে সৈনিকদের সাজসরঞ্জাম ছাড়াও অনেক দামি দামি উপহারসামগ্রী ছিলো। এখনো ভোর হয়নি। কৃষ্ণকুমারের কাছে প্রধানমন্ত্রী ও তার পত্নীর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছে যায়। পরিকল্পনামাফিক সে এগিয়ে এসে নিলম কুমারকে স্বাগত জানায়। উভয়ে ঘোড়া থেকে নেমে একে অন্যের সাথে কোলাকুলি করে। পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। কৃষ্ণকুমার ওখানে দাঁড়িয়েই রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের ব্যাপারে জানতে চায়।

নিলম কুমার বললো– 'রাজকুমারীকে মহারাজের নির্দেশে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি মনে করি, তার সাথে অতিরিক্ত করা হচ্ছে। সে নির্দোষ।'

কৃষ্ণকুমার নিলম কুমারের হাত ধরে তার তাঁবুর দিকে নিয়ে যেতে যেতে প্রতাপকে বললো– 'প্রতাপজি! নিলম কুমারের বাহিনীকে ওই মাঠে অবস্থান করতে বলুন, যেখানে চড়ুইয়ের লাশ লটকে আছে।'

নিলম কুমার বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বললো– 'চড়ুইয়ের লাশ... মানে কী?'

কৃষ্ণকুমার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বললো– 'মুসলমান মেয়েরা হাতে এসেছিলো...!'

রাস্তায় কৃষ্ণকুমার বলতে আরম্ভ করলো– 'নিলম, তুমি তো যুবক বীর...!'

নিলম বললো– 'ধন্যবাদ।'

www.pathagar.com

কৃষ্ণকুমার পুনরায় বলতে আরম্ভ করে– 'বন্ধু! মহারাজা তার কন্যা চন্দ্রকান্তকে কয়েদখানার অন্ধকার কুঠরিতে তালাবদ্ধ করে রেখে বড় জুলুম করেছেন।'

এরপর সে এক স্থানে থেমে গিয়ে মৃদুস্বরে কানে কানে বললো– 'নিলম! আমি তোমাকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে তলব করেছি। মহারাজা তার হিতাহিত জ্ঞান হারাতে বসেছেন। প্রতিদিনই তিনি কোনো-না-কোনো মারাত্মক অন্যায় আচরণ করে বসছেন। যার ফলে আমরা সকলেই এক অজানা ভয়াল ধ্বংসস্তূপের দিকে নিক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছি। যে মানুষ তার নিষ্পাপ কুমারী মেয়ের সাথে এ ধরনের অন্যায় আচরণ করতে পারেন, তিনি অন্যকে আর কী করে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন?'

নিলম কুমার দম বন্ধ করে একনাগাড়ে কৃষ্ণকুমারের নতুন নতুন গা শিউরে ওঠা কথা শুনে যাচ্ছে।

শেষে সে বললো– 'আমি তোমাকে এ জন্য তলব করেছি যে, তুমি নিজ পিতা-মাতাকে আমার চেয়ে ভালো নিরাপত্তা দিতে পারবে।'

'কি! কী হয়েছে আমার পিতা-মাতার?'

'তাদের জীবন মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। মহারাজা তোমার পিতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন এবং খুনের নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন। তাকে তো আমি বাঁচিয়ে রেখেছি।'

'কিন্তু কেন?' নিলম কুমার হকচকিত ভঙ্গিতে জানতে চাইলো– 'পিতাজির পক্ষ হতে কী এমন অপরাধ সংঘটিত হলো?'

'অপরাধ...! তুমি বলো তো রাজকুমারীর অপরাধ কী ছিলো? কেন তাকে জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়েছে? বলেছিলাম না, মহারাজা পাগল হয়ে গেছেন! সর্বক্ষণ আমরা ভীতসন্ত্রস্ত থাকি, স্বয়ং আমাদের জীবনও নিরাপদ নয়। মহারাজা আজ সন্ধ্যায় বলে রেখেছেন, যদি আজকের রাতে প্রধানমন্ত্রীকে খুন করা না হয়, তাহলে আমি তোমাদের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ছাড়বো।'

নিলম কুমারের শঙ্কার মাত্রা বেড়ে যেতে থাকে। 'কৃষ্ণকুমারজি! তোমার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। তুমি আমার মাতা-পিতাকে নিরাপদ রেখেছো। আমার মামা মহারাজার এ কী যে হয়ে গেলো!'

www.pathagar.com

কৃষ্ণকুমার বললো– 'তার মাথা পুরোই নষ্ট হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তিনি অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছেন। রাতভর তিনি সুদর্শনা সুন্দরী কোনো কুমারী কন্যার সাথে আদিম যৌনলীলায় মেতে ওঠেন, এরপর ভোরে নিজ হাতে তাকে খুন করে ফেলেন। তার লাশে ঠোকর মেরে মেরে বলতে থাকেন– ফুল মরে গেলে তাকে পায়ের নিচে পিষে ফেলা উচিত। দুই-তিন দিন আগে মহারাজা প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন মুসলমান মেয়েকে গাছের খুঁটিতে বেঁধে শরীরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মেরেছেন।'

নিলম কুমার নির্বাক। ঠোঁটজোড়া তার কাঁপছে। চোখের জ্যোতি নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে তার। বললো– 'পিতাজির তাঁবু কোন দিকে? অনতিবিলম্বে আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই।'

কৃষ্ণকুমার একদিকে ইশারা দিয়ে বললো– 'চম্পা ফুল গাছটির নিচেই প্রধানমন্ত্রীর তাঁবু।'

নিলম কুমার ভারী ভারী পায়ে তার পিতার তাঁবুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার মনপ্রাণ কী এক অজানা শঙ্কায় কাবু হয়ে আছে। তাঁবুর কাছে এসে সে হতবাক! তার বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর তাঁবুর নিরাপত্তায় ওখানে একজন সৈনিকও নেই!

'ভগবান মঙ্গল করুন!' সে আনমনে ঠোঁট আওড়ালো। এরপর সে তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করলো।

চারদিকে রক্ত আর রক্ত! প্রধানমন্ত্রী রামশর্মার লাশ ঠান্ডা হয়ে এসেছে। কিন্তু ক্ষতস্থান থেকে এখনো তাজা রক্ত ঝরে পড়ছে। তার পাশাপাশি পড়ে আছে নিলম কুমারের মায়ের নিথর দেহ। তার কণ্ঠনালি দ্বিখণ্ডিত। মশালগুলো জ্বলছে। নিলম চিৎকার করে ওঠে এবং একটি চক্কর দিয়ে মাতাজির লাশের কাছে পড়ে যায়। গঙ্গোত্রি দেবীর প্রাণবায়ু এখনো কিছুটা নড়াচড়া করছে– নিলম তা অনুভব করে।

সে মায়ের মাথাটি কোলে নিয়ে বলতে থাকে– 'মাতাজি! মাতাজি!'

গঙ্গোত্রী চোখ মেলে তাকান। তার নয়নের প্রজ্জ্বলিত বাতিতে মায়া-মমতার সকল দরদ আলো হয়ে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। ঠোঁট নেড়ে তিনি কিছু বলতে চাইলেন। নিলম তার কান মায়ের ঠোঁটের কাছে লাগিয়ে রাখে।

তিনি বলছেন– 'বাবা! এখান থেকে দূরে পালিয়ে যাও!... জালেম তোমাকেও... নিলম... আমার ছেলে হয়ে থাকলে...' খুব কষ্টে তিনি শরীরের

www.pathagar.com

সর্বশক্তি দিয়ে বললেন– 'তোমার মামা... মহারাজকেও বাঁচিয়ে নিও... তার জীবনও ভীষণ হুমকি মুখে।'

'কিন্তু তিনি তো আপনার এবং পিতাজির খুনি!'

নিলম বললে গঙ্গোত্রি দেবী পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে বললেন– 'না...! না...! আমাদের খুনি সে... সে... যে তোমাকে বলেছে যে মহারাজ...'

তার আওয়াজ নিস্তেজ হয়ে আসে। রক্তে তিনি মাখামাখি হয়ে আছেন।

তিনি রক্তের থুতু ছিটিয়ে বললেন– 'নিলম! আমি মরে যাচ্ছি। আমার... শেষ ... নিশ্বাস... বেরিয়ে... যাচ্ছে। আমাদের খুনি... হচ্ছে কৃষ্ণ।'

সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ একটি শ্বাস ফেলে গঙ্গোত্রি দেবী অনন্তকালের পথে যাত্রা করে চুপ হয়ে যান। নিলম কুমার মাতাজির ঠান্ডা ঠান্ডা পায়ে নিজের চোখ মুছতে মুছতে শিশুর মতো চিৎকার করে কাঁদতে থাকে।

এরপর সে তার পিতার পা চুমু দিয়ে বলে– 'পিতাজি!... মাতাজি!... আমি তোমাদের নিস্প্রাণ দেহ নিয়ে দিব্যি দিচ্ছি, তোমাদের খুনিদের আমি জীবিত ছাড়বো না!'

সে তরবারি কোষমুক্ত করে বাইরের দিকে এগোতে চায়। ফের কী মনে করে আবার থেমে যায়। ঠোঁটের কোণে বিড়বিড় করে বলে– 'ষড়যন্ত্রের এই ভয়াল দিনে আমি জোশ আর আবেগ দিয়ে নয়, হুঁশ ও বিচক্ষণতার দ্বারা কাজ নেবো।'

এরপর সে কৃষ্ণকুমারের কাছে গিয়ে বললো– 'কৃষ্ণকুমার! তুমি সত্যিই বলেছো। জালেম মহারাজ আমার পিতা-মাতাকে খুন করে ফেলেছে।'

কৃষ্ণকুমার বানোয়াট বিস্ময়সূচক ভঙ্গিতে চিৎকার দিয়ে বললো– 'কী বলছো তুমি, নিলম! কেউ হয়তো তোমাকে ভুল তথ্য দিয়েছে!'

নিলম তার জামার টুকরো দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললো– 'আমাকে কেউ কোনো তথ্য দেয়নি, কৃষ্ণকুমারজি! নিজ চোখেই আমি দেখে এসেছি। আফসোস হচ্ছে– তুমি সেনাপতি হয়েও তাদের নিরাপত্তা দিতে পারোনি।'

কৃষ্ণকুমার নিলম কুমারের গলায় গলা লাগিয়ে বললো– 'আমার আফসোস হচ্ছে... খুবই আফসোস হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই খুন আমি নিজ হাতেই করেছি নিলম! আমি তোমাকে বলিনি মহারাজা বনের পশু হয়ে গেছেন!'

www.pathagar.com

নিলম কুমার বললো– 'তুমি ঠিকই বলেছো, কৃষ্ণজি! কিন্তু আমি আমার পিতা-মাতার নিষ্প্রাণ লাশ ছুঁয়ে দিব্যি খেয়েছি যে, আমি তাদের খুনিদের কখনো ক্ষমা করবো না।'

নিলম তার শেষ শব্দে একটু জোর দিলে কৃষ্ণকুমার তাকে বললো– 'তোমার শোকে আমি সমানভাবে ব্যথিত। এ ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে যাবো। কিন্তু এখন তুমি চুপ থাকো। সময়ের অপেক্ষা করো। কোনো বোকা মানুষের মতো পাহাড়কে ধাক্কা দিতে যেও না। এতে তোমার নিজের মাথাই ফাটবে। আমার কথা বুঝছো তো তুমি, নাকি? তোমার মাতা-পিতার খুনি সাধারণ কোনো মানুষ নয়!'

সকাল হতে হতেই প্রধানমন্ত্রী রামশর্মা এবং তার পত্নী গঙ্গোত্রি দেবীর মর্মান্তিক এই খুনের ঘটনা বনের লেলিহান শিখার মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আরো দ্রুত ছড়াতে থাকে একটি অভ্যুত্থানের পূর্বাভাস। পরিস্থিতিকে আরো ঘোলাটে করে ভয়ানক বানাতে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে কৃষ্ণকুমার ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। তারা বানোয়াট এ প্রপাগান্ডা বাতাসের বেগে ছড়িয়ে দিতে জোর প্রচেষ্টা চালায় যে, মহারাজা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। নিলম কুমার চারদিকে তার মৃত্যুর বিভীষিকাময় অন্ধকার দেখতে পাচ্ছে। সবাইকে তার খুনি মনে হচ্ছে। নিজেকে সে মৃত্যুর থাবার ভেতরে দেখতে পাচ্ছে। তাৎক্ষণিকভাবে সে কোনো প্রকার সিদ্ধান্তই নিতে পারছে না। দুশ্চিন্তা আর অস্থিরতায় তার মস্তিষ্ক ফেটে যাবার জোগাড়। সে তার মাতা-পিতার রক্তাক্ত লাশের মাঝখানে বসে কেঁদে কেঁদে নির্ভার হওয়ার চেষ্টা করছে। তার আশপাশে আসাম বাহিনীর বড় বড় পদবিধারীরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে আছে কৃষ্ণকুমারও। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রীর তাঁবুর বাইরে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত আসাম সেনাদের সারি। সর্বত্র কানাকানি, হা-হুতাশ ও মাতম চলছেই।

প্রেমচন্দ্র খবর পেলে তিনিও শোক প্রকাশের জন্য রণধীর ও কামরানকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌঁছে যান। যুবক নিলম কুমারকে উভয় লাশের মাঝে আহাজারি করে কাঁদতে দেখে তিনি অনুমান করেন, এই দুর্ভাগা যুবক নিহতদের পুত্র। তিনি এগিয়ে এসে নিলম কুমারকে তার বাহুতে ধরে দাঁড় করিয়ে বুকে বুক লাগিয়ে বলেন– 'যুবক! তোমার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার মতো নয়। খুনি তোমার আত্মায় যে আঘাত দিয়েছে, অনেক দিন সেই ঘা শুকাবে না। কিন্তু প্রিয় ভাই! ধৈর্য ধরা ছাড়া এখন আর কী করার আছে!'

www.pathagar.com

এরপর তিনি নিলম কুমারের দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়া অশ্রু ফোঁটা মুছে দিয়ে বললেন– 'আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী। সর্বক্ষেত্রে তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে পাবে। প্রকৃতপক্ষে তোমার মাতা-পিতার খুনি সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু আমি আমার সর্বোচ্চ ত্যাগ-সাধনার মাধ্যমে খুনিকে ধরতে চেষ্টা করে যাবো।'

প্রেমচন্দ্রের আন্তরিক অভিব্যক্তিতে নিষ্ঠা ও হৃদ্যতার সুবাস পায় নিলম। সে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো– 'আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।'

প্রেমচন্দ্র তার কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'আপাতত আমি তোমার কাছে অপরিচিত। আশা করি খুব দ্রুত একে অন্যের বন্ধুতে পরিণত হবো।'

কৃষ্ণকুমার বললো– 'নিলম! ওনার নাম রাজা প্রেমচন্দ্র। তিনি বাংলার হাকিমের নাগপাশ থেকে বিদ্রোহ করে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।'

দুজন চৌকিদার মহারাজার আগমনের সংবাদ দেয়। তাঁবুতে অবস্থান নেয়া সকলে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে থাকে। মহারাজা খালি পায়ে ও খালি মাথায় তাঁবুতে প্রবেশ করেন। তার চোখ অশ্রুসিক্ত। চেহারাজুড়ে ক্ষোভ, ক্রোধ ও শোকের রক্তিম ছাপ।

তিনি প্রধানমন্ত্রী রামশর্মার লাশের ওপর ঝুঁকে পড়ে ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে কেঁদে কেঁদে বলছেন– 'শর্মাজি! আমি তোমার ব্যাপারে লজ্জিত। আমার মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে!'

কৃষ্ণকুমার তির্যক দৃষ্টিতে তাঁবুতে আসা লোকজনের দিকে তাকায়। শেষে তার দৃষ্টি নিলম কুমারের চেহারায় স্থির হয়ে থাকে। নিলম কুমার মৃদুভাবে মাথা নেড়ে গর্দান ঝোঁকায়। মহারাজা এখন গঙ্গোত্রী দেবীর লাশের ওপর নুয়ে আছেন। নুয়ে নুয়ে তিনি বিছানার ওপর পা জোড় করে বসে যান। অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি তার বুকফাটা আর্তনাদ ঠেকাতে পারলেন না। চিৎকার দিয়ে আহাজারি করে তিনি বলতে থাকেন– 'জানি না পাষণ্ড খুনি কোন অপরাধে আমার নিষ্পাপ বোনটিকে এমন শাস্তি দিলো। এ তো সব সময় সম্প্রীতির কথা বলতো। সে তো ফুলের মতো সুন্দর ও মনোহর ছিলো। সর্বাবস্থায় সে প্রেম-প্রীতি বিলিয়ে যেতো। কী জন্য তাকে রক্তের নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হলো!'

এরপর তিনি নিলম কুমারকে গলায় জড়িয়ে ধরে বললেন– 'নিলম! আমি তোমার শোকে বরাবরই অংশীদার। বড় অজ্ঞ ছিলাম আমি। শর্মাজির

www.pathagar.com

উপদেশ আমার বুঝে আসেনি। আমি নিজের মনগড়া মতো কাজ না করলে হয়তো এসব কিছু সংঘটিত হতো না।'

এরপর মহারাজা উপস্থিতির দিকে এক এক করে সকলের চেহারার দিকে চোখ বোলালেন। শেষে তিনি বললেন– 'চিতাখোলা প্রস্তুত করা হোক, সন্ধ্যায় শবদাহের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।'

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মহারাজা কৃষ্ণকুমারের কাছে জানতে চাইলেন– 'আসামির ব্যাপারে কোনো কিছু জানতে পেরেছো তুমি?'

কৃষ্ণকুমার আস্তে করে বললো– 'শবদাহ শেষে তদন্ত শুরু করবো। আমি মনে করি, মহারাজা এ ব্যাপারে অধিক অবগত।'

মহারাজা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'হতে পারে তুমি ঠিকই বলেছো। খুনিকে আমি ভালো করেই চিনি।'

নিলম কুমার কৃষ্ণকুমারের দিকে তাকিয়ে বললো– 'মামা মহারাজ! আপনি যখন খুনির ব্যাপারে জানেন, তো কারো কাছে জানতে চাওয়ার আর কী প্রয়োজন? আপনার দীর্ঘ হাত খুনির মাথা পর্যন্ত পৌঁছছে না কেন?'

মহারাজা বললেন– 'বাবা! কখনো কখনো বড় বড় ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষও পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সম্ভবত এ সময়ে আমিও তেমনই একজন হতভাগা ক্ষমতাবানের মতো হয়ে পড়েছি।'

নিলম কুমার বললো– 'আমার মাতা-পিতার খুনি কি আপনার চেয়েও অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং শক্তিশালী?'

মহারাজা জবাব দেয়ার আগেই কৃষ্ণকুমার বলে উঠলো– 'নিলম! তুমি কেমন কথা বলছো! এ সময় আমাদের মহারাজার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি আর কে হতে পারেন?'

মহারাজা কৃষ্ণকুমারের দিকে না তাকিয়েই বললেন– 'এ ধরনের কথাবার্তার জন্য এটা উপযুক্ত সময় নয়।'

সন্ধ্যায় লাখ লাখ আসামবাসীর উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী এবং তার পত্নীর চিতায় আগুন লাগানো হয়। মহারাজা দীর্ঘ সময় ধরে আগুনের ওইসব ফুলকির দিকে চেয়ে আছেন– যা আসামের ইতিহাসে এক একটি অধ্যায় নিঃশেষ করে চলেছে। আগুনের শিখাগুলো তার আত্মাকে শিহরিত করে তুলেছে। সমুদয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা পর্যন্ত মহারাজা চিতাখোলায় অবস্থান করতে থাকেন।

www.pathagar.com

এদিকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে অন্য এক বার্তা। কৃষ্ণকুমারের কুটিল চক্রান্তে মহারাজার বিরুদ্ধে বড় ধরনের ষড়যন্ত্র সফলভাবে সম্পন্ন হতে চলেছে। তার সাঙ্গোপাঙ্গরা খুব সূক্ষ্মভাবে লোকজনকে বোঝাচ্ছে, এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন মহারাজা নিজে। এভাবে তারা মহারাজার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে খেপিয়ে তুলছে। নিলম কুমার খুবই অসহায়ভাবে মহারাজার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে মনে দুঃখ-কষ্টের পাহাড় চাপিয়ে রেখে চুপ থেকে নীরবতা পালন করে যাচ্ছে সে। মহারাজা ও নিলমের জগৎ ধীরে ধীরে ছোট হতে আরম্ভ করে।

শবদাহের মিছিল থেকে ফিরে কৃষ্ণকুমার নিলম কুমারের কাঁধে হাত রেখে বললো– 'আমাকে তোমার যাবতীয় অবস্থা জানাবে, আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিয়ে রাখবো।'

***

সেনাপতি কৃষ্ণকুমারের বিশাল প্রশস্ত তাঁবুতে আসাম বাহিনীর বড় বড় সকল নেতা ও পদধারীরা উপস্থিত। কৃষ্ণের ডান পাশে ঘনশ্যাম ঠাকুর ও প্রতাপ বসে আছে। বাঁয়ে বসে আছে বিক্রম ও বলরাজ। কৃষ্ণের মুখে আনন্দের হাসি। তার চটুল চোখে বিজয়ের রেখা ও ক্ষমতার নেশা।

কৃষ্ণকুমার এক নর্তকীর হাত থেকে মদের পাত্র নিতে গিয়ে বললো– 'আমি মহারাজার নিরাপত্তারক্ষী সেনাপতিকে আসতে বলেছি। সে যদি সহযোগিতার হাত বাড়ায়, তবে কোনো প্রকার খুনখারাবির প্রয়োজন নেই।'

বিক্রম নেশাভরা চোখে কৃষ্ণকুমারের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো– 'কৃষ্ণজি! সে যদি সহযোগিতা না করে, তবে কী করবে? সর্বসাকুল্যে মহারাজার নিরাপত্তায় নিয়োজিত আছে পাঁচশ যুবক। এই পাঁচশ যুবককে হত্যা করতে আর কতোক্ষণ লাগবে! অল্প সময়ের মধ্যেই মাঠ পরিষ্কার হয়ে যাবে। এছাড়া মনে হচ্ছে, নিরাপত্তারক্ষীরা মহারাজাকে রক্ষায় তেমন জীবনবাজি রাখতে চাইবে না। এ মুহূর্তে সবার জানা হয়ে গেছে যে, মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের জীবনতরি অকূল তীরে এসে ঠেকে গেছে। অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি অতল সাগরে ডুবে মরবেন। সুতরাং, এক্ষেত্রে সকলেই নিজ প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করবে।'

www.pathagar.com

বিক্রমের কথা এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি; একজন সশস্ত্র সৈনিক এসে সংবাদ দিলো– 'মহারাজার আজ্ঞা হলে প্রাক্তন মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের নিরাপত্তারক্ষীদের সেনাপতিকে ভেতরে পাঠানো হবে।'

কৃষ্ণকুমার ও তার অন্য ফৌজি নেতারা সমস্বরে অট্টহাসি দিয়ে উঠলো। সিপাহি অবাক হয়ে বললো– 'অন্নদাতা! সেবকের কি কোনো ভুল হয়ে গেছে?'

'না।'... কৃষ্ণকুমার বললো– 'একবার আবারও 'প্রাক্তন মহারাজা'র জয় হোক!'

সিপাহি মাথা ঝুঁকিয়ে হেসে বললো– 'আমাদের মহারাজা তো আপনি। তিনি তো প্রাক্তন হয়ে গেছেন। আর সকাল পর্যন্ত না জানি তিনি কী হয়ে যান।'

আবারও অট্টহাসির রোল পড়লো। কৃষ্ণকুমার বললো– 'সুজনকে ডেকে আনো।'

দীর্ঘদেহী এক তাগড়া যুবক তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করলো। সে মাথা ঝুঁকিয়ে কৃষ্ণকুমারকে নমস্কার বলে পরে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে গেলো।

কৃষ্ণকুমার কোনো ধরনের ভূমিকা ছাড়াই বললো– 'সুজন! আমি মনে করি তুমি বুদ্ধিমান সৈনিক এবং আমি আশা করি এই সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে তুমি বিচক্ষণতার পরিচয় দেবে।'

সুজন মাথা তুলে কৃষ্ণকুমারের দিকে তাকিয়ে বললো– 'আমি বুঝতে পারিনি।'

বিক্রম কিছুটা কর্কশ ভঙ্গিতে বলে উঠলো– 'তুমি সবকিছুই জানো এবং বুঝো। বানোয়াট অভিনয়ের চেষ্টা করো না, নইলে ভীষণ পস্তাবে তুমি। সময় খুব কম, এতেই উপকৃত হও!'

সুজন বললো– 'আমি এখনো কিছু বুঝে উঠতে পারিনি।'

প্রতাপ দ্রুতকণ্ঠে বললো– 'আমরা মহারাজা জয়ধ্বজ সিংকে তার সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়েছি। তার স্থলে আমরা তার যুবক ভাতিজা ও আসাম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কৃষ্ণকুমারকে আসামের মহারাজা হিসেবে মনোনীত করেছি। আগামীকাল সকালেই তার রাজমুকুট পরিধান-সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে। তুমি যদি ঘণ্টা-দুই ঘণ্টার জন্য আমাদের

www.pathagar.com

সহযোগিতা করো, তাহলে রাজমুকুট পরিধানের সময় তোমাকে যথাযথ পুরস্কারের পাশাপাশি বড় ধরনের পদে আসীন করা হবে। অন্যথায় হয়তো তুমি ভোরের আলোটুকু আর দেখতে পাবে না।'

সুজন ভীতির সুরে জানতে চাইলো– 'মহারাজ! আমার জন্য কী নির্দেশ? আমি তো সিংহাসন ও রাজমুকুটধারীর গোলাম।'

'শাবাশ!' কৃষ্ণকুমার বললো– 'তুমি বাস্তবিকই বুদ্ধিমান!'

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর সে বললো– 'আজ রাতের শেষাংশে আমাদের একজন সৈনিক মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের নিদ্রাকক্ষে প্রবেশ করবে। তার পথে কোনো ধরনের বাধা সহ্য করা হবে না।'

সুজন বললো– 'আমি বুঝতে পেরেছি, সরকার! আপনি নির্দেশ দিলে এখনই এই মুহূর্তেই ওখানে গিয়ে আমি আমার লোকজনকে সরিয়ে ফেলবো।'

'না, এর প্রয়োজন নেই। ব্যস, তোমাকে যা বলা হলো, সে মতে কাজ করো। আর জীবনে কখনো এ ব্যাপারে মুখ খুলবে না।'

সুজন ফের কুর্নিশ করে বললো– 'সেবক বংশপরম্পরায় গোলামির আদব সম্পর্কে জ্ঞান পেয়ে এসেছে।'

'খুব ভালো।' কৃষ্ণকুমার নিজ গলা থেকে মুক্তার মালাটি হাতে নিয়ে সুজনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো– 'এটা তোমার প্রথম পুরস্কার। তোমার ব্যবহারে আমি খুব খুশি হলাম। এখন তুমি চলে যেতে পারো। দেখো, সাবধানে থাকবে। নিজের বিশেষ বিশেষ লোকদের অবহিত করে রাখবে এবং সকল সৈনিককে মহারাজার নিদ্রাকক্ষ হতে দূরে সরিয়ে রাখবে।'

সুজন এখান থেকে বের হয়ে লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যায়। তার মনে হাজার বিপদের ঘূর্ণিঝড় তোলপাড় করছে। সময় ও পরিস্থিতির এমন মর্মভেদী পরিবর্তনে তার অন্তর চিরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

সে তার বিশ্বস্ত এক সাথিকে ডেকে একদিকে নিয়ে গিয়ে বললো– 'রাজেন্দ্র! মহারাজার জীবন মারাত্মক হুমকির মুখে।'

রাজেন্দ্র বললো– 'সুজন! ব্যাপারটি আমি জানি। যেকোনো উপায়ে শত্রুরা আমাদের লাশ ডিঙিয়ে মহারাজা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। মহারাজার জন্য আমরা

www.pathagar.com

আমাদের জীবন উৎসর্গ করে দেবো। এছাড়া হয়তো আমরা আর কিছুই করতে পারবো না।'

সুজন বললো– 'এটা তোমার এক দারুণ আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত। আমরা কেবল মহারাজাকে রক্ষা করবো এবং অনিবার্য পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নিজের প্রাণও বাঁচানোর চেষ্টা করবো।'

'কীভাবে, আমি বুঝলাম না!' রাজেন্দ্র বললো।

'সময় খুব কম। আর এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের সম্পূর্ণভাবে সফল হতে হবে।'

রাজেন্দ্র বললো– 'তুমি কিছু একটা করো তো বন্ধু!'

সুজন বললো– 'তুমি তাৎক্ষণিকভাবে একটি নৌকার ব্যবস্থা করে নদীর তীরে অবস্থান করো। আমি মন্দিরের সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে মহারাজাকে বের করে নিয়ে আসছি।'

রাজেন্দ্র বললো– 'নৌকা তো নদীতে অনেক আছে। কিন্তু জানি না ওখানকার দায়িত্বে এখন কে আছে?'

'তুমি দ্রুত যাও। একটি নৌকা পৃথক করে কিছু দূর গিয়ে তুমি দাঁড়াও!'

বাতাসের গতিতে তীব্রতা। প্রবল বেগে বইছে ঘূর্ণিঝড়। আকাশে ছেয়ে আছে ঘনঘোর কালো মেঘ। চারদিকে অন্ধকার ঘনীভূত হতে চলেছে।

সুজন বললো– 'রাজেন্দ্র! ভগবান আমাদের ওপর অনুগ্রহ করছেন। তুমি যাও, এই তুফানের রাতে খুব সহজে মহারাজকে বের করে নেয়া যাবে।' রাজেন্দ্র আকাশের ওপর গর্জন করতে থাকা মেঘমালার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো এবং একটু পরই নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো।

সুজন দ্রুত পায়ে মহারাজার শয়নকক্ষের দিকে এগিয়ে গেলো। সে দূর থেকে একজনকে মহারাজার শয়নকক্ষের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে। তার মনে ভীতির কম্পন।

সুজন তরবারি কোষমুক্ত করে দরজায় নিয়োজিত সৈনিককে উদ্দেশ করে বলে– 'তোমরাও দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টিয়ে ফেলেছো নাকি?'

'না! না!' সৈনিক মৃদুকণ্ঠে বললো– 'চিন্তার কোনো কারণ নেই, ইনি মহারাজার ভাগনে নিলম কুমার।'

www.pathagar.com

সুজন স্বস্তির শ্বাস নিয়ে তরবারি কোষবদ্ধ করলো এবং দ্রুত গতিতে শয়নকক্ষে প্রবেশ করলো।

নিলম কুমার বললো– 'সুজন, মহারাজের জীবন ভীষণ সংকটের মুখে।'

'আমার জানা আছে এবং আমি আমার সাধ্যমতে মহারাজাকে এখান থেকে নিরাপদে বের হয়ে যাওয়ার সুবন্দোবস্ত করে রেখেছি।'

এরপর সে মহারাজার পায়ে চুমু খেয়ে বললো– 'মহারাজা! জলদি করুন, সময় খুবই কম!'

এরপর সে সংক্ষেপে মহারাজাকে সবকিছু অবহিত করে বললো– 'ক্ষমা করবেন, মহারাজ! এখন এমন পরিস্থিতিতে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা যাচ্ছে না। ভগবান আপনাকে রক্ষা করবেন।'

মহারাজা তাড়াতাড়ি পূজারির বেশ ধরেন। মাথায় সাদা দাগ দেন। কাঁচি দিয়ে গোঁফ পরিষ্কার করেন। বেশ পাল্টানোর ক্ষেত্রে নিলম ও সুজন মহারাজাকে সাহায্য করতে থাকে। মহারাজার চোখ বেয়ে শ্রাবণের বারিধারা ঝিমঝিমিয়ে ঝরতে থাকে। মহারাজা নিলমকে গলায় জড়িয়ে ধরলেন এবং কেঁদে কেঁদে বললেন– 'বাবা! নিজের প্রতি খেয়াল রেখো। আমার পর তুমিই ওই খুনি অজগরদের প্রথম শিকার।'

নিলম মহারাজের পায়ে ঝুঁকে পড়ে কাঁদতে থাকে– 'মামা মহারাজ! ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন। যেভাবেই হোক আপনি দ্রুত বার্মা পৌঁছান। আশা করা যায়, বার্মার মহারাজা অবশ্যই এমন কঠিন পরিস্থিতিতে আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। যান, আমি এখানে খুনিকে আক্রমণের অপেক্ষায় আছি। আমার ধারণা– সে-ই হবে আমার মাতা-পিতার খুনি। মানুষরূপী এই হায়েনাকে দেখে নেয়া আমার খুব প্রয়োজন।'

নিলমও বেশ বদলে ফেলেছিলো। সুজন বাইরে গিয়ে দেখে অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে পড়েছে। মেঘ গর্জন করছে। বিজলি চমকাচ্ছে।

এক সৈনিক মৃদুকণ্ঠে বললো– 'বেরিয়ে যান, জনাব!' সুজন ও মহারাজ দ্রুত পায়ে বের হয়ে যান।

নিলম মহারাজার বিছানার পেছনে রেশমি পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। অনেকক্ষণ পর কালো পোশাক ও কালো মুখোশ পরিহিত একজনকে আসতে দেখে সে। তার ডান হাতে চিকচিক করছে খঞ্জর।

www.pathagar.com

শয়নকক্ষে প্রবেশ করেই সে ভালো করে চারদিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। খঞ্জরের দিকে চোখ বুলিয়ে মহারাজার বিছানার দিকে পা বাড়াতেই নিলম কুমার চিতার মতো ক্ষিপ্র গতিতে তার ওপর তরবারি চালনা করে। তৎক্ষণাৎ তার মস্তক শরীর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার দেহ একদিকে, মাথা আরেক দিকে। তার গলা হতে রক্তের স্রোত গিয়ে পড়ছে কক্ষের ছাদে।

নিলম দ্রুতবেগে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। সে জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে কক্ষে আগুন ধরিয়ে দেয়। রেশমের পর্দা ও বিছানায় সহজেই আগুন পৌঁছে যায়। সাথে সাথে আগুনের কুণ্ডলী সাপের ফণার মতো সারা ঘরে ছেয়ে যায়। নিলম তড়িৎ পায়ে বেরিয়ে আসে। বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিলো মুষলধারে। বিজলির বিকট শব্দে জমিন কাঁপতে থাকে। তুফানের স্রোতের মতো আকাশ থেকে বৃষ্টি নামছে। বড় বড় গাছ গড়াগড়ি খাচ্ছে। চারদিকে বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ।

নিলম প্রবল বেগে বহমান বাতাস পেরিয়ে দ্রুত তার তাঁবুতে চলে আসে। মহারাজা জয়ধ্বজের কক্ষ থেকে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে আসছে। নিলম ভালোভাবেই তার তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছায়। তড়িৎ সে পোশাক পাল্টে ফেলে এবং বিছানায় শুয়ে গভীর নিদ্রায় বিভোর হয়ে যায়। এখন সে বেশ শান্ত। সে তার পিতা-মাতার খুনিকে শাস্তির শেষ ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছে।

***

সুজন মহারাজা জয়ধ্বজ সিংকে মন্দিরের ওই সুড়ঙ্গের গোপন সরু পথ দিয়ে বের করে নিয়ে এসেছে– যেখান দিয়ে আজ থেকে কয়েক মাস আগে কুলসুম, আহমাদ হাসান ও একজন মৌলভি সাহেবকে হাশিম, ইসমাইল, শেখর ও কামিনীরা পূজারিদের খুন করে বের করে নিয়ে এসেছিলো। সুজন খুব সতর্কতার সাথে হতভাগা মহারাজাকে সুড়ঙ্গ পার করিয়ে নদীর তীরে ওই নৌকার কাছে পৌঁছে যায়, যেখানে রাজেন্দ্র অপেক্ষা করছে। অঝোর বৃষ্টি ও দমকা বাতাসের কারণে আসামের সকল মাঝি তাদের নৌকা তীরে ভিড়িয়ে রেখে নিজ নিজ তাঁবুতে অবস্থান নিয়েছে। কেউই সুজন ও মহারাজাকে দেখতে পায়নি। মহারাজা পূজারির রূপ ধরে ছিলেন। রাজেন্দ্র মাঝিদের তাঁবু থেকে যথেষ্ট দূরে একটি গাছের নিচে লুকিয়ে ছিলো।

www.pathagar.com

মহারাজা নৌকায় আরোহণ করলে সুজন রাজেন্দ্রকে উদ্দেশ করে বললো– 'রাজেন্দ্র! পরিস্থিতি যতোই ঘোলাটে ও প্রতিকূল হয়ে পড়ুক, মহারাজার সঙ্গ ছাড়বে না। এই তুফানের রাতে ভীত হয়ে পড়বে না। এটা তোমার জন্য বড়ই শুভ রাত। এই তুফানের সাথে তুমি সহজেই মহারাজাকে নিশ্চিত মৃত্যুর এই বসতি থেকে বের করে বহু দূর নিয়ে যেতে পারবে।'

রাজেন্দ্র বৈঠা সামলে নিয়ে বললো– 'সুজন! নৌকার দড়ি খুলে দাও। চিন্তা কোরো না। সত্যি, বিপদের সময় মানুষের ছায়াও তার সঙ্গ ছেড়ে দেয়। লাখো কোটি মানুষ এবং পৃথিবীর বিশাল এক ভূখণ্ডের ওপর রাজত্বকারী বাদশা আজ নিঃস্ব ও অসহায়ভাবে দেশান্তরিত হয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে অজানা গন্তব্যের দিকে চলে যাচ্ছেন। এমন সময়ে মহারাজার নিজ ছায়াও দূরে পালাচ্ছে। কিন্তু আমাদের মহারাজার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নৌকার বৈঠা হাতে নিয়ে তুফানের এই ঘূর্ণিস্রোতে সকল প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আমি এখানে বসেছি। যতোক্ষণ আমার প্রাণবায়ু আমার শরীরে থাকবে, ততোক্ষণ আমি মহারাজাকে সঙ্গ দিয়েই থাকবো, আর যখন মৃত্যুর কাছে আমি আত্মসমর্পণ করবো তখন আমাকে ক্ষমা করে দিও। এখন নৌকার দড়ি খুলে আমার দিকে নিক্ষেপ করো!'

সুজন নৌকার দড়ি গাছের গোড়া থেকে খুলে দিয়ে দ্রুত রাজেন্দ্রের দিকে নিক্ষেপ করলো। নদীর উত্তাল স্রোতে নৌকা বিদ্যুৎ গতিতে এগোতে থাকে। বিজলি চমকালে সুজন দেখতে পায় বহু দূরে নৌকা তিরের গতিতে ভেসে যাচ্ছে। সুজনের চোখ টলমল করে ওঠে। একটি ভারী ঠান্ডা নিশ্বাস ফেলে সে মন্দিরের সুড়ঙ্গের দিকে চলে যায়।

মহারাজার শয়নকক্ষ এখনো জ্বলছে। বৃষ্টি না হলে সম্ভবত এতোক্ষণে আগুনের শিখা মন্দির পর্যন্ত এসে পৌঁছাতো। সুজন মন্দিরের আবাসিক এলাকায় এসে পৌঁছালে দেখতে পায় একটি গাছের পেছনে মুখোশপরা কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। সে খালি পায়ে তার কাছে এসে বললো– 'বলো, তুমি কি মহারাজার শয়নকক্ষে আগুন দিয়েছো?'

'না' বলে সে সরে যেতে চাইলো।

কালবিলম্ব না করে সুজন মুখোশ পরিহিতের মুখ চেপে ধরে খঞ্জর দিয়ে জোরে এক আঘাত বসিয়ে দিলো তার বুকে। এরপর তাজা এই লাশটাকে টেনে মহারাজার শয়নকক্ষের দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেলো।

www.pathagar.com

এখানে সে আরো একজন সৈনিককে বললো– 'এই খবিশকে উঠিয়ে ভেতরে নিক্ষেপ করো! এতে করে আমাদের পরিকল্পনা আর সন্দেহযুক্ত হবে না। দুজন জ্বলন্ত মানুষকে দেখে কৃষ্ণকুমার নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, খুনি এবং খুন হওয়া ব্যক্তি উভয়ে আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে।'

সিপাহি তাকে উঠিয়ে দরজা দিয়ে কক্ষের ভেতরে নিক্ষেপ করলো।

ভোর হতেই সুজন কৃষ্ণকুমারের কাছে গিয়ে বললো– 'মহারাজার সাথে আপনার পাঠানো লোকও পুড়ে মারা গেছে।'

'পুড়ে মারা গেছে! মানে কী?' কৃষ্ণকুমার অবাক হয়ে জানতে চাইলে সুজন বলতে থাকে– 'এ ব্যাপারে নিশ্চয়তার সাথে কিছু বলা যাচ্ছে না। আমার ধারণা– বাতাসের তীব্রতায় কোনো মশাল উল্টে তাদের ওপর পড়েছিলো। এরপর রেশমি পর্দায় লেগে গোটা কক্ষ ভস্মীভূত হয়ে যায়। কক্ষের ভেতরের সবকিছু আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখনো সেখানে আগুন জ্বলছে।'

কৃষ্ণকুমার কী যেন চিন্তা করে বললো– 'চলো, এতেও মন্দ হয়নি। খুনি এবং খুন হওয়া ব্যক্তি উভয়ে পুড়ে মরেছে। উভয়ের পাশের নিশানা মিটে গেছে। তুমি এখন যাও এবং বাইরে গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দাও যে, মহারাজার কক্ষে আগুন ধরেছে। প্রবল তুফান ও বৃষ্টিপাতের কারণে মহারাজাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি, তিনি জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেছেন।'

আসাম সেনাবাহিনীর কাছে পরদিন সকালে এ সংবাদ পৌঁছানো হয় যে, মহারাজাও প্রধানমন্ত্রীর পেছনে পেছনে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। মন্দিরের ওই অংশ সম্পূর্ণভাবে জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে– যেখানে মহারাজা অবস্থান করছিলেন। আগুন নিভে গেলে সেখানে দুজন মানুষের কঙ্কালের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। একজনের মাথা শরীর থেকে আলাদা হয়ে কিছু দূরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। কৃষ্ণকুমার নিশ্চিন্ত হয়ে যায় যে, যে কঙ্কালের মাথা পৃথক সেটা মহারাজার, আর অন্যটি খুনির। নিলম আরেকবার চোখের পানি বিসর্জন দিতে থাকে।

সে কৃষ্ণকুমারকে উদ্দেশ করে বলে– 'কৃষ্ণজি! এ কী হলো! মাতা-পিতার পর মহারাজা!'

কৃষ্ণকুমার তার কাঁধে হাত রেখে বললো– 'ভগবানের ইচ্ছাতেই সব হয়েছে।'

www.pathagar.com

দিন শেষে মন্দিরের বড় কক্ষের সবচেয়ে বড় জগন্নাথ দেবতার মূর্তির সামনে কৃষ্ণকুমারকে রাজমুকুট পরানোর আনুষ্ঠানিক আয়োজন আরম্ভ করা হয়। পূজারিরা নতুন মহারাজার মাথায় স্বর্ণের মুকুট পরিয়ে মন্ত্র জপতে থাকে। এরপর বিক্রম, প্রতাপ, ঘনশ্যাম ঠাকুর ও নিলম কুমার নতুন মহারাজার পা ছুঁয়ে এবং নিজ নিজ আনুগত্যের স্বীকৃতির ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়ে যাচ্ছে। মহারাজা কৃষ্ণকুমার বিক্রমকে আসাম বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দেয়। নিলম কুমারকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়। অন্য নেতৃবৃন্দের মাঝেও বিভিন্ন পদ বন্টন করা হয়। উপযুক্ত পূজারিদের মাঝে স্বর্ণ-রুপা বিলি করা হয়। কৃষ্ণকুমার এখানকার আনুষ্ঠানিকতা থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয় এবং আসাম বাহিনীর সবগুলো বহরে চক্কর দেয়।

এরপর সে রাজমুকুট পরিধানের আনন্দ উদ্‌যাপনের ঘোষণা দিয়ে বলে– 'আজ মন ভরে মদ পান করতে থাকো। নৃত্য করো, গান করো এবং যার যেমন ইচ্ছে আনন্দ উপভোগ করতে থাকো।'

সৈনিকেরা আনন্দে নাচ-গান করতে থাকে, মদ পান করে নেশায় মাতাল হয়ে ওঠে। এরপর একসময় এই বিশাল বাহিনীর উন্মত্ততা-উন্মাদনায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে গোটা জগন্নাথ বসতির অলিগলি ও বাড়িঘর। বৃষ্টি থামতেই আসাম বাহিনী একযোগে মাতাল হয়ে হামলে পড়ে সারা গ্রামে। কোনো একটি ঘর তাদের অন্যায় লালসা থেকে মুক্ত থাকেনি। গ্রামের যুবতী-কুমারী মেয়েদের উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ছাউনিতে। যার ভাগ্যে কুমারী মেয়ে জোটেনি, সে উঠিয়ে নিয়ে আসে মধ্যবয়সী নারীকে। যেখানে তাদের কেউ বাধা দিতে এসেছে, সেখানেই তরবারি দ্বারা জবাব দেয়া হয়েছে। আসাম সেনাদের উন্মত্ত অট্টহাসি, মেয়েদের আর্তচিৎকার আর আহত পুরুষদের হা-হুতাশে ভারী হয়ে ওঠে সারা গ্রাম।

এক যুবক রঘুনাথের জামা ধরে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বললো– 'রঘুনাথ মশাই! বলো, এ কী হচ্ছে? আমাদের মান-সম্মান, ব্যক্তিত্ব-মর্যাদা এভাবে কেন ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে? আমরা এমন কী অপরাধ করলাম যে, এতো বড় শাস্তির মুখোমুখি আমাদের হতে হচ্ছে!'

রঘুনাথ নীরব। তার দু'চোখ পাথর হয়ে গেছে। কী বলবেন তিনি?

www.pathagar.com

এমন সময়ে দুই আসামীয় সেনা এদিকে বেরিয়ে আসে। তারা রঘুনাথের ঘরে জোর করে ঢুকতে গিয়ে বললো– 'পণ্ডিতজি! তোমার ঘরে কয়জন পরী আছে?'

রঘুনাথ কান্নাজড়ানো চোখে বললেন– 'ভগবানের দোহাই লাগে, এই ঘরের ওপর দয়া করো। আমার দুজন যুবতী মেয়ে আছে। আমি এখানকার সম্মানিত ব্যক্তি এবং তোমাদের মহারাজার বিশেষ আস্থাভাজন।'

এক সিপাহি তাকে ধাক্কা দিয়ে বললো– 'সরে যাও! আমাদের পথের কাঁটা হওয়া লোকদের পরিণতি খুবই মন্দ হয়ে থাকে। তুমি আমাদের মহারাজের বিশেষ আস্থাভাজন লোক, তাই তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। তোমার স্থানে অন্য কেউ হলে এতোক্ষণে এখানে তার লাশ পড়ে থাকতো!'

তারা ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে রঘুনাথ তাদের পায়ে পড়ে যান। সেনারা তাকে প্রচণ্ড জোরে লাথি দিলে রঘুনাথ অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

ভেতর থেকে দুজন অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়ে চিৎকার করে বেরিয়ে এসে বলে– 'জালেমের দল! আমার পিতাকে মেরো না! তিনি তোমাদের মহারাজার খুবই নিকটজন!'

সেনারা মেয়েদের কথা শেষ করতে দেয়নি। তারা মেয়ে দুটোকে এমনভাবে বাহুবন্ধ করে নেয়, যেমন বাজপাখি চড়ুই পাখিকে তার থাবা দ্বারা আক্রমণ করে। এরা চলে যাওয়ার পর রঘুনাথের জ্ঞান ফিরে আসে।

পাগলের মতো সে চিৎকার করে বলতে থাকে– 'আমার মেয়েরা কোথায়? না! তোমরা আমার মেয়ের সাথে এমন পাশবিক আচরণ করতে পারো না!'

'কেন রঘুনাথজি!' এক যুবক বললো– 'তোমার মেয়েদের সাথে কেন এমন আচরণ করা যাবে না?'

রঘুনাথ বাইরের গলিতে বেরিয়ে পাগলের মতো প্রলাপ বকে যাচ্ছে– 'কারণ, আমি মহারাজার বিশেষ লোক। এ কারণে আমার মেয়েদের সাথে এমন অন্যায় আচরণ করা সম্ভব নয়!'

বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু এর মাঝে গ্রামজুড়ে বয়ে গেছে এক ঘোর কালো অমানিশার ঝড়। ধূসর পরিবেশ। আবহাওয়ায় এক অদ্ভুত মাদকতা। চম্পা ফুলের গাছগুলো থেকে সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে। কালো কালো মেঘমালার

www.pathagar.com

একটি খণ্ড আরেকটির সাথে টক্কর খাচ্ছে। গ্রামের প্রতিটি ঘরে কান্নাকাটি, আহাজারি আর সতীত্ব-সম্ভ্রম হারানোর মাতম চলছেই।

রঘুনাথ পাগল হয়ে গেছেন। তিনি একজন আসাম সেনার জামা ধরে বললেন– 'তোমরা আমার মেয়েদের কেন উঠিয়ে নিয়ে গেছো? কোথায় নিয়ে গেছো তাদের?'

সৈনিক তাকে আবারও সজোরে এক ধাক্কা মেরে বহু দূরে ফেলে দেয়। তার মাথা গিয়ে পড়ে শক্ত দেয়ালের ওপর। মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। রঘুনাথ দেয়ালের সাথে টেক লাগিয়ে বসে যান। মেঘের দেশে কাকে যেন তিনি আনমনে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ফুলে ফুলে ভরা এক হারানো বাগান হারিয়ে আবারও তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যান!

www.pathagar.com

ভাগ্যবিধি

নদীর বুকে তুফানের মাত্রা ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে। বেশ উঁচু উঁচু ঢেউ। চারদিকে বিশাল বিশাল ঢেউ মহারাজার নৌকা যেন ডুবিয়ে দিতে চাইছে। রাজেন্দ্র ও মহারাজা জয়ধ্বজ খুব কষ্টে নৌকাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে চলেছেন। স্থানে স্থানে ভয়ংকর স্রোত। একটু পরপরই মৃত্যুদূত যেন তাদের ধাওয়া করে ফিরছে। আকাশে মেঘের ভারী গর্জন। নদীর বুকজুড়ে সৃষ্টিকর্তার অপার নিদর্শন পদে পদে দেখে চলেছেন তারা।

এক মহারাজা– যিনি গতকাল পর্যন্ত পৃথিবীর বিশাল এক ভূখণ্ডের অধিবাসীদের ওপর ক্ষমতাবান ছিলেন, আজ তিনি মৃত্যুর জোয়ার-ভাটায় অসহায়, নিঃস্ব হয়ে ভাসছেন। তিনি ভীত হয়ে, কম্পিত শরীরে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পানে তাকিয়ে আছেন। মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের মতো প্রাণ আজ এক ক্ষুদ্রপ্রাণ চড়ুই পাখির মতো ভীত-সন্ত্রস্ত।

তিনি ভীতির তীব্রতায় রাজেন্দ্রের কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'রাজেন্দ্র! আমার তো এমন মনে হচ্ছে, যেন মৃত্যুর ভয়ে আমরা মৃত্যুকে সন্ধান করে ফিরছি!'

রাজেন্দ্র ফুলে ওঠা নিশ্বাস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে জবাব দিলো– 'মহারাজা! আমার মনে হচ্ছে, এটাও জীবনেরই একটি অংশ। মৃত্যু তার নিশানা পরিবর্তন করে নিয়েছে। আমার তো জীবনের মূল্যমান খুব করে অনুভব হচ্ছে। আমরা জীবনকে যতোটা সস্তা ও কম দামি মনে করতাম, আজকের প্রেক্ষাপটে বাস্ত বতা আমাদের সামনে স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। মনে হচ্ছে, আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। উঠুন, সাহসের হাত ভালো করে ধরে জীবনের জন্য লড়াই করুন। জানি না, জীবনকে বাঁচাতে আর কতোটা পরীক্ষা দিতে হয়। গন্তব্য

www.pathagar.com

হয়তো নিকটেই এসে পড়েছে। আমার মনে হচ্ছে, দ্রুতই আমরা তীরে ভিড়তে সক্ষম হবো। সাহস ও বিচক্ষণতার সাহায্যে আমাদের পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। পরিবেশ বেশ ভয়াবহ, কিন্তু কৃষ্ণকুমারের মতো খুনি আর অনাচারী নয়!'

মহারাজার চোখে-মুখে আরো একবার প্রত্যাশার আলোকরেখা জ্বলে ওঠে। বৈঠার ওপর নিজের অবসন্ন হাতটি শক্ত করে ধরে তিনি বলতে থাকেন– 'ঠিকই বলেছো রাজেন্দ্র। ভগবান জালেম হতে পারেন না। নিজেদের জন্য নয়; আমাদের জীবন বাঁচিয়ে রাখতে হবে মজলুম মানবতার জন্য, যারা আমার স্বেচ্ছাচারিতা ও বোকামির অন্যায় শিকার হয়ে এক হিংস্র হায়েনার বিষাক্ত থাবায় আজ রক্তাক্ত।'

সকাল হতে হতে অনেকটাই কমে এসেছে তুফানের মাত্রা। পাষণ্ড ঘূর্ণিঝড়ও হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু পানির ঢেউ বেড়েছে অস্বাভাবিকভাবে।

রাজেন্দ্র তৃপ্তির সাথে শ্বাস নিয়ে বললো– 'মহারাজ! মনে হচ্ছে আমাদের ওপর ভগবানের দয়া ঘনিয়ে এসেছে।'

মহারাজ বললেন– 'আমারও তো তা-ই মনে হচ্ছে, কিন্তু রাজেন্দ্র, আমি শুনেছি অধিকাংশ নৌকা নাকি তীরের আশপাশে এসে ডুবে যায়!'

রাজেন্দ্র আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো মুষলধারায় বৃষ্টি অনেকটাই কমে এসেছে। ভোরের আলো বিকশিত হচ্ছে। কিন্তু কিছু দূরে অন্ধকার আর অন্ধকারই দেখা যাচ্ছে। একটু পরই নৌকাটি অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে সামনের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। এখানে পানির এমন বিকট শব্দ যে, তাতে কানের পর্দা ফেটে যাবার মতো অবস্থা!

'ওহ্ ভগবান'! রাজেন্দ্র চিৎকার দিয়ে বললো– 'ম হা রা জ !'

রাজেন্দ্র মহারাজ জয়ধ্বজ সিংকে ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দেয় এবং এর সাথে সাথে নিজেও পানিতে ঝাঁপ দেয়। সে প্রবল সাহস ও শক্তিতে ডুবে যাওয়া মহারাজকে ধরে সাঁতরাতে সাঁতরাতে তীরে নিয়ে এলো। এরপর ঘটলো আরেক ধাক্কা... খালি নৌকাটি শূন্যে উঠে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো। পরে সেই টুকরোগুলো স্রোতে ভেসে যেতে লাগলো।

আসলে ঘটনা হচ্ছে– সামনে ছিলো এক উঁচু পাহাড়। যেখানে নদীর স্রোতে প্রবল বেগে ধেয়ে আসা পানিগুলো ধাক্কা খেয়ে দিক পরিবর্তন করে নেয়।

www.pathagar.com

এ এক অনবদ্য ইতিহাসের চিত্তাকর্ষক উপাখ্যান। এক চেপে রাখা ইতিহাসের মোড়ক উন্মোচন।
বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুরম্য অতীত আর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ লড়াইয়ের দাস্তান প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হয়েছে এ গ্রন্থে।
এ গ্রন্থ কেবল একটি উপন্যাস নয়, এ গ্রন্থ এমন এক ইতিহাসের জানান দিয়ে গেছে– যে ইতিহাসের তালাশ ছিলো না বহুদিন ইতিহাসের পাতায়। ষোড়শ শতকের বাংলার সুলতান আলি কুলি খানের বীরত্ব আর শৌর্যের কীর্তিগাথা যেমন মোড়ক খুলেছে সাহসী কলমে, তেমনি মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে সেইসব লোকদের, যারা একদা বাংলার বুক থেকে মুছে দিতে চেয়েছিলো ইসলাম ও মুসলমানিত্বের পরিচয়।
এ গ্রন্থ ইসলামের এক বিজয় নিনাদ।
এ গ্রন্থ ইনসানিয়্যাতের ঝাণ্ডাকে উড্ডীন করেছে সদর্পে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর মানবপ্রীতির বন্ধনকে তুলে ধরেছে সবকিছুর উর্ধ্বে।
লড়াই, রাজ্য, ষড়যন্ত্র, প্রেম, ভালোবাসা, বিরহ, অশ্রু আর যুদ্ধদিনের জমাট কাহিনি সাজানো আছে 'রাজকুমারী'র পরতে পরতে।
আপনাকে স্বাগতম!

নবপ্রকাশ
ইসলামী টাওয়ার [দোকান নং ২০]
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯১৩ ৫০৮৭৪৩